

গল্প-ভারতী

‘তুখইরণের সুধাকরণের উদাহরণের মালা’



সপ্তম গ্রন্থ

১৩৪২



সম্পাদক

শ্রীনৃগেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

প্রকাশক—

ভারতী-সাহিত্য ভবন লিঃ .

১০-এ, বিমতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা

মূল্য—ষেড় টাকা

প্রকাশক—

শ্রীপূর্ণচন্দ্র দাস

ফাইন প্রিন্টিং ওয়ার্কস

১০-এ, বিমতলা ষ্ট্রিট, কলিকাতা



এই গ্রন্থে আছে

বাতোয়ালী	ঈশ্বপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়
ছিন্ন-বন্ধন	অসমন্ধ মুখোপাধ্যায়
পথের বোঝা	„ নরেন্দ্র দেব
দাবী	„ আশালতা সিংহ
নবজল	„ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়
জয়-পরাজয়	„ জয়ন্তকুমার চৌধুরী
উৎকট সত্যাহুয়গী	„ বিলু মুখোপাধ্যায়
রূপান্তর	„ অন্নপূর্ণা গোস্বামী
স্মৃতি	„ রামশদ মুখোপাধ্যায়
জীবনের মূল্য	„ গজেন্দ্রকুমার মিত্র
বা	„ আশাপূর্ণা দেবী
রংলাল	„ অণুপ্রভা ভট্টাচার্য
এগারো, বারো, তেরো	„ প্রভাতী মুখোপাধ্যায়

গল্প-ভারতীর সহায়ক-সমিতি

রায়বাহাদুর ত্রিখগেন্দ্রনাথ মিত্র

ঐনুল হক দেব

• সরোজকুমার রায় চৌধুরী

• বনকুল

• পাণ্ডুগোপাল মুখোপাধ্যায়

ডাঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

ঐসজনীকান্ত দাস

• নৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়

• বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

• অবিনাশ ঘোষাল

বাংলা ভাষায় ছোট গল্পের মধ্য দিয়া সাহিত্যিক ঐতিহ্য সৃষ্টি করিবার উদ্দেশ্যে গল্প-ভারতী গ্রন্থমালা প্রকাশিত হইতেছে। * * *

বিভিন্ন ধরনের ছোট গল্পের সম্ভার লইয়া এক একখানি সম্পূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশ করিবার আয়োজন করা হইয়াছে। * * *

বাংলা দেশের এবং দেশ-বিদেশের শ্রেষ্ঠ লেখকগণের হুনির্কীৰ্ত্তিত নূতন গল্প-রচনা দ্বারা গল্প-ভারতী সমৃদ্ধ হইবে। * * *

শিল্প হিসাবে সাহিত্য-জগতে ছোট গল্পের যে মর্যাদা আজ বাংলাদেশে বিপর্য হইতে চলিয়াছে, তাহা স্বরণ করিয়া এবং কথা-শিল্পীদের উৎসাহ ও প্রেরণার জন্ত, গল্প-ভারতীতে প্রকাশিত প্রত্যেক রচনার যথাযোগ্য মূল্য দেওয়া হইবে। * * *

এই ধরনের সাহিত্যিক আয়োজন আমাদের দেশে এই প্রথম। * * *

বাংলা সাহিত্যের সহিত আপনার প্রীতির সম্পর্ক স্বরণ করিয়া, গল্প-ভারতী আপনার সহায় ও সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করে। * * *



ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক লিঃ

গয়েল এগ্জিট প্রেস. কলিকাতা
বিলকৃত মূলধন.....৪ কোটি টাকা
অদায়ীকৃত মূলধন.....১ কোটি টাকা
মুজুত. তহবিল.....৭১০ লক্ষ টাকা

ডিরেক্টরবর্গ :

মি: জি, ডি, বিড়লা (চেয়ারম্যান)
মি: এম, এ, ইম্পাহানী মি: রমণলাল সরাইয়া
(ভাইস-চেয়ারম্যান) (ভাইস-চেয়ারম্যান)

মি: অনন্তচরণ লাহা
মি: মহাশেওলাল মহম্মদ
মি: নবীনচন্দ্র মল্লিক
মি: মদনমোহন আর কুইয়া
মি: মতিলাল তাপুসি
মি: বৈজনাথ জালাল
মি: গবরীন্দ্রনাথ গোস্বামী
তার আনন্দের হাজি দায়

ব্যাঙ্ক সংক্রান্ত সকল প্রকার কাজ কম্যু হই এবং
বহির্বাণী সংক্রান্ত সকল প্রকার আর্থিক স্থবিধা ও
ব্যবস্থা তৎপরতার সহিত করা হয়।

জেনারেল ম্যানেজার

মি: বি, টি, ঠাকুর :

শাখা ও পে অফিস—ভারতের সর্বত্র ও বিদেশে

UCB 4

কলিকাতা মেন অফিস :— ও, এইচ, বীওয়লা, ম্যানেজার।

বড়বাজার :

কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রিট :

ডুবানীপুর :

পি, সেনগুপ্ত, ম্যানেজার। এ, পাল, ম্যানেজার। এম, এম, ব্যানার্জি, ম্যানেজার।

ফোন :—ক্যাল ১৪৬৪ ও ১৪৬৫

গ্রাম :—“এরিওপ্লাটিন”

বেঙ্গল শেয়ার ডিলার্স

সিণ্ডিকেট লিমিটেড

ষ্টক ও শেয়ার ব্যবসারে ভারতের বৃহত্তম কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান

শাখাসমূহ—

বম্বে, লাহোর,
মোরাদাবাদ, এলাহাবাদ,
লক্ষৌ বেনারস, রাঁচি,
ভাগলপুর, মুম্বের,

হেড অফিস



শাখাসমূহ—

কটক, বাঁকুড়া, নবদ্বীপ,
কৃষ্ণনগর, বহরমপুর,
ঠাকুরগাঁও, জলপাইগুড়ি,
বরিশাল, মৈমনসিংহ,
ঢাকা।

—“শেয়ার ডিলার্স হাউস”—

কোম্পানীর নিজস্ব বাড়ী
চৌরঙ্গী স্কোয়ার, কলিকাতা।

মূলধন

অনুমোদিত—	২৫,০০,০০০ লক্ষ টাকা
বিক্রীত—	১৮,০০,০০০ ”
অদায়ীকৃত—	১০ লক্ষ টাকার উধে ”

*আমরা সর্বত্রকার শেয়ারের ক্রয় করিয়া থাকি।

*ঢাকা খাটাইবার নিরাপদ ও সর্ব্যপেক্ষা লাভজনক উপায়
সম্পর্কে পরামর্শ দিয়া থাকি।

*“ছাত্র আশ্রয়” গ্রহণ করিয়া থাকি।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য আমাদের “মাহুলি শেয়ার মার্কেট রিপোর্ট”
নিয়মিত পাঠ করুন, নতুন সংখ্যা বিনামূল্যে পাঠান হয়।



দুধ - শুধু টাটকা হ'লেই হয় না!

প্রকৃতিব জ্যেষ্ঠ শাস্ত্র হ'ল। এই 'স্বাঃ সম্পূর্ণ' স্বাভাবিক মাছুলেব নবীণের প্রয়োজনীয় প্রাণ দায়কীয় পুষ্টি আকারে ভর্তুকি এ নিত্যসের পক্ষে অপরিসীম, বাড়ন্ত ছেলেমেয়েদের পক্ষে অতি প্রয়োজনীয় এবং প্রাপ্তবয়স্কদের দৈনন্দিন খাদ্যের এক প্রধান অঙ্গ। সুতরাং খাত্ত হিসাবে দুধের গুণমানের সহজেই অনুমিত।

দুধ কিছু, বিশেষতঃ গ্রীষ্মপ্রধান দেশে, জলোচ্ছ্বাসে মই হয়ে যায় এবং বাসি হয়ে গেলে এতে একরকম রোগসংক্রমক বীজপু জন্মায়। তাছাড়া আয়ত্ত্বের বেশে পাই সোজা থেকে আরম্ভ করে বিক্রি অবধি প্রকৃতিব হাজার হকম ভাবে হুমকি হবার

ভয়। এই বিজ্ঞান থেকে তরু পাঠ্য, এত আশ্রয় সাধাওপতঃ খাওয়ার আগে দুধ ভাল' করে নি—কিন্তু এই বাবদ্য পূর্ব 'সময়' পূর্ব নির্ভর-ভোগ্য নয়।

সম্প্রতি পাক্যজাত্যেবলিততে চিকিৎসক ও খাত্তীসহা বলেন যে নিত্যসের পক্ষে শুঁড়ো দুধই অপর্যাপ্ত। শুঁড়ো দুধে টাটকা দুধের সবকটি খাত্তগুল ও স্ফার খাত্তেই তাছাড়া এই দুধ হুমকি হবার কোনও ভয় থাকে না।



শুঁড়ো দুধগুলির মধ্যে নিম্নলিখিতভাবে সর্বশ্রেষ্ঠ—ভিটামিন। চিকিৎসক ও খাত্ত-বীজবের প্রতিষ্ঠিত অস্তিত্ব যে শিশুদের 'সুখোদী' সঠিক খাত্তই ভিটামিন।

ভিটামিন-মিল্ক

শিশুদের 'উপযোগী' জ্যেষ্ঠ দুধ।

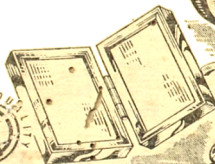
প্রস্তুতকারক :—ন্যাশানাল নিউট্রিশ্যন্স লিমিটেড

অনুপম উপহারে

বান্ধবের দিনে প্রিয়জনকে কিছু উপহার
দিতে না পারলে মন পেন কিছুতেই আনন্দ
পায় না, তাই আপনার ও আপনার প্রিয়জনের
মনোমত উপহারের বেসানি যোগাবে

ইন্ড মেটাল ওয়ার্কস

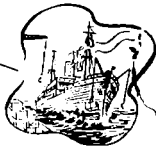
নানা রকম ডিজাইনের নানা আকার ও
আকৃতির ফটোফ্রেম, সিগারেট কেস, পাউডার
কেস, এস-স্টে, টি-সেট, গিফটার, শিগার ও
স্ট পেকাক, বিয়ার ট্যাংকার্ড প্রভৃতির অপূর্ণ
সম্পদ, যেকোনো অঙ্ককে হেসই পছন্দসই
অবধি সজা। আমাদের প্রত্যেক গ্রাহিকে
ডিজাইনের নতুন, শিল্প-চাতুর্য ও দক্ষতার
চাপ পরিষ্কৃত দেবতে পারেন।



ইন্ড মেটাল ওয়ার্কস

৯১, বাজা দীনেল স্ট্রীট - কলিকাতা

ব্যঙ্ক



জাতীয়শিল্পই জাতির
মেরুদণ্ড। জাতীয়-
শিল্পের প্রতিষ্ঠা ও
প্রসারণ সম্পূর্ণভাবে
নির্ভর করে আধুনিক
ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠানের
উপর।



সি.এন. মুখার্জি
ক্যানিং ডিরেক্টর

সিটিডেল ব্যাঙ্ক লিমিটেড

অফিস - ৮, সানডান স্ট্রীট কলিকতা, ফোন - কলক ৩৯৩৭
প্রাথমিক - বড়বাজার, উত্তরপাড়া, বর্ডমেন, ১৯ ডেমাজুড়

১৫৩০



ভারতীয়
সিল্ক

ইণ্ডিয়ান সিল্ক শাউস
কলিকাতা

শ্রী



একটি শিশিতেই রূপচর্চার : সম্পূর্ণ উপকরণ

বসন্ত-মালতী—ভারতের একটি প্রাচীন প্রাণধন সামগ্রীর
আধুনিক সংস্করণ। বসন্ত-মালতী সাধারণ কসমেটিকান
মিষ্ট বা সোশায়ম বস, এ এমন একটি অভিনব প্রাণধন-
সামগ্রী যা একাই স্বক পরিচর্য, পরিপূর্ণ ও মন্থা করে।
ছায়াপা গাছগাছড়া ও মেঘপর্বাণ, বাবাম, বধু ও ছবে
প্রস্তুত এই বসন্ত-মালতী রকের কোষতলিকে নবজীবন
দান করে এবং বসন্তে ও স্যাট্টিয়াটে তার, ত্রাণ
বেচেতা হয় করে। বসন্ত-মালতী ব্যবহারে আগনি
লোকের এক মন্থন অশুভুতি লাভ কবেন।

বসন্ত

সি. কে. লেমন এণ্ড কোং লি.
কলিকাতা

রূপচর্চার পূর্ণাঙ্গ প্র



সোডা ওয়াটার মেশিন

ক্লাব ও হোটেলের উপযোগী হাতে চালানো ছোট
মেশিন এবং কারখানার চালাইবার মত বড় মেশিন—
ক্রাউন কর্ক মেশিন ও আম্বুসংগিক যাবতীয় উপকরণ
অতি স্বল্প মূল্যে পাওয়া যায়। সোডাওয়াটার
মেশিন চালাইবার পদ্ধতি অনুবিহার প্রত্য পত্র লিখিলে
আমাদের স্বাক্ষর মিনমাণ যাই উপদেশ দেন।
বিশেষ বিবরণ লিখুন।

একসিলিটার এক বোতল
ব্যাচেলার মেশিন—২৫/-
কর্কিং মেশিন ১টি—৮০/-
গ্লসেস, কর্ক, বোতল
ও অন্যান্য সরঞ্জাম—৫০/-
মোট—৩৫৫/-

এস এণ্ড বটল সাপ্লাই এজেন্সী

১৪ নং, রাধাকান্ত রোড, কলিকতা

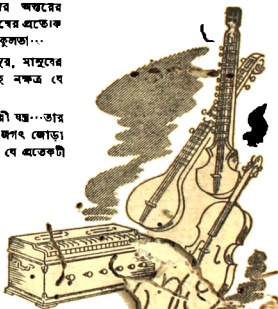


“গীত সুধার ভরে চিত্ত পিপাসিত রে”

ঐ একটি কথার বিশ্বকবি যে নিজের অন্তরের গীত-তুকার কথা রূপ দিয়েছিলেন, তা নয়, বিশ্বের এতোক নয়-নারীর অন্তর থেকে উঠেছে ঐ অসীম আকুলতা...

নদীর কলোচ্ছ্বাসে হ্রস্ব, পাতার সর্বস্ব হ্রস্ব, মানুষের চলা-ফেরা হাসি-কান্নার হ্রস্ব...আকাশে গ্রহ নক্ষত্র যে ঘুরছে, তাও অনাদি হ্রস্বে বাধা

সেই অ-ধরা স্বরকে ধরেছে মানুষের ঠৈরী যন্ত্র...তার অথ্যা ডোয়ার্কিনের বিভিন্ন বাস্তবতায় আজ যে জগৎ জোড়া খাতি অর্জন করেছে, তার মূল কথা হচ্ছে যে এতেকটি দ্বন্দ্ব-স্বৈ স্বরকে দিয়েছে নিখুঁত রূপ—



ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স
১২, এস. প্লানেড, ইষ্ট, কলিকাতা



শ্রীকল্যাণ

তৈল

কিউ কোলে না
কিউ ডুলতে পারেনা

জেম কেমিক্যাল
কলিকাতা



ঘরে ও বাহিরে

যেখানেই থাকুন না কেন অলঙ্কারই আপনার সৌন্দর্য্য
বৃদ্ধি করিবে। আধুনিক রুচি সম্মত অভিনব প্রণালীতে
প্রস্তুত, সকল প্রকার ডিজাইনের গহনার শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠান।
জুয়েলার্স ও ওয়ান্ড মেকান্স



কুণ্ড জুয়েলারী ওয়ার্কস

প্রো: জে, এল, কুণ্ড

২০২, কনওয়ালিস স্ট্রীট, কলি, জেন, থাই, ১২০০





দাম্পত্য ক্রমা হৃদয়ে ডুলে যাবেন ওগেল ক্রমা বহুদিন মনে থাকবে

ব্লাডভিটা সর্বকম দুর্বলতা ও কররোগে অতি উপকারী। ডাক্তাররা বলেন যে ভারতবর্ষে প্রায় শতাব্দি সত্তর জন গোক ক্ষীণস্বাস্থ্য। আর এই ক্ষীণস্বাস্থ্য নিয়েই তাদের কাজকর্ম করতে হয়। ফলে সহজেই তারা নানারকম রোগে পড়ে। আমাদের দেশে যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, পাণ্ডু, নানারকম পেটের অসুখ, রক্তাক্ততা ইত্যাদি রোগের প্রভূত প্রকোপ তার প্রমাণ।

ব্লাডভিটা ভিটামিন, খনিজ পদার্থ ও দেশী গাছগাছড়া মিলিয়ে তৈরি। ব্লাডভিটা নিঃশ্রমিত খেলে স্বাস্থ্য দৃঢ় হয়, রোগ হতে পারেনা—প্রত্যেকেই তাই এ টনিক খাওয়া দরকার। ছোট ও বড়, শ্রী ও পুরুষ সকলেই বছরের সব ঋতুতেই এই টনিক খেতে পারেন। অসুখের কালে নানা তথ্যসম্বলিত ক্যাটালগ ও পুস্তিকা পাঠান হয়।

ব্লাড-ভিটা

অধ্যক্ষ মনুজ বাবু

মেডিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরী

পি ২৩ সেন্ট্রাল এজেন্সি, কলিকাতা

স্বাস্থ্যের
দোষাণ্ড ও
স্বাস্থ্য রোগের
দুগ্ধ



—সেশবাসীর এই অনাবিল প্রাণস্যা আমাদের উৎসাহ ও আনন্দবর্ধন করে আসছে এক শতাব্দীর উপর। এর মূলে রয়েছে অনাবিল একনিষ্ঠ সাধনা কারিগরগণের অননুগ্রহীয় নৈপুণ্য ও তত্ত্বপরি আমাদের বিশুদ্ধ ও উৎকৃষ্ট উপকরণ।



ভীমনাগ



ও ৭, ডয়েলিংটন ষ্ট্রাট, বি, বি, ১৪৬৪
৪.৫. ৬৭৬ রোড. বি. বি. ৩৩৭৮

৬৮, আশুতোষ মুখার্জী রোড
পি. কে. ১১৭৭



অপরূপ রূপলাবণ্যের অধিকারিণী **সীতা**
 দেশাই স্থাবর্যব নিখুঁত বাববার জন্য
 "ওটিনের" বিশেষত্বের প্রশংসা করেছেন।
 তাঁর মতো আজ সকলেই স্বীকার করেন যে
 এদিক দিয়ে "ওটিনের" জোড়া নেই।

I always use Oatine Cream before retiring. It is so
 pleasant and soothing and cleanses my skin from
 anything left by dust or make up. I recommend
 it to all my friends.

L. A. Durai.



Oatine

SNOW for DAY · CREAM for NIGHT

AFTER THAT I'M CONVINCED

Tussanol

IS THE
ONLY WAY



এটা ওটা ঔষধ খেয়ে বুঝা সময় ও অর্থ নষ্ট করেছেন
কেন? টাসানল খেয়ে দীর্ঘা সর্দি কাশির হাত
থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়েছেন, তাঁদের উপদেশ
গ্রহণ করুন। টাসানল সর্দি কাশির অমূল্য
ঔষধ। সুপরিচিত ও সুপরিচিত।



TUSSANOL
For **COUGHS**

MARTIN & HARRIS LTD., CALCUTTA

—বঙ্গলক্ষ্মী—

সুগন্ধি আমলা তৈল

কেশ বর্দ্ধনে ও মস্তিষ্ক শ্লিথ
রাখিতে অদ্বিতীয়

বঙ্গলক্ষ্মী আয়ুর্বেদ

ডাক্তারস

১১নং ক্লাইভ রো, কলিকাতা।

একসাথে

সুন্দর ও সৌন্দর্য

রেণুকা

চিরের ট্যালেন্ট পাউডার

লাবণী

স্নো এবং ক্রীম

তুহিনা

ফেরাল অফের বিউটি সিস্টেম

কান্ডা

সুন্দর সার



কমলকাটা কেমিক্যাল



সম্পদ পড়ে ও শুনে
আনন্দ পাওয়া যায় না
যদি প্রাণে শান্তি না থাকে

ইণ্ডিয়া ইন্সটিটিউট

ইন্সটিটিউট কোং. লি: কর্নিকোলা

ক্রমোন্নতির পথে-

নতন কাজের পরিচালনা

১৯৪৫ সালে

৩, ২০, ৭৭, ৬৭৫

১৯৪৪ সালে

২, ১৩, ৫২, ৮২৫

১৯৪৩ সালে

১, ৩২, ২৫, ৭৭৫

দি মেট্রোপলিটান

ইন্সটিটিউশন কোং লিমিটেড

হেড অফিস—কলিকাতা

নিদারুণ নিদাঘে স্নিগ্ধতা আনে...

নিত্য মানবের পরিমিত বডি পাউডার ব্যব-
হারে গ্রীষ্মের অস্বস্তিকর অবস্থা থেকে রেহাই
পাওয়া যায়। ত্বকের স্বাভাবিক কেশমলতা রক্ষায়
ঘর্ম নিবারণে ও ঘর্মজনিত হৃগন্ধ বিলাপে আশু
উপকারী।

হিমালী

বডি পাউডার

হিমালী ওয়ার্কস • কলিকাতা



একটি বিশিষ্ট পরিবার

—কাপড় কুসুম
হোসিয়ারীর সিনিস
শ্রেষ্ঠ ও বৈশিষ্ট্য
সমভাবে বজায়
প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে
স্বপ্নের আরামদায়ক
টেকসই।

কতকগুলি প্রসিদ্ধ ব্রাও
স্পিটফায়ার, হাবিকেন,
লভলক, লাক্সটেক্স,
ভিক্টোরিয়া, ইউনিক,
এয়ারটেক্স।



GRAM PHONE — LUXTEX
B.B. 1146.

কুসুম হোসিয়ারী সিনিস
৮১, তালপুকুর রোড, বেলিয়াঘাটা :: কলিকাতা।

—ঃ ডিষ্ট্রিবিউটাস —ঃ

মেসিনারিজ. এণ্ড ইলেকট্রিক্যালস্ লিঃ

৮৭, শ্রীমন্তলা স্ট্রীট, কলিকাতা

GRAM EYELETS

Phone : Cal. 1092

সিলেট ইন্ডাস্ট্রিয়াল বোর্ড

হেড অফিস—সিলেট

১৯২৮ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত

কলিকাতা অফিস সমূহ—

মেন অফিস—
৬নং ক্লাইভ স্ট্রিট,
ফোন—কলি : ৫৬০৭

বড়বাজার অফিস—
৯নং পণ্ডেরাপাড়া স্ট্রিট,
ফোন—বি, বি, ১৭২৫

—কলেক্টর স্ট্রিট অফিস—

৭৯২, হারিসন রোড (হারিসন রোড ও কলেক্টর স্ট্রিটের সংযোগ)

—আসাম ও বাংলার প্রধান প্রধান ব্যবসা কেন্দ্রে শাখা আছে

আদায়িত্বকৃত মূলধন ও বিতরণ ফণ্ড—

ছয়লক্ষ টাকা

কার্য্যক্ষমী ফণ্ড

১০০০০০০০ টাকা

• ব্যাংকিং নিজস্ব বাড়ী •

সিলেট

শিলচর

শিলং

ঢাকা

কলিকাতা ১৯নং মিশন রো. এক্সটেনসনে জমি কেনা হইয়াছে

পি, কে, কলকাতা

জে, এম, কলকাতা

মানোজি ডাইরেটর

জেনারেল ম্যানেজার

সাইলেন্ট বিচক্ষণ

সমালোচনা

তারিখ: বি, বি.—১২৭১

এ জন্মই বিবাহের। হারানি
যদি অন্তরে দর বে তা
নিশ্চয়ই বি.এন—

ডালিয়া

হইতে, কারণ তা হইলই
আপনার জিনিষ তাহাদের
সমালোচনার ধোপে টিকিবে।

দোকান আইনে বন্ধ—
রবিবার—২টার পর হইতে
সোমবার—সম্পূর্ণ

শাড়ী
পোষাক
হোসিয়ারী
শয্যা জব্যাদি

চেয়ারম্যান—শ্রীপতি মুখার্জি

ডালিয়া

১৫ লা. বি. ২ কো. নি:
কালেক্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা



HIMKALYAN
Unrivalled Hair Oil

ভেষজ বিশারদ নগেন্দ্রনাথ শাস্ত্রীর
 অনবদ্য অবদান

“হিমকল্যাণ”
 কেশটৈল
 গুণে ও গন্ধে প্রসাধন শিল্পে
 অপরাজেয়

হিমকল্যাণ ওয়ার্কস—কলিকাতা

বাতোয়ালী*

ত্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

(১)

অপরিচিত শব্দ...অজানা নাম.....বাতোয়ালী...

একজনের নাম...আমাদেরই মত কৃষ্ণ-চর্কের অভিলাষ নিয়ে যারা
বাস করে এই খেত-শাসিত-শতাব্দীতে, বাতোয়ালী তাদেরই
একজন।

হরত 'আমাদের চেয়েও হতভাগ্য...সূর্য্য-নন্দ মরু-আফ্রিকার
একজন কালো কান্দো...

এসো বন্ধু, আমাদের দেশে, আমাদের ভাষায়...এখানে পাবে
তোমারই মতন কৃষ্ণ-চর্ষ-ব্যাদি-প্রপীড়িত নৃ-সহায় মাহুদ...

খেত-সভ্যতার শ্রীক বাসরে, আজ আমরা জগতের বিখ্যাত
জাতিরা সমবেত হচ্ছি...আমাদের মত এক...অর্থাৎ এক...কাম্য এক...

* গল্প-ভারতীতে প্রত্যেক সংখ্যায় আমরা একটুকু করিয়া জীবন-কাহিনী দিবার
চেষ্টা করি। পঞ্চম সংখ্যায়—“আপনি পড়েছেন কি” এই নামে জগতের বিখ্যাত
পুস্তকগুলির পরিচয় দিবার সূত্রপাত করি। এই দুইটা বৈশিষ্ট্য এতদ্বারা
বাতোয়ালী দেখা হইল। বাতোয়ালী, এক দিকে, জীবন-কাহিনী, যদিও

আপনার দিকে জগতের একখানি শ্রেষ্ঠ পুস্তকের পরিচয়—সম্পাদক

তাই আজ তোমার আত্মাকে আহ্বান করছি, বন্ধু-আত্মিকার বন্ধ প্রান্তর থেকে, গঙ্গা-নীর-নির্মল এই আমাদের বাংলা দেশে...

হয়ত তোমার দৃষ্ট দেহ নিষ্ক হবে...

হয়ত এই পরিচয় থেকে, জন্ম নেবে, নতুন মিতালী... কালো কাক্সী আর, কালো বাঙালীর মিতালী... কারণ আমাদের উদ্ধার কর্তাদের অভিধানে একই "নেটিভ" নামে আমরা গাথা হয়ে গিয়েছি বহুদিন থেকে...

কিন্তু তার আগে, কেমন করে কোথায় পেলাম তোমার দেখা, সে-কথা জানিয়ে দিতে চাই আমার পাঠকদের।

(২)

ফরাসী-সাহিত্যে বৎসরের শ্রেষ্ঠ উপন্যাসকে সম্মান দেবার জন্যে একটা ব্যবস্থা আছে, তার নাম গৌকুর্ প্রাইজ।

নোবেল-প্রাইজ-পাওয়া বইগুলির মতনই গৌকুর্ প্রাইজের অধিকাংশ বই-ই বিশ্ব-সাহিত্যে অমরীয় হয়ে আছে।

উনিশ শো একুশ সালে ফরাসী-বিদগ্ধমণ্ডলী একখানি ফরাসী উপন্যাসকে এই বহু-বার্ষিক প্রাইজ দেন। তাতে ফরাসী রাজনৈতিক নেতারা প্রায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। কারণ উপন্যাসখানি ফরাসী সাম্রাজ্যবাদকে নির্ধন নগ্নতায় জগতের সামনে তুলে পরে... দুই আত্মিকায় খেত-সভ্যতা কালো আদমীদের শৃঙ্খা করবার অহেতুক দৈব প্রেরণায় যে বীজবৃক্ষের ব্যভিচার করে চলেছে, রাজনৈতিক দক্ষতারের সমস্ত স্থনিয়ন্ত্রিত নীরবতার বড়বল ভেদ করে, উপন্যাসখানি নিরাভয়রূপে তাকে ফুটিয়ে তোলে।

সেই উপন্যাসখানির নাম বাতোয়াল, লেখক রেণে মার্সী।

উপভাসখানির ঘটনাস্থল, * ফরাসী-শাসিত মধ্য-আফ্রিকার একটি
নিগ্রো-অধুষিত প্রদেশ।

বাতোয়াল সেই প্রদেশের এক নিগ্রো দলপতি।

(৩)

বাতোয়ালার গল্প বলার আগে, তার জন্মদাতা রেণে মার'র
কথা একটু বল দরকার।

সেই বঙ্গ দেশের আদিম সমাজে রেণে মার'র দীর্ঘ ছ'বৎসর
কাল কাটান সেখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে, তাদের চাম্বিকাদা,
উৎসব-মৃত্যুর সঙ্গে...প্রতিদিন প্রতিমুহূর্ত একনিষ্ঠ ছাত্তের মত তাদের
সেই দুঃস্থ জীবনগ্রন্থপাঠে তিনি অতিবাহিত করেন। তাঁর
উপভাসের ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, এই কাহিনীতে কোন শব্দ, কোন
চিত্তা, কোন বর্ণনার মধ্যে আমার নিজের মনের এতটুকু 'নেই...'
নিখুঁত ক্যামেরার মত আমি শুধু তুলে নিয়ে এসেছি, তাদের কথা,
তাদের কগড়া, তাদের ভালবাসা, তাদের প্রতিটি মুহূর্ত। বিচার
আমি করিনি, বিচারের তার ফ্রাঙ্কের পোকদের ওপর, সভ্যতার
শত্রু ফ্রাঙ্কের ওপর।

(৪)

বাতোয়াল, বড় শুভ-লগ্নে তোমার দেখা পেলাম।

আজ সারা জগতে বেজে উঠেছে সাম্রাজ্যবাদ-নিধন-যজ্ঞের মন্ত্র...

বহু যুগ ধরে, বহু-তরু, বহু-বাহুবলের যুক্তিতে সাম্রাজ্যবাদ
বল-দলী দানবের মত, পৃথিবীকে পদাশ্রিতা দানীরূপে উপভোগ

করে এসেছে...আজ তার সেই ভোগের মধ্যে এসেছে ভাষন...দাসীশ্বর
লাহনার অপমান মুছে ফেলে জীবধাত্রী ধরিত্রী আবার জাগছে
-হীয়াসী মহিমায়.. দিকে দিকে উঠছে তাই শৃঙ্খল-মোচন-মন্ত্র...

সাম্রাজ্যবাদ, তার চেহারা করাসী হোক, ওলন্দাজ হোক,
ইংরেজী হোক...তার অন্তর এক...তার আকাঙ্ক্ষা এক...তার চরিত্র
এক.....

তাই বাতোয়ালার করাসী-সাম্রাজ্যবাদের যে চেহারা আমরা
দেখতে পাই, তাকে চিনতে আমাদের খুব কষ্ট পেতে হবে না। সেবতা
এক, ওধু মুষ্টি আলাদা...

রণে মারি! এই উপভাসের ভূমিকার ফ্রান্সের সাহিত্যিকদের
আহ্বান করে যে কঁথা বলেছেন, সে আহ্বান আজ পৌঁছে দিতে
হবে সকল দেশের সব সাহিত্যিকের কাছে...

"হে বন্ধু সহবাত্রী, তোমার দেশের গৌরব নির্ভর করছে তোমার
লেখনীর ওপর...তখনই প্রয়োজন হবে সত্য কথা বলবার, অস্ত্রের
বিক্রমে সংগ্রাম করবার, বা মিথ্যা, বা অত্যাচার, বা অত্যাচার, তার
বিক্রমে মাথা তুলে দাঁড়াবার, তখনই যেন নির্মম নির্ভীক আত্মপ্রকাশে
উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তোমার সবা। বহু কলহ, বহু দ্বন্দ্ব তোমাকে
করতে হয় অকারণে আজ বন্ধ কর সেই ভয়াবহ অপব্যয়।
জগতের আজ একান্ত প্রয়োজন তোমাদের অমোঘ শক্তি!

(৫)

ঐহম্ মধ্য-আফ্রিকার একটা ছোট্ট শহর। করাসী বাসনের
অধীন। উনিশ শো আঠারো সার্কে সেখানে সরকারী আদম-
শুমারী হলো, দেখা গেল লোক-সংখ্যা মাত্র এক হাজার আশী

বাতোয়াল

তার সাত বছর আগে সেই শহরের সরকারী আদমশুমারীতে লোক সংখ্যা ছিল দশ হাজার।

সাত বছরের মধ্যে এই ন'হাজার লোক গেল কোথায়?

একটা শহরের দশ ভাগের ন'ভাগ লোক গেল সাত বছরে নিশ্চিহ্ন হয়ে?

ঔপনিবেশিক দফতর থেকে সে-সংবাদ পৌঁছল না ক্রান্তে এসে। ন'হাজার নেটিভের জীবনের মূল্য চেয়ে ঢের বেশী মূল্যবান স্বৈত-শাসকের শাসন-মর্যাদা। ঔপনিবেশিক শাসন-কর্তাদের রিপোর্টে “দুর্ভিক্ষ” কথা লেখবার উপায় নেই...সুসভ্য জাতির শাসনে দুর্ভিক্ষ থাকে না...অতএব নিঃশব্দে মরুক ন'হাজার লোক...যেন তা নিয়ে না ওঠে কোন কোলাহল...

আর, হোক না ন'হাজার...সংখ্যায় কি যায় আসে? কালো আদমীর সংখ্যা শুনে কি লাভ?

মটেস্কী তো লিখে গিয়েছেন, তারা শুধু কালো নয়, তাদের নথ থেকে চুলের ডগা পর্যন্ত কালো...তাদের নাক চেপ্টা...এমন অসম্ভব রকম চেপ্টা যে তাদের অঙ্কুশ না করে পারা যায় না!”

আর তা ছাড়া, সভ্য হতে হলে, তার মূল্য দিতে হবে বৈ কি?

তাদের সভ্য করার জন্যে, এই সব ঈর্ষ-দেবে এক-একজন খেত-প্রতিনিধি বাস করেন, স্থানীয় শাসন-কর্তা।

স্বদেশ থেকে, সভ্যতা থেকে বিচ্যুত হয়ে তারা এমন জায়গায় গিয়ে পড়ে, যেখানকার ভয়াবহ বিচ্ছিন্নতা তাদের দেহ-মনকে অসাড় করে দেয়। সেই অসাড়তার হাত থেকে বেঁচে থাকবার জন্যে, তারা অবলম্বন করে, মদ...দ্বিবারাত্রি পাত্রের পর পাত্র...তার ফলে কয়েক মাসের মধ্যেই তাদের মস্তিষ্কের সব চিহ্ন যায় মুছে...মদের ফেনার তলে ডুবে। সে-অবস্থায় তারা বনের পশুর আর কালো

নিগ্রো, তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য রাখতে পারে না...পার্থক্য রাখার প্রয়োজনই বোধ করে না। তখন শুধু তাদের একমাত্র চেষ্টা হয়, হাতে কোন "সংবাদ" কোন ছিত্র পথ দিয়ে যেন স্বদেশে গিয়ে না পৌঁছায়...তার জন্তে যে-কোন মিথ্যা সৃষ্টি করতে তাদের এতটুকু বাধে না...

বাভোয়ালিতে রেণে মার'। এই মিথ্যার বড়বস্ত্র তৈরি করে, যেত-সত্যতা-শাসিত নিগ্রোদের যে চিত্র তুলে ধরেছেন, এটা দেখে এই সত্যতার স্বরূপ সম্বন্ধে এক সুবৃহৎ আশঙ্কা, বিরাট জিজ্ঞাসা-চিহ্নের স্বতন সত্যাবীর আকাশে ফুটে উঠেছে

তাই রেণে মার'। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছেন, হে সত্যতা, হে বিংশ-শতাব্দী, যুরোপের হে চরম-গর্ভ, অসহায় নিরপরাধ মানুষের হে শ্রমশান-ভূমি, তোমার সত্যমূর্তি, একদা এক হিন্দু কবি, রবীন্দ্রনাথ তাঁর নাম, টোকিও শহরে দাঁড়িয়ে যা উদ্ঘাটিত করেছিলেন তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য...তোমার রাক্ত জ মানুষের মৃত দেহের ওপর প্রতিষ্ঠিত...তোমার সব কীর্তি, তোমার সব ক্রিয়া-কান্ত মিথ্যার মহাপঙ্কে কর্দমাক্ত...তোমার রথের* পেছনে পেছনে ছুটে চলে অক্ষ-নদী, বেদনার আর্তনাদ। তোমার শিখা, তাতে নেই আলো...সে শুধু দহন-আগি...বা কিছু স্পর্শ করে, তা পুড়ে হয়ে যায় ছাই..

(৬)

বিখ্যাত ঔপন্যাসিক এর্নেস্ট হ্যামিংওয়ে কোন নভেলের নায়িক ছিলেন, আজকের যুগের আধুনিক এক নারী, যিনি ভ্রমণের মধ্যে শেষেছিলেন জীবনের চরম স্বাদ। 'সেই* নারী এক ভোজ-সভার তাঁর আফ্রিকা-ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করেন।' সেই বর্ণনা শুনে এক তরুণ তাঁর প্রেমে পড়ে যান। তরুণের মনে হয়, নায়িকার বর্ণনার

বাতোয়ালা

মধ্যে দিয়ে তিনি যেন দেখতে পেলেন আফ্রিকার সেই মরু-রাত্রিতে অরণ্যমধ্যে সেই আদিম মানুষদের অগ্নি-নৃত্য...সে-অগ্নির রক্তিম তপ্ত স্পর্শ যেন তাঁর দেহে এসে লাগলো...যেন তিনি স্পষ্ট শুনতে পেলেন তাদের সেই বিচিত্র মানুষের গুম্ গুম্ টুম্ টুম্ শব্দ...

বাতোয়ালা পড়ে যখন শেষ করে উঠলুম, তখন কিছুক্ষণ পর্যন্ত আমারও সেই অবস্থা হয়েছিল...মনে হয়েছিল, যেন আমি শুনতে পাচ্ছি সেই অস্বস্তি আদিম নর-নারীর উন্মাদ প্রেম-নৃত্যের শব্দ লেলিহান অগ্নিশিখার চারদিকে নগ্ন-দেহ নর-নারীর সেই আদিম বস্ত্র উল্লাস... সভ্যতার বহু দূরে অবস্থিত সেই বিচিত্র মানুষদের বিচিত্র জীবন-মৃত্যুর ছন্দ।

যুরোপীয় পর্যটকেরা আমাদের শিখিয়েছে, এদের একরকম নর-রাক্ষস বলে দেখতে...এদের সম্বন্ধে গোমহর্ষণ সব কাহিনী সৃষ্টি করে, এদের অপরিচয়তাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে; এদের বোঝাবার ভার স্বেচ্ছায় নিয়ে, এদের আরো দুর্বোধ্য করে তুলেছে। এদের জীবন কাহিনী, যুরোপের বই-এর বাজারে শুধু “খিলারের” অভাব মেটাবার কল্লে।

মানুষের মনস্তত্ত্ব নিয়ে, মানুষের পরিচিত হাসি-কান্না, স্বথ-দুখ বোধের পরিচিত সূত্র দিয়ে এদের জীবনকে সহজভাবে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা তাঁরা করেন নি। যুরোপীয় রীতি-নীতি, আচার-বাবহারের সঙ্গে যার আপাত কোন মিল নেই, যুরোপের কাছে তাই অসভ্য, বস্ত্র ও বর্কর।

অবশ্য, এই সর্ব আদিম মানুষদের মধ্যে অনেক কিছুই আছে যা আদিম, বস্ত্র, হয়ত বা বর্কর, যা হয়ত বর্তমান বৈজ্ঞানিক জীবনের ব্যাখ্যার মধ্যে ক্যাসে “না কিছু মূলত এরাও মানুষ...এবং আদিম মানুষ হিসাবে এদের মধ্যে মূল প্রবৃত্তিগুলি এখনও আদিম অবিকৃত অবস্থায় সভ্য মানুষের চেয়ে বিরাট ও বৃহৎ ভাবে রয়েছে।

গল্প-ভারতী

অন্তত বাতোয়ালা পড়ে আমি তাই জেনেছি। এরা অসভ্য, কেন না, এদের জীবনকে দেখবার দৃষ্টি-ভঙ্গী আমাদের দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে মেলে না। কিন্তু তা বলে, একথা বলা চলে না যে, তাদের কোন দৃষ্টিভঙ্গীই নেই। তাদেরও জীবনকে দেখবার একটা বিধিবদ্ধ দৃষ্টিভঙ্গী আছে...এবং তা তাদের জীবনের পক্ষে সম্পূর্ণ...তার মধ্যে বাইরের কোন জোড়াতাড়া নেই...

রেণে মার'িং বৈশিষ্ট্য হলো, তাদের সেই দৃষ্টিভঙ্গী দিয়েই তিনি তাদের দেখেছেন এবং দেখিয়েছেন...

(৭)

প্রথম পরিচ্ছেদ...

মরু-আফ্রিকার এক গ্রামে প্রভাত হচ্ছে...

গ্রামের দলপতি, তারা তাদের ভাবার বলে মোকৌন্দজী.....
মোকৌন্দজী বাতোয়ালা ঘুম থেকে উঠছে...

কাল রাতে নিত্য-নৈমিত্তিক যে আশুনের কুণ্ড জ্বালা হয়েছিল, রাত্রিশেষে তা ভস্ম-স্তূপে পরিণত হয়েছে...

ছোট্ট-পাতায় ছাওয়া খড়োঘর.....মেওয়ালগুলো সব গোল.....
বাতোয়ালার প্রাসাদ-কক্ষ...

বাইরে পোষো আর বাহার তীরে তীরে ঘন বনের মধ্যে ডাকছে
বাকৌয়ার* দল...

বিছানায় শুয়ে বাতোয়ালা একবার হাই ভূম্বো...তাহলে জাগতেই হবে!

একদিন তার জাগতে ভয় করতো না...আজ জাগার মানে
গিয়েছে বদলে...জাগা মানে কাজ করা...

* আফ্রিকার একরকম বৃক্ষা বানর

বাতোয়াল

কাজ ?

কাজ করতে তার ভয় পায় না.. তার শক্তির কথা উৎসবে, ভোজে বান্দা-অঞ্চলের লোকেরা গান গেয়ে বেড়ায় ..তার হাতের বণা আজও সকলের চেয়ে বেশী দূরে যায়...তার ছোরা আজও পর্যন্ত সবচেয়ে গভীর ক্ষত করতে পারে...

কিন্তু শাদা লোকদের পাশায় কাজের আজ অস্ত্র মানে হয়ে গিয়েছে... আজ কাজ মানে ক্লান্তি...শুধু অকারণ ক্লান্তি...অর্থ-শূন্য অবসাদ... উদ্বেগহীন পরিশ্রম...কিসের জন্ত, কার জন্ত, এ দেহপাত তা জানে না তারা, জ্ঞানবার উপায় নেই তাদের। অকারণ এই স্তম্ভন দেহকে নষ্ট করা...ক্ষয় করা...

বাতোয়াল ভাবে, এই শাদা লোকগুলো হবে ফিরে যাবে তাদের দেশে ? সেখানে তাদের কি ঘর-দোর নেই ? তাদের নিজেদের কি ক্ষেত-খামার নেই ? কেন তারা আমাদের দেশে এসে শুধু বলে টাকা দাও, ট্যাক্স দাও ? এতো টাকা নিয়ে তারা করে কি ?

কে না জানে, জীবন কতটুকু, দেখতে দেখতে ফুরিয়ে যায় নাচ, গান, উৎসব ! তাই রুত ভেবেচিন্তে এখানে করতে হয় দেহ-সঞ্চালন...যেন একটু বাজে খরচ না হয়...যেটুকু খরচ হবে, সেটুকুর মধ্যে পেতে হবে তাকে আনন্দ...দিনের পর দিন, এমনি চলে যাবে আনন্দে...প্রত্যেকটা দিন 'আপনাতেই থাকবে আপনি সম্পূর্ণ...গতকালের সঙ্গে আজকের নেই কোন যোগ আজকের সঙ্গে আগামী কালের নেই কোন সম্পর্ক...এক একটা দিন...কেন এক একটা আলাদা মুহূর্ত...তাই জানতো তার বাপ ঠাকুরদারা...

কিন্তু আজ ?

ঘরের মধ্যে ঘুমুচ্ছিলো কুমা...তার পোষা কুকুর সেও ঘুম থেকে

উঠে পা দিবে গা চুলকুচ্ছে...

গল্প-ভারতী

বাতোয়াল গা চুলকোতে আরম্ভ করলো...গা না চুলকোলে ভাল করে ঘুম ছাড়ে না...কে না জানে এ-কথা? সব জঙ্কই ঘুম থেকে উঠে তাই গা চুলকায় ঘুম তাড়াবার এটা হলো একটা স্বাভাবিক কার্যদা

তারপর হবার হাই তুলে...বেটুকু ঘুম শরীরের ভেতর থাকে, হাই তোলায় ফলে, মুখ দিয়ে তা বেরিয়ে যায়...

ঘুম তো আর কিছু নয় একটা চাপা আগুন...শরীরের ভেতর লুকিয়ে থাকে...নীতকালে দেখা নি, মুখ হাঁ করলেই খানিকটা ধোঁয়া বেরিয়ে ধীরে! আগুন ছাড়া কখনো ধোঁয়া থাকে?

তারপর সে সোজা হয়ে বসলো। এই নিয়ম। সে তার বাপের কাছ থেকে শিখেছে: তার বাবা তার ঠাকুরদার কাছ থেকে শিখেছে। এই সব নিয়ম মেনে চলে, গগুগোল হবার কোন উপায়ই নেই। কতদিনের, কত লোকের অভিজ্ঞতার ফলে এই সব নিয়ম-কানুন তারা পেয়েছে। তারই ওপর তার, বাতে তার মলের সব লোক এই সব নিয়ম মেনে চলে। এ তার পরম দায়িত্ব...উত্তরাধিকারস্বত্রে পাওয়া।

শাদা লোকদের সঙ্গে মিশে তার মলের কেউ কেউ তর্ক করতে চায়। মূর্খ! বাপ-দাদীদের নিয়মের চেয়ে বড় জিনিষ পৃথিবীতে আর কিছু আছে?

বাতোয়াল ঘরের বাইরে এসে দাঁড়ালো চারদিকে ঘন কুয়াশা... এত ঘন যে সামনের ন'খানি কুঁড়েঘরের একখানাও দেখা যাচ্ছে না ন'খানি কুঁড়ে ঘর...তার ন'জন স্ত্রীর বাসভবন...

ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা লাগার সে ঘরে ফিরে...এলো...আগুন জ্বাললো... নিজে থেকে আগে দেখা উচিত...নিজের কাছে নিজের জীবন সব, চেয়ে মূল্যবান...সে কথা তার বাবা প্রায়ই বলে...

বাতেয়ালা

আঙনের তাতে তার মেহের জড়তা কেটে যায়...আপনার মনে
সে গান গেয়ে উঠে...

গুন গুন করতে করতে সে তৈরী করে গানের কথা...সে-কথার
মধ্যে অধিকাংশ হলো শাদা মানুষগুলোর বিরুদ্ধে অভিযোগ।

(৮)

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

সূর্যের তাপ ক্রমশ বাড়তে থাকে। তার দরজার ধোড়ায় এক
ফালি আলো এসে পড়ে। সে বুঝতে পারে, এবার হবেছে
খাবার সময়।

সে উঠলো...সোজা গিয়ে উপস্থিত হলো প্রধান মহিষী ইয়াসীওইন্কার
কুঁড়ে ঘরে...

ইয়াসীওইন্কা তখন সবে মাত্র এক কড়া গুটীপোকাকার ঝোল
নামিয়েছে

বাকি আট-টী কুঁড়েঘরে, তার আটজন সতীন তখন যে-বার
প্রসাধন নিয়ে ব্যস্ত—

নয় দেহের আনন্দ-বিন্দুতে স্বামীর মনোরঞ্জনর জন্তে তারা প্রসাধন
করে...এ সম্বন্ধে কোন অকারণ লজ্জা তাদের নেই দেহগত লজ্জার
কোন অর্থ তারা পায় না খুঁজে যারা শাদালোকদের আঙতায়
গিয়ে পড়েছে তারাই শুধু লজ্জা করে...এ জিনিষ তাদের দেশে ছিল
না...শাদা লোকেরা তাদের সঙ্গে নিয়ে এসেছে। মানুষ আঘাত
লুকোয়...ক্ষত চিহ্ন লুকোয়...নিজের দুর্বলতা লুকোয়। মানুষের দেহ...
বিধাতার স্রষ্টদান...সে কি লজ্জা?

কাসাতাদানার ভাত...গুটীপোকাকার ঝোল...মিষ্টি আলু সেদ্ধ...

আর ছ'তিন গ্রাস পরে পরে এক চুমুক করে “কেনে”...

পরিতৃপ্ত ভোজনের পর বাতোরীলা প্রধানা ক্রীকে ইঙ্গিত করেন...

ইয়াসিনুইন্না সে-পরিচিত ইঙ্গিতের অর্থ বুঝে “গারাবোটা” † এগিয়ে দেয়...

টানে টানে তামাকের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠতে থাকে...

পরিতৃপ্ত...

গারাবোটা নামিয়ে রেখে ডান পায়ের আঙ্গুলের ফাঁকে ফাঁকে “চিগ্‌রে” বাছতে থাকে...এটা নিত্য নৈমিত্তিক কাজ, নইলে চিগ্‌রেতে সারা গা ভরে বাবে...একটা চিগ্‌রে থেকে দেখতে দেখতে হাজারটা চিগ্‌রে জন্মায়...

বাছতে বাছতে আপনাদের মনে সে হেসে ওঠে...শাদালোকঙলার গায়ের চামড়া এমন কুৎসিত নরম বে, যদি কোন রকমে একটা চিগ্‌রে তাদের গায়ে বসে, তারা ডয়ে মুর্ছা ঘাবার মতন হয়...যতক্ষণ না “বয়” এসে টেনে তুলে ফেলে দেবে, ততক্ষণ শান্তি নেই!

কিন্তু একথা নিয়ে হেসে লাভ কি? কে না জানে নিগ্রোদের গা শাদা লোকদের গা-র চেয়ে ঢের বেশী শক্ত, মজবুত। নইলে তাদের ঘাড়ে সাতটা হাতীর বোঝা চড়িয়ে তাদের ঘুরিয়ে বেড়ায় গা থেকে গাঁয়ে?

রোদ হোক, ব্রাউ হোক, নিগ্রোদের কিছু যায় আসে না... তাদের ঘুরতে হবে পথে পথে...নরম চামড়া বলে শাদারা থাকবে ছাউনির তলায়!

ধন্য তোমরা শাদাচামড়ার দল!

* - শাদা বিয়ার জাতীয় পান

† হ'কো

সামান্য মশা... তাকেও তোমরা দেখলে যাও জলে। তাদের ভন্ডানিতে তোমাদের মজাজ যায় খারাপ হয়ে। বিছের ওপর তোমাদের রাগ, প্রাকংগো পোকার ওপর তোমাদের রাগ, বা কিছু নিরীহ সামান্য, তারই ওপর তোমাদের রাগ। বলি, আমাদের আশে-পাশে এই যে সব ছোট ছোট জীবন অসহায় ভাবে ঘুরে বেড়ায়, মাহুব যে হয়, সে কি তাদের ওপর পারে রাগ করতে ?

হায়, শাদা চামড়ার দল !

রাতদিন তোমাদের পা দুটোকে রংবেরঙের চামড়ার বাক্সে রেখেছ বন্ধ করে... কেন, পাগুলো কি তোমাদের পচে গিয়েছে ? শুধু পা কেন, সারা দেহ থেকে তোমাদের বেরুচ্ছে মড়ার গন্ধ ! তাই সর্বদাই অন্ত করে তাদের রাখ ঢেকে !

তাও যেন হলো, কিন্তু চোখ দুটোর ওপর শাদা, কালো, নীল, রঙ-বেরঙের কাঁচ কেন ? তাও না হয় মানলাম, কিন্তু, কি সর্বনাশ, সারা মাথা ঢেকে একটা করে চুবড়ী... নিজেদের চেহারা দেখে, হাসিও পায় না তোমাদের ?

ধিকারে বাতোয়ালা দুমিকে থুতু ছিটোয়...

একমাত্র ভয়, শাদায়া বাঁহু জানে... বাঁহু দিয়ে তারা সব কিছু করতে পারে... সেদিনও সে নিজের চোখে দেখেছে, গভর্ণরের বাড়ীতে একটা কাঠের বাক্সো এসেছে, তার ভেতর লুকিয়ে থেকে, সে শুনেছে, শাদা লোকেরা গান গাইছে, কথা বলছে, বাজনা বাজাচ্ছে... বাঁহু নয় ?

ভাবতে ভাবতে কখন বেলা বেড়ে যায়... মাথার ওপরে এসে পড়ে স্বর্গ...

সে কথা জানিয়ে দিই যার চীৎকার করে কালো পাখীর দল...
বাতোয়ালা খর থেকে বেরিয়ে পড়ে।

গল্প-ভারতী

সোজা হাঁটতে হাঁটতে. মাঠ পেরিয়ে, একটা উঁচু যায়গায় গিয়ে
ওঠে. সেখানে তার তিনটে “লিংঘা” * থাকের পর থাক
সাজানো...সব চেয়ে নীচের লিংঘাতে সর্ব-প্রথম সে আঘাত করলো...
দেখতে দেখতে একটা গুম্ গুম্ গুম্ গুম্ আওয়াজ চারদিকে ছড়িয়ে
পড়লো তারপর সে তার ওপরের লিংঘাতে আঘাত করলো...
শব্দ আরো ভীন্ন, আরো দ্রুত হয়ে উঠলো.. সমস্ত বাতাস সে-শব্দে
কঁপে উঠলো...

দেখতে দেখতে সেই শব্দের প্রত্যুত্তরে নানানদিক থেকে গুম্ গুম্
গুম্ গুম্ আওয়াজ আসতে লাগলো...ডাইনে...বায়ে...সামনে...
কতদূর থেকে, কোন্ গা থেকে, শব্দ শুনে বুঝতে পারে বাতোয়ালো...
জন্ম থেকে তার কান এই বাণীহীন শব্দের অভিধান-হীন তাৎপর্য
এমনভাবে বুঝতে শিখেছে যে, শব্দ-তরঙ্গের ঈষৎ তারতম্যের মধ্যে
ভাষার যে তারতম্য ঘটে যায়, তা ধরতে তাকে এতটুকু ভাবতে
হয় না। এই ভাবে তারা, আশ্চর্যকার আদিম তাড়নায় বস্তুহীন
যে নিখুঁত শব্দ-যন্ত্রের আবিষ্কার করেছে, বিজ্ঞান তাকে স্বীকার
না করলেও, অসভ্য বস্ত্র-মাতৃষের মস্তিষ্কের অস্তিত্বের প্রমাণ স্বরূপ
তা সভ্য মাতৃষদেরও বিশ্বয় উৎপাদন করে...

বাতোয়ালো আজ দ্বিপ্রহরে গা থেকে গায়ে নিমজ্জন পাঠালো
গুম্, গুম্ গুম্ গুম্...

—সামনে যে-রাতে চাঁদ হবে বালার মতন, তোমরা আসবে সকলে...

গুম্ গুম্ গুম্ গুম্...

—সারারাত জ্বলে আগুন...চলে নাচ...গুম্ গুম্ গুম্ গুম্...

‘কাগা’ থেকে “কাগায়” দেখতে দেখতে চলে যায় সে
অমিষ্ট...

* এক ধরনের কাঠের বাস্ত্র যন্ত্র

বাতোয়ালা

তার তেমনি ভাবে উত্তরে জানায়...

—টম্ টম্ টম্ টমা টম্ টম্...

—তুমি আমাদের ডেকেছ...আমরা শুনেছি...বাপারটা কি?

বাতোয়ালা লাফিয়ে লাফিয়ে এক লিংঘা থেকে আর এক লিংঘায় ছোটে...ক্রমশ তিনটে লিংঘাই একসঙ্গে বাজতে থাকে তুমুল শব্দে আকাশ বাতাস ছেঁয়ে যায়...

বাতোয়ালা বলে, সবাই আসবে...মেয়ে, ছেলে, বুড়ো...মস্ত বড় হবে ইয়াংবা...এমন হয়নি আর...এবার ধুম করে করবো গাজেজা *

ঠিক সেই সময় বাতোয়ালার বাড়ীতে অনেক দিন পরে উপস্থিত হয়েছে বিসিবিংগুই...

বিসিবিংগুই...মাত্র ঘোলাটা বর্ষা চলে গিয়েছে তার পাথরের মত কৌদা কালো দেহের ওপর দিয়ে...সমস্ত দেহটাকে ঘোদে জলে নিটোল নিখুঁত করে...

তার স্তন্যর চেহারা, অপরূপ স্বাস্থ্যের দিকে চেয়ে আজ মেয়েমাত্রই দীর্ঘশ্বাস ফেলে...সে কথা সে জানে...এবং যৌবনের রীতি অনুসারে অকুণ্ঠভাবে সে চলে ভোগ ক'বে...ভোগ করবার এই তো বয়স। এই বয়সেই তো অরণ্য কাপিয়ে হরিণীর পেছনে ছোটো বাঘ...

কুধা এবং খাঙু • জল এবং তৃষ্ণা...নর এবং নারী...

নদী কি বিমুখ করে তৃষ্ণার্ত পথিককে? নারী কেন বিমুখ করবে উপবাসক পুরুষকে? সমর্থ পুরুষেরও উচিত নয় বিমুখ করা মেহার্ত নারীকে...

অন্য ভাবনা, অল্প জিজ্ঞাসা, জাগেনা তাদের জীবনে। জীবন চলে প্রবৃত্তির প্রেরণায়।—আদিম, অন্ধ, আরণ্য প্রবৃত্তি...

যদি প্রয়োজন হয়, পুরুষকে লুকিয়ে নিজের মেহ ও মনকে তৃপ্ত করার...কিসের বাধা? বলিষ্ঠতার পুরুষের আক্রোশ ছাড়া?

তবে, তোমার জিনিস ব্যবহার করার কলে, জিনিসের যদি ক্ষতি হয়, ক্ষতিপূরণ দিতে হবে বৈ কি অপর পক্ষের! তারদ্বারা গোটা কতক তাড়া মুরগী বা কয়েক হাঁড়ি গরম “কেনে,” তাই যথেষ্ট নয় কি?

এই রীতি চলে আসছে, যেদিন থেকে আকাশে উঠছে “আইপেন্,”* বনে চরছে বাঘ...

তবে বাতোয়ালার কাছে খাটেনা এ রীতি। সুরোমো রীতিকে সে অন্ধের মত মেনে চলে, তাই তার কাজ। কিন্তু, তাকে লুকিয়ে যে ভোগ করবে তার জিনিস, সে পারবে না তাকে ক্ষমা করতে। সে দলপতি। বহু মূল্য দিয়ে সে কিনেছে জমি, তারই একমাত্র অধিকার বীজ ছড়াবার...সেখানে সে নির্দম...কঠোর...হিংস্র...বনের বাঘও বুঝি তত হিংস্র নয়।

তার ন'বৌ-এর মধ্যে সবাই সে-কথা জানে। বিশেষ করে জানে ইয়াসিগুইন্দজা, তার প্রিয়তমা...কিন্তু যখন সে দেখে বিসিবিংগুইকে মেহের মধ্যে রক্ত তার ওঠে উষ্ণ হয়ে, সে ভুলে যায় সব ভয়...ভয়ের চেয়ে যে-প্রবৃত্তি ঢের বেশী* তীব্র, আত্মসমর্পণ করে তার কাছে তবে খুব সাবধানে..বাতোয়ালার না জানতে পারে!

বাতোয়ালার চোখে ধূলো দেওয়া খুব কষ্টসাধ্য হলেও, তা সম্ভব...কিন্তু আট্টজেন সতীনের চোখে ধূলো দেওয়া তো সম্ভব নয়...তাদের অভিযোগ, বিসিবিংগুই কেন তাদের ফেলে চাইবে ইয়াসিগুইন্দজাকে?

বিপদ হয় বিসিবিংগুই-এর..

তথু কি এখানে, সর্বত্র...চারদিক থেকে খবর আসে, তার

বাতোয়াল।

জন্তে কত সম্পত্তীর মধ্যে হয় কলহ...মারপিঠ...এমন কি ছাড়া-
ছাড়ি...

খবর যায় কমাওয়ারের কাছে...শাদা কমাওয়ার!

বিসিবিংগুইকে ডাকিয়ে আনিয়া তিনি শাসিয়ে দেন, ফের বদ্বি
তিনি, তা হলে জেলে পুরে রাখবো...

কিন্তু তার কলে উল্টো কাণ্ড ঘটে...ইয়ার্সী-মহলে তার খ্যাতি
যায় বেড়ে...যা দুস্ত্রাপ্য তাকে পেতেই বেশী আগ্রহ...যত দুস্ত্রাপ্য,
আগ্রহ তত বেশী।

তবে বাতোয়াল। তাকে ভালবাসে...

বাতোয়ালার ধারণা, তার সম্পত্তিতে হাত দেবার সাহস কারুরই
নেই...

তাই বাতোয়ালার বাড়ীতে তার অবাধ গতি...সে এলে তার
জন্তে "বোগবো" * পাতা থাকবেই...

বহুদিন পরে সে এসেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সব ঘরেই খবর চলে গিয়েছে।

সবাই এসে তাকে ঘিরে ধরেছে...হাসছে...

ইয়াসিগুইনজা বাতোয়ালার হঁকোটা তাকে দেয়...চোখ ঘুরিয়ে
ঘুরিয়ে বলে...

—খুব সাবধান...অন্ত মেয়েদের সঙ্গে মিশো না...খুব সাবধান...

অন্ত আটকান অটহাস্ত করে ওঠে...

রহস্ত করে প্রধান। বলে, চলে, বেরকম আরম্ভ করেছে, একদিন

গল্প-ভারতী

দেখবো সর্বান্নে চিত্তা বাঘের মতন “কাশিরি”^{*}র দাগ নিয়ে ধুকছো...
দাঁত পড়ে গিয়েছে... গায়ের চামড়া আলগা হয়ে গিয়েছে... চুল উঠে
গিয়েছে...

আবার সবাই মিলে হেসে ওঠে...

এমন সময় ফিরে আসে বাতোয়ালা... প্রধানা তাকে শুনিযে
আবার বলে...

বাতোয়ালাও হেসে ওঠে...

রহস্য, গল্পে... সন্ধ্যা হয়ে আসে, সূর্য্য ঝায়-ভুবে...

বর্ণহীন পাণ্ডুর আকাশে একটী, দুটী করে দেখা দেয় তারা...
অনাদি বিষণ্ণতার অশ্রু-বিন্দু... তার পাশ দিয়ে দিয়ে ধীরে ভেসে চলে
“আইপেন”[†], শর-বুন কেটে নদীতে যেমন ধীরে-বয়ে চলে নৌকো...

মান অসম্পূর্ণ শিশু চাঁদ...

মাত্র ছ’রাত্রি হয়েছে বয়স...

(৯)

তৃতীয় পরিচ্ছেদে আমরা দেখছি, অকস্মাৎ ঝড়, তপ্ত বায়ুর
গুণী, অরণ্যবাসীদের আর্তনাদ...

উন্মাদ প্রকৃতির বৃষ্টি ভীত আর্ত জগতের আদিম প্রাণীর দল...

সেই সঙ্গে নামে বৃষ্টি... হৃদয় গ্রীষ্মের রাজ্যে হৃদয় বর্ষা

অরণ্যে গুহায় আশ্রয় নেয় জীবকুল... ক্ষণকালের জন্ত তুলে যায়
খাত-পাদক সম্পর্ক...

সামান্য খড়ের ঘর্ষে, ভীত বিম্বিত অন্তরে, নর-নারী একান্ত
কাছাকাছি বসে, শোনে মেঘের, গর্জনের... বজ্রের হংকার...

* বৌন-বাণিধি বিশেষ

† চাঁদ

বাতোয়ালা

ভাবে, অধিদেবতারা বেরিয়েছে শাসন করতে অনাচারী মানুষদের...

বাতোয়ালায় আন্তানায়, প্রধানা ইয়াদিগুইনজার সঙ্গে তখন
চলেছে তার এক সতীনের তুমুল ঝগড়া...

ঝগড়ার মূল কারণ, বিসিবিংগুই...

একজন বলে, জানি, তোর এত ঝাল লেগেছে কেন?
বিসিবিংগুই তোর কাছে যায় না বলে তো!

অপরজন জবাবে বলে, তুই থাম...তবুও যদি লোকে না জানত,
তুই শাদাচামড়ার ঘর করে এসেছিস...

(১০)

চতুর্থ পরিচ্ছেদে, আমরা দেখছি, গাঞাজান্ডিৎসবের রাত এসে
গিয়েছে :

সবাই বলা-বলি করছে, সর্দারের বরাং ভাল...মাত্র কাল কমাণ্ডার
শ্রেন চড়ে ভিন্ শহরে চলে গিয়েছে...কমাণ্ডার থাকলে উৎসব
জমে না... ভয়ে ভয়ে কি উৎসব হয় ?

আর তা ছাড়া এত বড় ইয়াংবা যে হবে, তার জায়গা আর
কোথায় ? কমাণ্ডারের শ্রেনের সামনে মস্তবড় একটা খোলা মাঠ,
বাথার তীর পর্যন্ত চলে গিয়েছে...এই মাঠ না হলে কি উৎসব জমে ?

শ্রেনে আজ আর কেউ নেই, শুধু জ্যাংড়া বউলা প্রহরীরূপে
আছে...ওকে দলে টেনে নিলেই, সমস্ত শ্রেন তাদের...সারা রাত
যে তারা নাচবে, গীটবে...

বাতোয়ালা বারোট, লিংবা বসিয়েছে...বাঁজনার অভাব কি ?

মেয়েরা সকাল থেকে গম্বু পিষেছে...ঝুড়ি-ঝুড়ি পিঠে তৈরী
হয়েছে...বাতোয়ালা খাবারের এতটুকু জটী রাখা নি, কাদি কাদি
কলা, ডিম-ভর্তি সব গুটীপোকাকর ঝোল : ভিম...মাছ...টমাটম...

একমাস ধরে শুকিয়ে রোদে পুড়িয়ে, আগুনে শেঁকে, থান্ থান্ হরিণ আর হাতীর মাংস...বুনো বাঁড়ের ঠ্যাং...

তার সঙ্গে আছে কলসী কলসী “কেনে”, যারা মাতব্বর তাদের জন্তে আলাদা করে ভুট্টা চুইয়ে স্বরসাল পানীয় তৈরী করেছে...সবার ওপরে আছে “পারনদ্”, কয়েক বোতল, শাদা-গোবরা যে মদ খায়...বহু কষ্টে বাতোয়ানা তাও সংগ্রহ করে রেখেছে...

ইয়াংবার রাজি ঘেন ভিজ়ে গলে যায়.....

দলে দলে তারা আসতে আরম্ভ করে...ছেলে, বুড়ো শিশু, তরুণ-তরুণী...পিঠে ধনুক আর তীর, এক হাতে বর্শা; আর এক হাতে জলন্ত মশাল.....

মাঠ থেকে নদীর দিকে চাইলে, শুধু দেখা যায়, অসংখ্য মশাল এগিয়ে আসছে...সেই সঙ্গে শোনা যায়, কুকুরের চীৎকার...গ্রাম ছেড়ে তারাও আসছে আশ্রয়দাতাদের সঙ্গে...

দেখতে দেখতে বাজনার গুম্ গুম্ আওয়াজে রাজির আকাশ কেঁপে কেঁপে ওঠে...

মাঠ ভরে যায় লোকে...

বাতোয়ালাকে ঘিরে তারা সবাই বসে...

বাইরে থেকে যারা এসেছে, তারা বাইরের জগতের সব তাজা খবর বলাবলি করে...

বাংগুইতে কতকগুলো শাদা লোক মারা পড়েছে...গম্ভীরবে শিগ্গির বন্দরোতে যেতে হবে...অনেক দূরে কোথায় শাদা জার্মানদের সঙ্গে শাদা ফরাসীদের লড়াই হচ্ছে...

মান্দাজিহাদের সঙ্গীরা পাংগাকোরা বলে, অনেক দূর ঘুরে এলাম... না ঘুরলে কি কিছু দেখা যায়? বোঝ না কেন, এই শাদা

লোকেরা অনবরত দেখলুম নিজেদের মধ্যে মাঝামাঝি করে মরছে... তাদের এক জাত আর-এক-জাতকে দেখতে পারে না। বোঝ না কেন, একটা ঘটনা বলি, সত্যি ঘটনা। এক ব্যাটা পৰ্তুগীজের সঙ্গে আমার প্রায়ই ঝগড়া লাগতো। একদিন কমাণ্ডারের কাছে গিয়ে লোকটার বিরুদ্ধে নাগিশ করলুম। আমার কথা শুনে করাসী কমাণ্ডার বলে উঠলো, আরে পাংগাকোরা, তুই হচ্ছিস্ গানার গাধা! পৰ্তুগীজরা আবার, মাছ...তাদের কথা কেউ গায়ে মাখে? কি করে পৰ্তুগীজরা সৃষ্টি হয়েছিল জানিস্? শামা লোকদের যিনি ভগবান, সৃষ্টির গোড়ায়, তিনি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের যত ভাল ভাল জিনিস ছিল, তাই দিয়ে প্রথমে আমাদের তৈরী করলেন। তারপর ঝড়তি-পড়তি যা কিছু বাজে জিনিস পড়ে রইলো, তাই দিয়ে তিনি যত-সব কালো আদমিদের তৈরী করলেন। তারপর হঠাৎ তাঁর খেয়াল হলো যে পৰ্তুগীজদের তো তৈরী করতে হবে! তখন কি করা যায়? তখন তিনি কতকগুলো কালো আদমির পরিত্যক্ত “গু-মুত্” থেকে প্রথম এক জোড়া পৰ্তুগীজ তৈরী করলেন। বোঝ কথা!

পাংগাকোরার কথা শেষ হতে না হতে সবাই হেসে উঠলো।

সেই প্রসঙ্গে একজন যুদ্ধের কথা তুলে। সে শুনে এসেছে, তাদের মনিষদের সুদ্ধে নাকি জার্মানদের বুদ্ধ হবে।

তাই না শুনে একজন উল্লসিত হয়ে বলে উঠলো, তা হলে হতভাগাগুলো নিশ্চয়ই আমাদের দেশ ছেড়ে যাবে এবার?

বাতোয়ালার বুড়ো বাবা চুপটি করে শুনিছিল। হাতের হকোটা পানের লোককে দিয়ে বলে উঠলো, তাঁর যেমন দ্রবুঁকি! এখান থেকে এক পা ওরা নড়বে না! আমরা যতকণ আছি, ততকণ ওরা যুদ্ধে মরতে যাবে কেন?

—ঠিক বলেছো, ঠিক বলেছো.....

—কিন্তু আমার আশা হচ্ছে, জ্ঞানীগণরা এবার কস্তানের দেবে পিষিয়ে.....

—তাতে আশা বা আনন্দ করবার কি আছে ইয়াবাদা ! জ্ঞানীগণ হোক আর করাসীট হোক, তারা সবাই শাদা। শাদায় আর কালোয় সম্পর্ক হলো, বেড়াল আর ইঁদুরের। বেড়াল ইঁদুরের সঙ্গে খেলা করে, তাকে ক্লান্ত করে খেয়ে ফেলবার জন্তে। সেখানে সব বেড়ালই সমান। তাই বেড়াল বদলালে ইঁদুরের কি লাভ ?

একজন বলে উঠলো, ঠিক বলেছ বুড়ো কস্তা, ঠিক বলেছ.. বদলালে হয়ত বিপদ আরো বাড়তে পারে...বাঁড়ের শিং থেকে হয়ত বাঘের মুখে গিয়ে পড়তে পারি.....

বৃদ্ধ বলে, তবুও 'এদের সঙ্গে এতদিন ঘর করে' এদের ভাল-মন্দ সব আমরা জানি.....

—জানি বৈ কি ! তারা আমাদের একতিল ভালবাসে না, আমরাও তাদের তেমনি দেখি—

কে একজন উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে...

—আজ না হোক, কাল...কাল না হোক, পরশু, একদিন না একদিন আমরা.....

—আমরা যেদিন সবাই মিলে...সবাই...যে-ভাষাই বলি না কেন, বান্ধা হোক, সাংলো হোক, ডাকপা হোক, আমরা সবাই যেদিন আমাদের পুরোনো ঝগড়া বাতিল করে এক হয়ে ঠাড়াতে পারবো...

বাতোয়ারার বাবা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বাধা দিয়ে বলে ওঠে, সেদিন বাম্বা বইবে উল্টো দিকে...নদীর জলে ছিপ ফেলে মানুষ ধরবে জ্বাকালের চাঁদ.....

সবাই হাসতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়।

বৃদ্ধ বলতে আরম্ভ করে, আমার মনে পড়ে, একদিন আমরা কি-

বাতোয়ালা

সুখেই না ছিলাম চুইবাংগুট নদীর ধারে...তারপর কোথা থেকে একদিন এলো এট শাদা লোকগুলো তাদের অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে...বাধা হয়ে আমরা আমাদের ঘর-বাড়ী ছেড়ে বারাদা করলুম অগাধ পথে... সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঠাকুর, হাঁড়ি কুঁড়ি, ছেলে-পুলে, কুকুর-ছাগল...চলতে চলতে ক্রেবেগে এসে আবার ঘর পাতলুম...

বাতোয়ালা বলে, আমি তখন ছোট্ট...সবে জন্মেছি...

বৃদ্ধ বোত্রো চলে, নতুন করে সেখানে ঘর তৈরী করলুম, বন কেটে মাঠ বার করলুম...নতুন করে সেখানে আবার রোদে পুড়ে জলে ভিজ্জে চাষবাস শুরু হলো...কদল পেকে উঠলো আবার মাঠে মাঠে...এমন সময় সেই আওয়াত্ত...গুডুম্ গুডুম্...দলে দলে এসে পড়লো শাদা লোকগুলো...জলে গেল পাকা ফসল...পুড়ে গেল কাঁচা ঘর...পালা...পালা পালাতে পালাতে এলাম গ্রীকোতে...সেখানেও এলো তারা ধৈয়ে সেখান থেকে পালিয়ে শেষকালে এলাম এখানে. এই বাস্কা আর পোখোর মাঝখানে...আর পালালুম না...যা হয় হবে... যা চূপ আছে, তা সইতেই চলে...

বৃদ্ধ নীরব হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দূর থেকে শোনা গেল আর একদল নিমন্ত্রিতের আগমন-বার্তা...গুম্ গুম্ গুর...

বৃদ্ধ আবার ফুরুর করে, কিন্তু আমরা ঐব তাদের মাথানত করে স্বীকার করে নিলাম, তাতেও কি শাস্তি এলো? আমাদের আচার ব্যবহার তারা উচ্চৈশ্বর্য করে দিয়ে, তাদের অসত্য নীতি-নীতি আমাদের নিতে বাধ্য করালো...তাদের পকেট...ভক্তি করবার কল্পে আমাদের অনবরত বলে, দাও, দাও, ট্যাক্স দাও...বত দিই, ওত বেড়ে যায় তাদের চাওয়া...কিন্তু তাতেও কিছু যেতো আসতো না, যদি তাদের কাঁড়ের কোন মানে মতলব পাওয়া যেতো...মনে পড়ে / আউগোরো-র কথা? বেচারার অপরাধ, একদিন মন খেয়ে মীতাল

হয়ে তার ইয়াসীকে বেদম্ প্রহার করে। হতভাগা মাগীটা সোজা গিয়ে কমাণ্ডারের কাছে নালিশ করে। হবি তো হ', সে-সময় কমাণ্ডারের বাড়ীতে তার জনকয়েক বন্ধু তাদের বেশ থেকে বেড়াতে এসেছিল। বারাণ্ডায় বসে তারা গল্প করছিল। মাগীর কথা শুনে কমাণ্ডার তক্ষুনি তার একজন কালো প্রহরীকে বল্লো, আউরোরোক খেয়ে জ্বলে পুরে রাখ্। প্রহরী একটু ইতস্তত করে। তাই না দেখে কমাণ্ডার একটা খালি বোতল তুলে সোজা তার মাথায় ছুঁড়ে মারলো... মাথা ফেটে তাজা লাল রক্ত কালো দেহ বেয়ে গড়িয়ে পড়লো... কমাণ্ডারের বন্ধুরা তাই না দেখে হো হো করে হেসে উঠলো...যেন একটা মজা হয়ে গেল...

—জানি...জানি...সে ঘটনা আমাদের মনে আছে...

তাকে বাধা দিয়ে বাতোয়ালা উত্তেজিত হয়ে বলে ওঠে, আমাদের সর্বশ্ব নিয়ে, আমাদের দিয়েছে কি তারা? শুধু কতকগুলো কথা... আমাদের ভবিষ্যৎ উন্নতির কথা...তারা যখন আমাদের কাছ থেকে টাকা নিয়েছে তখনই বলেছে, এই টাকার বদলে তোমাদের ভাল রাস্তা তৈরী করে দেবো, ভাল বাড়ী, নদীর ওপর দিয়ে পাথরের সঁাকো, তোমাদের জন্তে নিয়ে আসবো আগুন দিয়ে চালানো যন্ত্রের গাড়ী, লোহার লাইনের ওপর দিয়ে যাবে, হাওয়ার চেয়ে জোরে রেল-গাড়ী...কিন্তু কোথায় সে সঁাকো, কোথায় সে বাড়ী, কোথায় সে গাড়ী! মাতা...নি নি...মাতা...নি নি...কিছু না, কিছু না!

"We are taxable flesh! We are only beasts of burden! No, not even beasts! Dogs! Well, no, they feed their dogs and care for their horses. But we, we are less than these. We are the basest of the base." They are killing us off, by degrees!"

মাঠ ভরে যায় লোকে ।

বাতোয়ালার বাবা সহসা উঠে পাড়ায়, উত্তেজিত পুত্রকে শাস্ত
করবার জন্তে বলে, বাচ্চা, এসব কথা এখন থাক্...আমরা বুঝেছি
ভাগ্যের হাতে নিজেদের ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আমাদের করবার আর
কিছু নেই...বনেতে যখন “বামারা” গর্জন করে ওঠে, তখন হরিণদের
উচিত চুপটি করে যে-যার ঝোপে বসে থাকা...আজ আমাদের ঘিরে
ডাকছে জগতের যত শাদা “বামারা” *...আর তা ছাড়া আজ
আমরা এসেছি এখানে উৎসবের জন্তে...কথা বলে জিত্না শুকিয়ে,
এসো সবাই মিলে ভিজিয়ে তুলি জিত্না...শাদা লোকদের কাই থেকে
পেয়েছি তাদের সেরা জিনিষ সব-তুলিয়ে-দেওয়া তাদের “পার্বনদ”...
সেই তাদের শ্রেষ্ঠ দান...আমার- দৃষ্টি কমে “এসেছে বটে কিন্তু
তবু যেন মনে হচ্ছে ঐওখানে যেন কয়েক বোতল “আব’সাঁথ” রয়েছে...
বাতোয়াল...বাচ্চা...ছিপি খোলো ওগুলোর...আজকের রাতকে কাঁধার
মত ভিজিয়ে নেবো গায়ে তুলে...

বৃদ্ধের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যেন সমস্ত মাঠ আনন্দ-
কোলাহলে ফেটে পড়লো...চারদিক থেকে বাজনা বেজে উঠলো...

বাঘার তীরে আইপেনের আলোয় স্নান হলো ইয়াংবা...

শৃঙ্খলিত আদিম আরণ্যিকতার একরাত্রির মুক্তি-নৃত্য...

(১১)

দূর নগর-সীমান্ত থেকে কিসের ঘ্রেন ইঙ্গিত পেয়ে, তারা সবাই
উঠে পাড়ালো...

দূর থেকে একটা মণ্ডিত শব্দ কদীর ওপার থেকে মেঘ গর্জনের মতন
ভেসে এলো...সবাই একসঙ্গে বলে উঠলো, ঐ...ঐ তারা আসছে...

তারা আসছে, বাদ্যের জন্তে এই ইয়াংবা...

শব্দটা ক্রমশ এগিয়ে আসে, পোয়াবার মোড় ছাড়িয়ে, পাংগা-কোরার তেমাথা পেরিয়ে, ...শব্দ শুনে তারা বুঝতে পারে, এবার বাজার সঁাকো পেরুলো তারা...এবার এসে পড়েছে সরকারী সড়কের ওপর...কমান্ডারের আন্তাবলের কাছে...ঐ...ঐ...দেখা যায় তাদের মশালের আলোর...নয় দেহ বলিষ্ঠ সব তরুণের দল...সঙ্গে তাদের আনন্দ-ভরঙ্গ-উচ্ছ্বাস-দেহ অক্ষতযোনি কুমারীর দল...আজ তাদের সকলের একসঙ্গে হবে গাঞ্জা...

নাভালকৃত থেকে তরুণরা আজ প্রবেশ করবে মানবতার বৌবরাজ্যে... তরুণীরা হবে নারী...মাহুঘের সঙ্গ-অধিকাংশী...

গাঞ্জা তাদের জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব...গাঞ্জার রাত্রি জীবনের পরম রাত্রি...

নিমন্ত্রিতেরা, জয়োল্লাসে তরুণ-তরুণীদের অভ্যর্থনা করে...

সুর হয়: উৎসব...

শাণিত ছুরিকা হাতে এগিয়ে আসে দুজন বৃদ্ধ...একজন বৃদ্ধা এগিয়ে যায় তরুণীদের কাছে...

একজনের পেছনে আর একজন এইভাবে সারি সারি নারী গান গেয়ে গেয়ে ঘুরতে থাকে...

গাঞ্জা...গাঞ্জা...গাঞ্জা...

• আজ রাতে সখী ভূমি হবে নারী,

আজ রাতে কল্প ভূমি হবে নর...

আমরা নাচি আদিম নর-নারীর নাচ,

গাই আদিম মিলনের গান

বৃদ্ধ দুজন এগিয়ে এসে উৎসবের মন্ত্র উচ্চারণ করে...

ছবার চাঁদ আকাশে এসেছে গিয়েছে, তোমরা সকলের কাছ থেকে দূরে, নিবিড় বনের মধ্যে যে যার একলা করেছ উপবাস, করেছ সংযম...

মাহুঘের আর পিশাচের কুৎসিৎ দৃষ্টি থেকে দূরে, তোমরা তোমাদের দেহকে রেখেছ শুভ্র করে, যাতে মৃত্যুও তোমাদের স্পর্শ করতে না পারে...

কোন অস্ত্রায় কথা তোমরা উচ্চারণ করো নি...কোন অস্ত্রায় খাদ্য তোমরা খাওনি...শুধু বনের লতা-পাতা আর শিকড় খেয়ে দেহকে রেখেছ শুদ্ধ...

এই ছমাসের মধ্যেই তোমরা যেখানে পেয়েছ, সেখানে শুয়েছ... বনে, ঘাসে, শুকনো পাতায়...

খেলা নি কোন খেলা, হাসো নি একটি হাসিও...

তাই নাংগাকোরা * আজ তোমাদের বর দেবেন। পরীক্ষার তোমরা উত্তীর্ণ হয়েছ। আজ তোমাদের ক্ষত্বেই নাচ, গান, আলো, হাসি...এখনি তোমাদের গাঞা হবে...তারপর থেকে তোমরা হবে নর আর নারী...

কথা শেষ হতে না হতে চারদিক থেকে বেজে ওঠে বিচিত্র সব বাজনা...

ছুরি হাতে এগিয়ে আসে পুরোহিতেরা...তাজ্জু দেহ থেকে কিনকি দিয়ে রক্ত বেরোয়...

যন্ত্রণায় মুন্ডে পড়ে দেহ...

বাজনা বেজে ওঠে তীব্র থেকে তীব্রতর...যেন শোনা না যায় কোন বেদনার আর্তনাদ...

মেয়েরা নেচে নেচে এগিয়ে আসে, আঁবার পিছিয়ে যায়...

গাঞজা...গাঞজা...

জীবনে একবার আসে গাঞজার রাত্রি...

দেখতে দেখতে এক অপূর্ব উন্মাদনা সকলকে পেয়ে বসে...
সকলে মিলে তারা নাচতে শুরু করে...যে বার বেছে নেয় সঙ্গী...
যে বার বেছে নেয় সঙ্গিনী...মাত্র একটা রাত্রির জন্তে...মাত্র এই
রাত্রির জন্তে...তারা তুলে যায় ঘর-বাড়ী, সংসার, সম্পর্ক, ভাল
মন...প্রত্যেক নারী আজ জগতের প্রথম আদিম নারী...প্রত্যেক
নর আজ জগতের প্রথম আদিম নর...

ইয়াসীওইনজার দৃষ্টি শুধু বিসিবিংগুই-এর দিকে...

বার বার তারা দুজনে একত্র হয়...বিসিবিংগুইকে সে আজ
কিছুতেই ছেড়ে দেবে 'না' অজ্ঞ ইয়াসীর কাছে...

হঠাৎ বাতোয়ালা কি যেন দেখে চমকে ওঠে...এক নিমেষে
হাতটা বর্শার জন্তে বাড়ায়...কি ভেবে ধেমো যায়...

রাত শেষ হয়ে আসে...নৃত্য আর নৃত্য নয়...উন্মাদ মিলন-
মত্ততা.....

সহসা নাচতে নাচতে দুজনে পড়ে যায়...

ইয়াসীওইনজা আর বিসিবিংগুই...

বাতোয়ালায় টনক নড়ে...বাঘের মত লাফিয়ে সে বর্শার জন্তে
ছোটে.....

বর্শা নিয়ে যখন আসে, তখন দেখে, আর সবাই আছে, নেই
শুধু তারা দুজন...

আকাশে বর্শা তুলে বাতোয়ালা শপথ করে, বিসিবিংগুই-এর
লাল রক্তে রাঙাবে সে এই বর্শা...

আর বিশ্বের পাত্র নিঃশেষ করে ইয়াসীওইনজাকে প্রমাণ দিতে
হবে, প্রমাণ দিতে হবে সে ব্যাভিচারিণী নয়!

বাতোয়ালা

(১২)

এমন সময় বাত্বার তীর থেকে হঠাৎ এলো বিউগল-এর শব্দ.....

কারা যেন চীৎকার করে বলে উঠলো, কমাণ্ডার! কমাণ্ডার!
দেখতে দেখতে সেই বিরাট জনতা, যে বেদিকে পারলো ছুটে
আরম্ভ করলো...

নিমেষের মধ্যে মাঠ খালি হয়ে গেল...

পড়ে রইলো শুধু বাগযন্ত্র গুলো...আর আকাশে ক্লান্ত চাঁদ...

মাঝখানে দাঁড়িয়ে বর্শা হাতে বাতোয়ালা...সে পালায়* নি.. কি
যেন তাকে দেখানকার সেই মাটির সঙ্গে গঁথে রেখে দিয়েছিল...

ইনে...দিয়েলি ইনে...দিয়েলি...ইনে...দিয়েলী...হলুট.....

সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত নামিয়ে রাখবার আওয়াজ হলো...

টগ্ বগ্ করে বোড়ায় চড়ে কমাণ্ডার সৈন্যদের সামনে এসে
দাঁড়ালো !

মাঠের চারদিকে চেয়ে একজন সেনা-নায়ককে উদ্দেশ করে তিনি
বলে উঠলেন, এ সব কি ?

হঠাৎ ঘোড়ার পায়ের কাছে এক-তাগ্ কি একটা জিনিষ পড়ে
রয়েছে দেখে, তিনি বলে উঠলেন, এটা কি ?

সেনা-নায়ক কাছে এসে দেখলো, কতকগুলো খালি বোতলের
ওপর বাতোয়ালার* বুদ্ধ পিতা অঘোরের ঘুমিয়ে আছে ।

কমাণ্ডার গর্জন করে উঠলেন, ডাউট নিগারটা কে ? এখানে
ঘুমুচ্ছে কেন ?

সেনানায়ক বুদ্ধকে তেলা মেরে দেখলো...দেখলো...
ঘুমিয়ে পড়েছে.....



গল্প-ভারতী

—মন খেয়ে মরে গিয়েছে ?

—কে গো কটা ?

—বাতোয়ালার বাবা !

—তা হ'লে পথে আসতে যা শুনেছি, দেখছি সব সত্যি...আমার অসাক্ষাতে টেশনে ভূতের নৃত্য হয়েছে...কোথায় বাতোয়ালার ?

বাতোয়ালার তখন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কমাণ্ডার হুকুম দেন,

—প্রত্যেক গায়ের সর্দারকে এর ক্ষম্বে একশো ফ্রাঙ্ক করে জরিমানা দিতে হবে...যে দেবে না...তাকে সোজা জেলে নিয়ে গিয়ে কোড়া লাগাবে...ডিস্‌মিস...আজ রবিবার...সবার ছুটি...

উষার আলোকে পূর্ণিমার চাঁদকে দেখাচ্ছে, পাণ্ডুর...বিবর্ণ...
সদ্যমৃত.....

(১৩)

জীবনের প্রতি রাত্রি উৎসবের রাত্রি নয়। বছরের একটা রাত উৎসব, বাকি সব দিন, প্রতিদিন...শুধু বেঁচে থাকবার ক্ষম্বে আশ্রয় সংগ্রাম...

নিষ্ঠুর প্রকৃতি, অকপণ ধুরগী, নির্দয় পরিবেশ...তার বিরুদ্ধে নিত্য সংগ্রাম...

বাতোয়ালার বৃদ্ধ পিতার মৃতদেহ নিয়ে আসে তারা প্রথমত সংস্কার করে...

রেণে মারা নিপুণ চিত্রকরের মৃত, অপূর্ণ কথার রঙে এঁকে গিয়েছেন, শোক-তাপ, রোগ-ভোগের মধ্যে দিয়ে, এদের বিচিত্র জীবন...বিচিত্র শ্রদ্ধা প্রথা

তারা জানে জীবন কণস্থায়ী। এই জীবনের ওপারে আছে
মাহুঘের চির-অনন্দের রাজত্ব। তাই মৃত্যুর দরজা দিয়ে বারা চলে
যায়, তারাই সুখী।

বৃদ্ধের শব-দেহকে বিরে গাঁয়ের মেয়েরা ঘুরে ঘুরে নাচে আর
গান গায়,

বাবা, তুমিই সুখী...

আমরা যাত্রা পড়ে রইলাম,

দুঃখ রইলো আমাদেরই জন্তে...

শোক-পর্বের মধ্যে বাতোয়ালা তার অন্তরের কত চিহ্নকে ঢেকে
রেখেছিল, কিন্তু তোলে নি। আহত বাঘ আঘাত না করে আঘাত
ভোলে না।

বিসিবিংগুই সেই যে অদৃষ্ট হয়েছে, তার আর কোন সন্ধান
পাওয়া যায় না। বাতোয়ালা ঠিক করে, এ ভাবে রাগ দেখিয়ে
সে ভুল করেছে। নিজের মনে সে বিচার করে দেখে, তাদের জ্ঞাতের
লোকদের মধ্যে রাগ হলেই কেউ তক্ষুনি খুন করে বসে না। যেমন
করে শাদারা। মনে পড়ে, তার বাবা প্রায়ই বলতো, সব খাবারই
গরম গরম খেতে হবে, এমন কোন কথা নেই। ছাই-এর তেতর
যেমন লুকিয়ে থাকে আগুন, তেমনি, বাইরের হাসি-খুসি আদর
বহুর ছাই দিয়ে লুকিয়ে পুষে রাখো, প্রাতিহিংসা... শত্রু তাকে ডেকে
এনে খাওয়াও, নিজের বোগোবোড়ে শুতে দাও, নিজের হাতে তার
তামাকে আগুন ধরিয়ে দাও...তারপর, একদিন স্মরণে বৃষ্টি...
ধীরে স্নেহে...

বান্দাদের এই রীতি-সংসারগো, ডাকপু, তাদেরও এই রীতি...
তবে কেন সে সেদিন ভুল করলো ?

সেদিনকার তুল সংশোধন করবার জন্তে, বাইরে সে একবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেলো...খেন সেদিনকার ঘটনার সঙ্গে বিসিবিংগুই-এর কোন যোগ নেই...যেজ তার লিখায় গিয়ে সে বিসিবিংগুইকে ডাকে.....এসো, বন্ধু, ফিরে এসো.....

কিন্তু ইয়াসীগুইনজার মুক্ত নেই...বাতোয়ালার বাবার মৃত্যুর জন্ত তাকেই দায়ী করা হয়েছে...সে নিশ্চয়ই কোন যাদু মন্ত্রের ফলে সেদিন বুদ্ধের অপমৃত্যু ঘটিয়েছে...ইয়াসীগুইনজাকে প্রমাণ দিতে হবে, সে দোষী নয়...

শাশলের মত ঘুরে বেড়ায় ইয়াসীগুইনজা, কোথায় বিসিবিংগুই কোথায় তার সেই চাঁদ, ব্রজ্জে যে দিয়েছে টান...হায় আইপেন, মাথার ওপরে থেকে, তুমিই করছো সব পৃথিবীতে অঘটন সংঘটন!

চৈতন্যদেব যখন দক্ষিণে তীর্থ-ভ্রমণ করছিলেন, দেখলেন একজন গীতা পড়ছে।

আর একজন একটু দূরে বসে শুনছে, আর কাদছে
কেনে চোখ ভেসে যাচ্ছে।

চৈতন্যদেব জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি এ সব বুঝতে পারছো?
সে বলে, ঠাকুর, আমি একটি দ্রোকও বুঝতে পারছি না!
তবে কাদছো কেন অমদ করে?

সে বলে, আমি চোখের পানিতে দেখছি অজুনের রথ, আর তার
সামনে দেখছি স্বয়ং দাঁড়িয়ে ভগবান, তাই কান্নায় ভেসে যাচ্ছে বুক।

—ঠাকুরের কথা—

ছিন্ন-বন্ধন

শ্রীঅসমজ মুখোপাধ্যায়

(১)

ঘর-দোর ঝাঁট এবং বাসি-পাট সারিয়া বেলা প্রায় একপ্রহরের সময় রাসমনি ময়না-পুকুর হইতে ঘান করিয়া দিজা কাপড়ে বাড়ী ঢুকিল এবং জনের ঘড়াটা রান্নাঘরের দাওয়ার উপর রাখিয়া ডাকিল—
“অ শঙ্কু! শঙ্কু!... ওরে, কোথা গেলিরে? অ শঙ্কর!...দেখেচ, বলে গেলুম—কোথাও ঘাসনি, বাড়ীতে থাক, আমি টপ্ কোরে ময়না-পুকুর থেকে একটা ডুব নিয়ে আসি—তা অমনি পালিয়েচে! নাঃ, শঙ্কর আমার আলিয়ে পুড়িয়ে খেলে!”

“তোমায় খেলুম কি গো, আমি ত খাচ্ছি—পেয়ারা!”

রাসমনি উৰ্দ্ধদৃষ্টিতে দেখিল, তাহার নাতিটি, অর্থাৎ শঙ্কর, উঠানের পিয়ারা গাছটায় পা বুলাইয়া বসিয়া আছে; হাতে একটা পেয়ারা।

“আবার ঐ কোন্টে প্যায়রা খাচ্চিস! তারপর আলিয়ে মারবি এখন—‘ঠামাঁ, আমাঁর পেট ব্যথা কন্টে বড়’! আয়, শীগ্গীর নেবে আয় বলচি। একবার দোকানে যা; সরসের তেল আর গুড় আনতে হবে।”

“ওরে কাকা, দোকানে এখন আর আমি যেতে পারবো না।

“না পারিস, ঐ প্যায়রা খেয়ে আজ থাক তবে; আমার ত আজ একাদশী, খাবও না, তার কথাও নেই।”

গল্প-ভারতী

শঙ্কর আর কোনও কথা না বলিয়া, একান্ত মনে পিয়ারা চিবাইতে চিবাইতে, মস্তিষ্ক চালনার দ্বারা বুঝিল যে, আজ যখন একাদশী, তখন আজকার রাত্রির সঙ্গে ঠা'মার সত্যই কোন স্বার্থ নেই ; স্বার্থ শুধু আজ তাহারই। সুতরাং মিনিট-দুই পরে সে গাছ হইতে নামিয়া আসিল এবং বিনাবাক্যব্যয়ে তেলের বোতল ও গুড়ের গাটি লইয়া দোকানের দিকে চলিয়া গেল।

আধঘণ্টা ; তিন ক্লোয়াটার ; এক ঘণ্টা কাটিয়া গেল, তবুও শঙ্কর দোকান হইতে তেল ও গুড় লইয়া ফিরিল না। রাসমণি জলন্ত উনানে ক্রমাগত কাঠ জ্বলিতে ও নিজের মনে গজ-গজ করিতে লাগিল—“ছেলেটার আক্কেল দেখ দেখি একবার ! এতক্ষণ দশবার বাওয়া-আসা হুয় ; আর তুই সেই কখন গেছিস ! শোকেকে নিয়ে আমার হাড় কাণি হোয়ে গেল। সেই যে বলে—‘হাড় খাই, মাংস খাই, চামড়া নিয়ে ডুগ-ডুগি বাজাই’—শোকে আমার তাই করলে !”—সদর দরজা খুলিয়া রাসমণি একবার পথের যতদূর দৃষ্টি বায় দেখিয়া আসিল ; কিন্তু শঙ্করকে দেখা গেল না। আরো খানিকক্ষণ উনান-ধারে বসিয়া থাকিয়া রাসমণি সেই দাওয়ার উপরই আঁচলটা পাতিয়া শুইয়া পড়িল।

খানিক পরেই সদর দরজা খোলার শব্দ পাইয়া রাসমণি উঠিয়া বসিল ও শঙ্করের উদ্দেশে বলিয়া উঠিল—“হ্যারে মুখপোড়া ! কখন তুই গিয়েছিস...”

“খুড়ি ঠাকরুণ রান্না চাপিয়েছেন বুঝি ? এই একটা কথা আপনাকে বলতে এলাম।”

“কে—লক্ষণ ?”

হ্যা খুড়ী ঠাকরুণ। বলচি কি, যে এবার ত বেগুন ভাল ফলগেই না ; বেগুন-চাষে এবার নোকশান্ হোয়ে গেল। তার ওপর,

আপনার শঙ্কর কাণ্ডটা একবার শুনুন। গোটা-কতক গাছে যা একটা-আধটা ছিল, শঙ্ক সব ছিঁড়ে নিয়ে গেছে।”

“শঙ্ক ? কখন রে ?”

এই ত এখনি। বাতুলঘোদের কালী, হুয়ো ঠাকুরের ভাগনে গোপাল, কাবাসীদের রাধাকান্ত আর আপনার শঙ্কর। ‘মালি-পুকুর’রের ঐ ধারটা দিয়ে সব ঢুকে...

“কোথায় সব গেল, বলতে পারিস বাবা ?”

“না খুড়ী ঠাকরুণ ; তবে গুনলুম, সবাই মিলে ‘কিষ্টি’ হবে। তা কাই মনে করলুম, খুড়ী ঠাকরুণকে একবার জানিয়ে আসি, কি-রকম অত্যাচারটা করতে নেগেচে।”

উঠানের মধ্যে নামিয়া আসিয়া রাসমণি কহিল—“তা বেশ করেচিস্ লক্ষণ, সুখপোড়া একবার আহুক বাড়ীতে, তারপর করব এখন তার ব্যবস্থা। পোড়ারমুখোকে পাঠালুম কোথায়—গুড় আর ভেল আনতে, আর সে কি না

ছি-ছি করিয়া হাসিতে হাসিতে লক্ষণ বলিল—“ভেল আর গুড়, খুড়ী ঠাকরুণ, ওঁনাদের কিষ্টিতেই তাহোলে লাগিয়ে দিয়েচেন।” থক্ থক্ করিয়া কাঁসিতে কাঁসিতে লক্ষণ সর্দার চলিয়া গেল। রাসমণি খানিকক্ষণ ধরিয়া কি ভাবিল ; তারপর সদরে তানা-চাবি দিয়া, অনাহারে সেই দুপুর-রৌদ্রে বাহির হইয়া গেল।

শেতলা-তলার কাছে আসিতে ক্ষমর বৈরাগীর সহিত তাহার দেখা হইল। “মা-ঠাকরোণ এত বেলায় কোথা গা ?”

“আর বলিস্ কেন-বাবা ! সকলে যে-বার চলে গেল, আর পেহাড়, ভোগ করবার জন্তে রেখে গেল—আমাকে ! জালিয়ে খেলে, অধর, আমাকে জালিয়ে খেলে ঐ একরত্তি ছেলেটা !”

“শঙ্কর কথা বলচেন ?”

“আবার কার! জানিস্ কি বাবা, তারা কোথায় ফিটি করচে?”

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া অধর বলিল—“দেখুন দিকি মা-ঠাকরন, একবার চিনিবাস মালির বাগানের বৈঠকানায়। আমি ওইদিক দিয়ে এলুম। অনেকগুলো ছেলের হৈ-চৈ যেন অন্যতে পেলুম তার মধ্যে।”

গ্রামের একেবারে শেষে, নদীর ধারে, চিনিবাস মালকের বাগান। শেতলা-ভঁলার পথের বাঁক ঘুরিয়া, রাসমণি তখন নদীর পথের দিকে চলিল।

(২)

কয়েকদিন পরে।

পৈতা প্রস্তুত করিবার জন্য, একরাশ তুলার ‘পাঁজ’ পাশে রাখিয়া রাসমণি অপরাহ্নকালে ‘টেকো’য় সূতা কাটিতেছিল। শরর খান-দুই ছেঁড়া বুড়ী ও খানিকটা জট-পাকানো মাঝা-দেওয়া সূতা হাতে করিয়া অতি উৎসাহের সহিত বাহির হইতে বাড়ী ঢুকিল। উঠানের মাঝখানে দাঁড়াইয়া, রাসমণির উদ্দেশে কহিল—“একবার এদিকে চেয়ে দেখ, ঠা’মা।”

একবার বক্র-দৃষ্টিতে সেইদিকে চাহিয়া রাসমণি কহিল—“কেন, কি রাজবি জয় কোরে আনিলি যে, চেয়ে দেখবো। সারাদিন খালি গুলি-দাণ্ডা আর ঘুড়ি! বইয়ের মুখ একবারও দেখে না।”

একটা বিকৃত উচ্চ গলায় শব্দ বলিল—“বইয়ের মুখ দেখবো কি, স্কুল ত চারদিন ছুটি!”

টেকোতে কাটা-সূতাটুকু গুটাইতে গুটাইতে রাসমণি কহিল—“তোরা স্কুলেরও মুখে আগুন, তোরও মুখে আগুন! মাষ্টারদের আর কি; খালি ছুটী-ছুটী-ছুটী! কেনরে বাপু, এত ছুটীই বা কিসে হয়!”

ছিন্ন-বন্ধন

একথানা ছেঁড়া ঘুঁড়ী মার্জার উপর রাখিয়া, আঠা দিয়া তালু জুড়িবার জন্য শঙ্কু প্রাণপণ চেষ্টা করিতে করিতে কহিল—“কিসে হয়, জান না? মূলগমনদের যে.....বাঃ! আবার এধারটা সব গুলে গেল।...দাঁড়াও, একে আমি ঠিক না কোরে কিছুতেই ছাড়ি না—” বলিয়া ঘুঁড়ীর প্রতি শঙ্কু বিশেষভাবে নমনোনিবেশ করিয়া ও গুণ-গুণ করিয়া পাঠ্যপুস্তকের একটা অংশ আবৃত্তি করিয়া যাইতে লাগিল—

‘বাবুই পাখীরে ডাকি কহিছে চড়াই—

কুঁড়ে ঘরে থেকে, কর শিল্পের বড়াই ?

আমি থাকি মহাস্থখে.....।’.....বামু, এইবার ঠিক হোরেচে।...ঠা’মা, আমার পশি হাত তোমার ওই স্ততো দিতে পার ?

“পারি বৈ কি ! পৈতের জন্তে স্ততো, তোমায় না দিলে হবে কেন !”

“দাও না ঠা’মা, তোমার পায়ে পড়ি।”

“জাখ, মিছে বকাস্‌নি বল্‌চি। তোর ঐ ঘুঁড়ী লাটাই সব আমি চুলোর দোরে দিচ্ছি, দাঁড়া; নেখা গেল, পড়া গেল, দিনরাত ক্রীসব নিয়ে মেতেছেন! আজ চারদিন একবারও বই ছোঁস না, গালি টো—টো কোরে.....

“তুমি সেদিন আমার মারলে কেন ?”

“মারবো না ? তোকে পাঠালুম, তেল আর গুড় আনতে; আর তাই নিয়ে তুই একেবারে উধাও হলি! দশ-দশ-গুণা পয়সার জিনিস তুই ফিটিতে দিবে এলি! তোর সাহস, যতদূর বাড়বার বেড়েচে। দাঁড়া, তোর এখানকার ‘ঘুঘু’র বাসা আমি পুড়িয়ে দিচ্ছি। তোর মামাদের চিঠি দিয়েছি, তারা এসে তোকে নিয়ে যাক, তবে তুই জন্ম হবি।”

গল্প-ভারতী

শরুর লাফাইয়া উঠিয়া কহিল—“আমি সোনাতলী যাব? ওরে বাস্ রে! কিছুতেই সেখানে আমি যাব না।”

“তোরা বাড়ি যাবে! এখানে আমি তোকে রাখবো না, তুই থাকবি কোথায় রে অলপ্নেয়ে?”—বলিয়া রাসমণি তাহার স্ত্রী কাটিবার সরঞ্জামাদি একটা মাটির হাঁড়ীর মধ্যে রাখিয়া উঠিয়া দাড়াইল।

রাত্রে অভ্যাসমত দুটি মুড়ী ও একটুখানি শুড় খাইয়া রাসমণি শুইয়া পড়িল। শরুর তাহার আগেই খাইয়া শুইয়া পড়িয়াছিল ও ঘুমাইয়া গিয়াছিল।

অনেকরাত পর্যন্ত রাসমণির ঘুম আসিল না; বহুদিনের বহু কথা শুইয়া শুইয়া চিন্তা করিতে লাগিল। যে-বাড়ী পাড়ার মধ্যে দিনরাত আনন্দ-কোলাহলে সুখের থাকিত, বাড়ীতে লোক ধরিত না, সে-বাড়ীর ভূমিখণ্ডটুকুই এখন খালি অবশিষ্ট আছে। পাঁচ-সাতখানা ঘরের সবগুলাই সংস্কারভাবে একে একে মাটির সঙ্গে মিশিয়া টিবি হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে; মাত্র একখানি ঘরকে কোনরকমে শয়ন-যোগ্য করিয়া রাখা হইয়াছে। চারিদিককার বিস্তীর্ণ প্রাচীর বহু স্থানেই পড়িয়া গিয়াছে; সেখানে মাটির পাঁচিল তুলিয়া বাড়ীর আবরক রক্ষা করা হইয়াছে। যে-বাড়ীতে এক-বাড়ী লোক ছিল, আজ সেখানে দুটি মাত্র প্রাণী।

শুক্রপুঙ্কের অষ্টমী কি নবমী। মেটে-ঘরের ‘পরল’ দিয়া ঘরের ওপরের ‘কাঠামেয়ি’ জোৎস্নার আলো পড়িয়াছিল। রাত বোধ হয় বারোটোর কাছাকাছি। সমস্ত গল্পী সাড়া-শব্দহীন; শুধু উঠানের পেছারা গাছটায় বাহুড়ের ডানা-ঝাপ্টার শব্দ মাঝে মাঝে শোনা বাইতেছিল।

রাসমণির কিছুতেই ঘুম আসিল না; একটার পর একটা চিন্তা আসিল। তাহার মস্তিষ্ক আচ্ছন্ন করিল:—“একটা মাত্র ছেলে, তা’ও

ছিন্ন-বন্ধন

ভগবানের সইলো না। ত্রিশ বছর বয়সেই তাকে টেনে নিলেন। বৌটাও যদি আজ বেঁচে থাকতো! যেন যুক্তি কোঁরে একে-একে সবাই চলে গেল! পোড়ে রইলুম খালি আমি, আর ঐ একরত্তি গুঁড়োচুঁহু!” ধীরে-ধীরে শব্দের বৃক-পিঠে রাসমণি হাত বুলাইতে লাগিল।—“এত দুষ্ট হোয়ে উঠেচে! সেদিন ইচ্ছে কোরেই বাধারির বাড়ি মারটা খেলে! ও যদি দাঁড়িয়ে না পেকে তখুনি ছুটে পালিয়ে যেত, তা হোলে আর.....।”—শব্দের পিঠে ও. পাছায়, যেখানে রাসমণি সেদিন বাধারির বাড়ি মারিয়াছিল, গভীর দরদের সঙ্গে সেইখানে হাত বুলাইতে লাগিল।

(১০)

“কোথায় লো? অ সই!”—একটি বিধবা প্রৌড়া স্ত্রীলোক রাসমণির উঠানের মাঝে আসিয়া দাঁড়াইল।—“ওলো, ঘুমুচ্চিস্ না কি?”

রাসমণি ঘুমায় নাই, তবে মেজের মাহুর পাতিয়া গুইয়াছিল বটে। বাহির হইয়া আসিয়া কহিল—“কে রে? সই?”—বহুদিন আগে দু’জনে ‘সই’ পাতাইয়াছিল। দু’জনের বয়স বাড়িবার সঙ্গে-সঙ্গে সেই সম্পর্ক ক্রমেই গাঢ়তর হইয়া আসিয়াছে! সই উঠান হইতে দাওয়ার উঠিতে উঠিতে কহিল—“একবার দেখে জ্ঞান ‘নন্দী পুকুরে,’ কী কাণ্ড করচে তোরা নাতি!”

“সেত স্কুলে গেছে, সই।”

“নন্দী-পুকুরের জলে সে স্কুল বন্ধিরে কি-রকম পড়া করচে, একবার দেখে আর তুই ভাই, আমার মাথার দিকি! ক’টাতে মিলে পুকুর একেবারে তৌলপাড় করচে! কেঠা, ভট্টাচার্যদের জাপা, হুরোর ভাগমোটা, কাবাসীদের রেধো...সব ক’টা জুটেচে!...

গল্প-ভারতী

“সেত দশটার সময় খেয়ে দেয়ে, বই নিয়ে

“বই নিয়ে, তোর ‘ছরাদ’ কোচ্ছে কি রকম, একবার দেখে
আয়। ক’টায় মাতামাতি কোরে নন্দীপুকুরের পাঁক তুলে ফেলে!
তুই একটু শাসন কোরতে পারিস না লা?”

একটুখানি চুপ করিয়া থাকিয়া বিরক্তমুখে রাসমণি কহিল—
“কি করি বল দেখি সই? ওকে নিয়ে আমি ‘আতান্তরে’ পড়িচি,
আমার হাড়-মাংস কালি হোয়ে গেল!”

“ওকে তুই ফোনাতলী পাঠিয়ে দে, সেখানে ‘মামার কাছে থেকে
—একটু জব্ব হোক।”

ফোনাতলী মানে সোনাভলী, কিন্তু ‘সোনা’ কথাটা সইয়ের উচ্চারণ
করিবার উপায় ছিল না; কারণ তার স্বামীর নাম ছিল সনাতন।
সই কহিল—“দে দেখি সই, ওকে সেখানে পাঠিয়ে, দেখবি ও ঠিক
হোয়ে যাবে। তবে, তুই কি ওকে পাঠিয়ে দিবে থাকতে পারবি;
সেই হচ্ছে কথা।”

“কে আমি? খুব থাকতে পারব। বলে, একটা ব্যাটা একটা
বউ, তাদের খেলো থাকচি, আর ওকে সে আমি খুব পারব
সই, আর তাই আমাকে করতেই হবে। ওর মামাদের একথানা
চিঠি দি, তারা এসে ওকে নিয়ে যাক।”

সই—কি বলিতে যাইতেছিল, তার আগেই রাসমণি আবার
বলিতে লাগিল—“ওই শত্রুর জন্তে আমার সব গেল সই, আমার
পূজা গেল, আহ্নিক গেল, দোহা-কম্বো জপ-স্তপ সবই.. সেবার
কালী যাব বোলে সব ঠিকঠাক করলুম, কিন্তু...”

“ও লো, ভাল কথা! কিন্তু বহুবার জন্তে এলুম, তাই তুলে
যাচ্ছিলুম। ও-পাড়ার সব ওরা তীর্থী করতে যাচ্ছে; ও-মাসের
মার্খি-মার্খি সব যাবে। যাবি লা? সুরো ঠাকুরপো সব নিয়ে যাচ্ছে।”

খুব উৎসাহের সঙ্গে রাসমণি জিজ্ঞাসা করিল—“কে কে যাচ্ছে সই?”

“ওলো, ও-পাড়ার প্রায় সকলেই যাবে। বাঁড়ুব্যোদের মেজগিন্নী, পেয়ার মা, রাইপুরের বো, কেষ্ঠার পিসি, নেতা গুড়ী, রাখালী-বো, ভট্টচার্য্য-গিন্নী...সব যাচ্ছে। যাবি সই? চ’ ভাই, বাই হু’জনে। স্বরো ঠাকুরপো সঙ্গে যাচ্ছে; এমন স্বযোগ সই, হয়তো আর হোয়ে উঠবে না। কবে হয় ত টপ কোরে হু’জনে মরে যাবো, একটা আপশোষ...”

রাসমণি সইকে কথা শেষ করিতে দিল না; কহিল—“শোন্—
শোন্, কোথায় কোথায় যাবে বল দিকি?”

“ও তোর গিয়ে, অনেক যায়গায়ই যাবে; বস্তিনাথ থেকে আরম্ভ কোরে, কাশী, গয়া, মথুরা, বিন্ধ্যবন, পুন্ডর, হরিদ্বার—
কিছু আর বাকী রেখে আসবে না ওরা। যাবি সই?”

“তুই যদি যাস্ সই, তা হোলে আমিও যাব; নিশ্চয় যাবো!”

“শোকোটার কি ব্যবস্থা করবি তা হোলে?”

“ওকে ওর মামার বাড়ী পাঠিয়ে দোবো; ভর জন্তে আমি কিছু ভাবি না। আমি ভাবচি, কতগুলো টাকা লাগবে—সেই কথাটা; সেটা আবার যোগাড় করতে হবে ত?”

“শোন্ সই; ভরি হু’জার ফোনা যা আছে তা এইবেলা বেচে দে, ফোনার দর এখন খুব।”

অতঃপর হু’জনের মধ্যে তীর্থযাত্রার সংস্কে অনেককণ ধন্দিয়া আলোচনা ও পরামর্শ চলিল এবং ইহা হইল যে, হু’জনেই তীর্থযাত্রায় যাইবে এবং শঙ্করকে এখান থেকে লইয়া যাইবার অঙ্গ তাহার মামাদের চিঠি দেওয়া হইবে।

তীর্থযাত্রার উৎসাহে অনেক রাত পর্যন্ত রাসমণির ঘুম আসিল না। -কয়েক দিন আগে সেদিনও অনেক রাত পর্যন্ত তাহার ঘুম হয় নাই। তবে সেদিনের ঘুম না-হওয়ার মধ্যে আর আত্মিকার ঘুম না-হওয়ার মধ্যে প্রভেদ অনেক।

পরদিন শঙ্কর স্কুলে গেলে পর, রাসমণি আহালামি করিয়া, সদরে তালা বন্ধ করিয়া ও-পাড়ায় চলিয়া গেল। তার পরদিন সন্ধ্যার পর সুরেন ভট্টাচার্য্য আসিয়া উঠানে দাঁড়াইয়া ডাকিল—
“জ্যেষ্ঠাই মা, কোথায় গো?”

— রাসমণি ঘরের ভিতর হইতে বাহিরেব দাওয়ার আসিয়া দাঁড়াইল, কহিল—“কে, সুরেন? আয় বাবা, আয়; বোম্!”

‘কোথায় ফলে সোনার ফসল,
সোনার কমল কোটে রে!’

সে আমাদের বাংলা দেশ—
আমাদেরই বাংলা রে।

কোথায় ডাকে দোয়েল,...’

—ঘরের মধ্যে শঙ্কর এক মনে তাহার স্কুলের পড়া মুখস্থ করিতেছিল। সুরেন দাওয়ার উপর বসিয়া পড়িয়া শঙ্করের উদ্দেশে বলিল—“ওরে সোনার ফসল!”

শঙ্কর শুনিতে পাইল না; এক মনে পড়িয়া বাইতে লাগিল—
“কোথায় ফলে সোনার ফসল.

একটু উচ্চগলায় এবার সুরেন কহিল—“সোনার ফসল ফলবে শীগগির সোনাতলিতে রে!”

“কি বোলচেন, সুরো কাকা?”

“বলচি, সোনার ফসল—অর্থাৎ ‘ফলার’ ফলবার ভারী যোগাড়

হোচ্ছে যে তাঁর মামার বাড়ীতে। জেঠাই মা, কোন খবর পান নি আপনি?”

“না বাবা, কিছু ত জানি না।”

“কাল আমি সোনাতলী গিছলুম—নন্দীদের বাড়ীতে; শুনে এলুম, ওর ছোট মামার বিয়ে বে ও-মাসের ১২ই তারিখে। খুব ধুম-ধাম কোরে বিয়ে হচ্ছে। সানাই, নবৎ, আতসবাজী, ‘বাও’, বাজি, খাওয়ানো-দাওয়ানো—একেবারে ধুম ধড়াক্তা রূপার। আপ-নাদের নিয়ে যাবার জন্তে শীগগীরই ওর বড় মামা আসবে শুনে এলুম।”

“তাই না কি? তা’ কিছুই ত জানি না বাবা। তা নি—
আসে, শঙ্কুকে নিয়ে যাবে; আমি ত আর যেতে পারব না।”

কাণ খাড়া করিয়া শঙ্কর ঘরের ভিতর হইতে সব শুনিতেছিল; অত্যন্ত উৎসাহের সহিত জিজ্ঞাসা করিল—“থিয়েটার হবে সুরো কাকা?”

“হ্যাঁ, থিয়েটারও একরাত হবে শুনে এলুম।

রাসমণির ও সুরেনের দৃষ্টির মধ্য দিয়া কি একটা ইঙ্গিত খেলিয়া গেল, ও উভয়ে মুখ টিপিয়া একটুখানি হাসিল।

‘সোনার কসলে’র পাতাখানা শঙ্কর বন্ধ করিয়া বাহিরের দাওয়ার সুরেনের সামনে আসিয়া বসিল।

সুরেন তট্‌চায়া, রাসমণি প্রভৃতি মিলিয়া শঙ্করকে তাহার মামার বাড়ী পাঠানোর লক্ষ্যে যে পরামর্শ করিয়াছিল, তাহার প্রাথমিক ভূমিকার এইরূপে জমি প্রস্তুত করিয়া সুরেন সেদিন চলিয়া গেল এবং দু’এক দিনের মধ্যে তাহাকে রাসমণির ‘তরফ হইতে সোনাতলীতে শঙ্করের মামাদের কাছেও বাইতে হইল। ইহার ফলে, দিন পনেরো পরে শঙ্করের বড় মামা একদিন এ বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং শঙ্করকে সোনাতলী লইয়া গেল।

গল্প-ভারতী

পথে যাইতে যাইতে মহানন্দে এবং পরমাৎসাহে শব্দর বড়
মামাকে লিঙ্কাসা করিল—“থিয়েটার হবে, বড় মামা?”

“নিশ্চয়ই”—বলিয়া বড় মামা একটা কিংড়ি ধরাইয়া টানিতে লাগিল।

(৪)

‘ই আই আর’য়ের বৈচি টেশান।

স্বপ্নে ভট্টাচার্য্যর অধিনায়কত্বে ন পাড়ার একদল তীর্থযাত্রী
দ্বীলোক প্রায় খণ্টাখানেক হইল প্র্যাট্‌ফরমের একধারে জটলা পাকাইয়া
—পশ্চিমের গাড়ীর জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। বেলা নয়টার মধ্যে
সকলে আহারাদি করিয়া বাহির হইয়াছিল। একে কাঁচা রাত্তা,
তা’তে গরুর গাড়ী, সুতরাং আড়াই কোশ পথ অতিক্রম করিয়া
টেশানে পৌছাইতে বেলা প্রায় ছপুরের কাছাকাছি হইয়াছিল।
তাহার কিছু আগেই একখানা গাড়ী চলিয়া যাওয়াতে, পরের গাড়ীর
জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় ছিল না। পরের গাড়ী আসিতে
এখনো ষণ্টাদেড়েক দেরী।

বাড়ুয়াদের মেজগিষী পেমার মার পিঠে একটা ঠেলা দিয়া
বলিল—“হ্যাঁ লো, ঐ অত তেঁতুল পুটলি বেধে এনেচিস্ কি জন্তে?
বিন্দাবনে গিয়ে কি তেঁতুলের দোকান খুলবি?” পেমার মা কথটা
শুনিয়াও কানে তুলিল না; সে তখন রাইপুরের বোর সঙ্গে তর্ক
জুড়িয়া দিয়াছিল যে, বদ্দিনাথের শিবের চেয়ে তারকেশ্বরের শিব
বেশী জাগ্রত এবং বহুদিন আগে, তার গোষ্ঠার হাঁপানী রোগের
জন্ত সে দুইদিন মাত্র ‘বুবার ঝাঁনি’ হত্যা দিয়া কি ভাবে কেউটে
সাপের খোলস মুঠার মধ্যে পাঠিয়াছিল এবং মুঠা খুলিতেই উহা
একখানা বাতাসাতে রূপান্তরিত হইয়াছিল—সেই বিস্ময়কর কাহিনী
বর্ণনা করিতেছিল। নেতাখুড়ী তার অপের মালাটা নামাবলীর একটা

খুঁটে বাধিয়া আনিয়াছিল, কিন্তু এখন দেখে নামাবলীর খুঁটে কিছু বাধা নাই। তাই সে তন্ন-তন্ন করিয়া তাহার পোটলা-পুটলী খুঁজিতে বাস্ত। রাখালী-বো কহিল—“তা হোলে তুই আনিস নি, ঠাকুরমি; আনলে পরে আর যাদে কোথায়?”

চোখ দুইটা কপালে উঠাইয়া নেতাকালী কহিল—“ও মা! বলিস কি বউ! অপের মালাছড়াটা আমি যে নামাবলীর খুঁটে বেধে নিলাম, আমার বেশ মনে পড়চে।” কিন্তু বেশ মনে পড়িলেও; অপের মালায় কোন সন্ধানই নেতাকালী করিয়া উঠিতে পারিল না। সুতরাং ভীর্থযাত্রার প্রথম পরিচ্ছেদেই মনটা তাহার খিচড়াইয়া গেল। অরেন ভট্টাচার্য্য একবার গুরুগাড়ীগুলার ভিতর খুঁজিয়া আসিল, যদি বাধন খসিয়া গাড়ীর মধ্যে আশে-পাশে কোনও স্থানে পড়িয়া গিয়া থাকে। গাড়ীগুলো তখনো ছিল। গাড়োয়ানরা গুরুগুলোকে খুলিয়া দিয়াছিল। তাহারা ‘জাবনা’ খাইয়া অশথ-তলায় শুইয়া পড়িয়া বিশ্রাম করিতেছিল; তাহাদের মনিবেরাও বিড়ি টানিতে-টানিতে ও গল্প করিতে করিতে বিশ্রামস্থল উপভোগ করিতেছিল। সব গাড়ী কয়টা খুঁজিয়াও কিছু মালা পাওয়া গেল না। হতাশ হইয়া অরেন ভট্টাচার্য্য কিরিয়া আসিল।

কিন্তু কিরিয়া আসিয়া দেখিল, ভট্টাচার্য্য-গিন্নীর মধ্যে আর রাসমণির সেই সইয়ের মধ্যে বিষম বচসা বাধিয়া গিয়াছে। ভট্টাচার্য্যগিন্নী হাতমুখ নাড়িয়া সইকে বলিতেছে—“আমি একপোটলা চিড়ে নিয়েছি, তাতে তোমার কি? আমি ভালো বুকেছি, নিয়েছি; তাতে তোমার চোখ টাটাচে কেন?—কি বল নৌ পেমার মা?”

“তা ত বটেই দিদি। বিদেশ-বিভূই; কোথায় কি পাওয়া যাবে, না-যাবে; বলে—‘নিজের বল, বড় বল’। আমি তাই বেশী কোরে খানিকটা তেঁতুল-

গল্প-ভারতী

তাহার কথাকে শেষ করিবার অবসর না দিয়া সই বলিল—
“আমিই কি আর বলিচি বলো ? অপরাধের মধ্যে বলিচি, মাহুষ ত
তুমি একলা, একরাশ চিঁড়ে নিয়ে

ফোস করিয়া ভট্টাচার্য্য-গিন্নী বলিল—“তা-ইবা তুমি বলবে কেন ?
তুমি সব-ভাতেই কেমন ঠেস্ মেরে কথা বলো ।”

“আমার ঘাট হোয়েচে দিদি, আমার চোন্দপুরুষের ঘাট হোয়েচে !”
বলিয়া সই তাহার নিজের পেঁটলাটা খুলিয়া একটা বালির কোটা
বাহির করিল। তন্মধ্যে সে পানে-খাবার দোকান ভরিয়া নিয়াছিল।
দোকানখোলা ছোট একখানা জ্বাকড়ায় বাঁধিয়া লইয়া, খালি কোটাটা
ভট্টাচার্য্য-গিন্নীর সামনে রাখিয়া কহিল—“দিদি, তোমার কোটাটা
তুমি নাও।” তারপর নিজের মনে ফিস্-ফিস্ করিয়া কহিল—“বাবা !
দরকার নেই আমার কোটাতে ! কথায় বলে—পরের কোনা দিও
না কাণে, প্রাণ যাবে তোর হেঁচ্কা টানে !”—বলিয়া বিরস এবং গভীর
মুখে একধারে সরিয়া বসিল।

কোটাটি ভট্টাচার্য্য-গিন্নীর ; দোকান রাখিবার জন্ত সই চাহিয়া
লইয়াছিল।

সরিয়া বসিয়া সই একবার অদূরে উপবিষ্ট রাসমণির দিকে
তাকাইল ; দেখিল, রাসমণি চুপ করিয়া একটি ধারে বসিয়া রহিয়াছে,
আর তাহার সমুখে স্থরেন ভট্টাচার্য্য দাড়াইয়া পেনসিল দিয়া কিসের
হিসাব টুকিতেছে।

হিসাব-টোকা শেষ হইলে স্থরেন ভট্টাচার্য্য রাসমণির দিকে চাহিয়া
জিজ্ঞাসা করিল—“ঝেঠাইমা চুপটি কোরে কেনে কি ভাবছেন বলুন
ত ? কোনও কিছু ভুলে-টুলে আসেন ন্তি ত ? , আপনার মালা-টালা ?”

“না, বাবা। আচ্ছা স্থরেন, সামনের ঐ পাকা রাস্তাটা কোথায়
গেছে ?”

“ওটা বরাবর ‘দে-গঙ্গা’ ‘সোনাতলী’ হোয়ে বর্ধমান গিয়ে পড়েচে। এখান থেকে আপনার শতুর মামার বাড়ী কোশ দুই পথ হবে আর কি। আমাদের গা থেকে যদি সিঁদে সোনাতলীর যে পথ আছে, তাতে এলে খুব শোজা হয়; বৈঠী দিয়ে এলে অনেকটা ঝাঁক হয়।”

“গাড়ীর আর কত দেবী, বাবা?”

“না, জ্যেঠাইমা; আর বড় দেবী নেই। এইবার টিকিটের ঘণ্টা পড়বার সময় হোল আর কি।”

“আচ্ছা, কখন আমরা বদিনাথ পৌছবো?”

কিন্তু উত্তর দিবার আর অবসর ঘটিল না। ঠং-ঠং-ঠং-ঠং ~~গর্জিয়া~~ টিকিটের ঘণ্টা বাজিয়া উঠিল এবং সুরেন ভট্টাচার্য্য ভাড়াভাড়ি সকলের নিকট গিয়া টিকিটের ভাড়া চাহিয়া লইতে লাগিল।

প্রথমেই রাসমণির নিকট চাহিলে, রাসমণি পেট-কাপড়ের গিঁট হইতে টাকা বাহির করিতে গিয়া কহিল—“দিচ্চি বাবা; ওদের কাছ থেকে ততক্ষণ নিয়ে আয়।”

একে একে সকলের কাছ হইতে টাকা লইয়া সুরেন ভট্টাচার্য্য আবার রাসমণির সামনে আসিয়া দাঁড়াইল; বলিল—“দাও, জ্যেঠাইমা, শীগ্গীর বাও।”

রাসমণি যেমন বসিয়াছিল, তেমনি বসিয়া রহিল। সুরেন কহিল—“দাও জ্যেঠাইমা, শীগ্গীর।”

“আমি দোবো না বাবা; আমি যাব না।”

“সে কি?”

“হ্যাঁ, বাবা, যাব না আমি। তুই কিছু মনে করিস্নি, শ্রাণিক আমরা।”

“যাবে না তুমি?”

“না।”

“তা হোলে, তুমি বাড়ী ফিরে যাবে?”

গল্প-ভারতী

“তাই যাবো। তবে, এখান থেকে এখন আমি সোনাভনী যা’ব।”
সকলে অবাধ হইয়া গেল। কিন্তু অবাধ হইয়া থাকিবার
আর সময় ছিল না। স্নেহে ভট্টাচার্য্য তাড়াতাড় টিকিট করিতে
গেল। সেই সকলের চেয়ে আশ্চর্য্য হইল এবং রাসমণিকে নানারূপ
প্রশ্ন করিতে লাগিল। রাসমণি কোন কথারই জবাব না দিয়া চুপ
করিয়া বসিয়া রহিল। শুধু তাহার মুখে ঐ একটুখানি ছোট উত্তর—
“না, আমি যাব না।”

বানিকপরেই হুস্-হুস্ শব্দ করিতে করিতে পাশ্চিমের গাড়ী আসিয়া
পাড়া এবং সকলে তাড়া-হড়া ও হাক-ডাক করিতে করিতে গাড়ীর মধ্যে
উঠিয়া পড়িল। শুধু রাসমণিই তেমনি ভাবে তাহার পোটলা-পুঁটলি
লইয়া সেই শূন্য প্ল্যাটফরমে রহিল এবং কিছুক্ষণ পরে ধীরে ধীরে
উঠিয়া, সম্মুখের সেই সোনাভনী যা’বার পাকা রাস্তার উপর আসিয়া
দাঁড়াইল।

পরিব্রাজক বিবেকানন্দ। নির্জন বনের মধ্যে পুষ্করপুটে স্থান
করছেন। পাড়ে, কাপড়খানি ছেড়ে রেখেছেন। ডুব দিয়ে মাথা
জুড়ে দেবেন, তাঁর কাপড় নেই। বানরে নিয়ে গিয়েছে।

সন্ন্যাসী বলেন, যদি ভোমার ডাই ইচ্ছা হয়, বর দেহেই
যাব সংসারে...

কয়েক পা অগ্রসর হয়েছেন, এমন সময় দেখেন একজন লোক,
একখানি স্তম্ভবস্ত্র নিয়ে তাঁর পিছু পিছু হুটে আসছে।

—ঠাকুর, আমি দেখছি সব...তাই আপনার সঙ্গে বস্ত্র নিয়ে
এনেছি...

সন্ন্যাসী ফিরলেন...দেখেন, পুকুরের পাড়ে ঠিক সেই ব্যাগার
—তাঁর পুরাণো কাপড় পড়ে রয়েছে।

পরের বোঝা

১৫

নরেন্দ্র দেব

মিথুর অস্থখ। চিকিৎসায় কিছু হল না। হাওরা বদলাতে যেতে হবে। হাজারীবাগে চিঠি দিলুম। একখানি ভাল বাড়ী চাই। সতীশ লিখলে—বাড়ী ঠিক হয়েছে। কিন্তু এখানে কেরসিন মেলা কঠিন। আসবার সময় একটিন কেরসিন সঙ্গে আনবেন।

চায় বছর নিশ্চরীপের তমসায় আছি। বাইরে গিয়ে ~~দুটি~~ পাব না? মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সন্ধ্যার পর ঘরদোর অন্ধকার থাকবে? হাজারীবাগ তখন কত যে বিরাগ উপাদান করবে কল্পনা করে দমে গেলুম।

সতীশকে জানালুম হাজারীবাগ যাব না। বাড়ী ছেড়ে দাও। ইলেকট্রিক আলো আছে এমন জায়গায় যেতে চাই।

স্রী বললেন—ডিহিরীতে ‘লাইট’ আছে। জায়গাটাও ভাল। জামাইকে লেখ না বাড়ীর জন্ত।

লিখলুম। বাবাজী উত্তরে জানালেন—এখানকার সমস্ত বাড়ী দু’মাস আগে এনগেজ হয়ে গেছে। আপনি আসবেন আগে জানান নি কেন? যাই হোক, ভাল বাড়ী একখানিও খালি নেই।* মাঝারী বাড়ী একটা পেয়েছি। কিন্তু, পুজোর আগে খালি হবে না। যদি পুজোর পর আসার ঐচ্ছাবিধা না হয়, জানাবেন। বাড়ীখানি হাতে রাখবো।

স্রী বললেন—মন্দ কি! পুজোটা দেখেই বেকরো যাবে।

আমিও ভাবলুম—পাড়ায় মার্কজরনী পুজো। আমাকেই তারা প্রেসিডেন্ট করেছে। থাকাটা উচিত।

গল্প-ভারতী

সেই মর্মে জামাতাকে লিখে দিলুম যে—যে-হেতু মিছুর অস্থখটা আগে হয়নি, তাই বাড়ীর জন্তও ভোমায় আগে লিখতে পারিনি। অগত্যা পূজোর পর যেটি পাওয়া যাবে লিখেছি, সেটি খালি হলেই ‘এনগেজ’ করে আমাকে জানাবে।

পূজো গেল। লক্ষ্মীপূজাও কাটল। কালীপূজা সামনে এগিয়ে আসছে। কিন্তু ডিহিরী থেকে বাবাজীর কোনো খবর নেই। মিছুর অবস্থারও উন্নতি হয়নি। ডাক্তার তাগিদ দিচ্ছে-বাইরে নিয়ে যান।

রোগ পুরাণো করবেন না।

জামাইকে লিখলুম এবার বেশ একটু রেগেই—বাড়ীর কি হল পত্রপাঠ জানাবে। আজকালের ছেলেদের কি কিছুমাত্র দায়িত্ববোধ নেই? যদি পারবেই না, তবে ভরসা দিয়েছিলে কেন?

পত্রোত্তরে বাবাজীর লিখনখানি পেয়ে একেবারে চকুস্থির। ‘ঋদের পূজোর পর বাড়ী ছেড়ে দেবার কথা ছিল, তাঁদের একটি ছেলের হঠাৎ টাইফয়েড হয়ে পড়ায় তাঁরা বেকসুর পায়ে নি। ছেলোট একটু সুস্থ না-হওয়া পর্যন্ত তাঁদের এখানে আটকে থাকতে হবে। উপায় নেই। বাড়ী পাওয়া যাবে ভরসা দিয়ে অপরাধ করে ফেলেছি।’... চিঠি পড়ে বুকলুম বাবাজীও চটেছেন!

টাইফয়েডের কোর্স একুশদিন থেকে একষষ্ঠি দিন পর্যন্তও লম্বা হতে শুনেছি। ডিহিরীর বাড়ীর আশায় অনির্দিষ্টকালের জন্য অপেক্ষা করে থাকু চলে না। এই সময় একটি বন্ধু ‘রাজগীর’ যাচ্ছেন শুনে মিনতি করে তাঁকে বললুম—পৌছেই আমার জন্তে একখানি বাড়ী ঠিক করবেন দাদা! শুনেছি ওখানে যে ‘হট-স্ট্রীং’ আছে তার জলে স্নান করলে নাকি সর্বস্বরাগ মুক্ত হওয়া যায়।

বন্ধুটি ভরসা দিলেন বাড়ী দেখবেন। কিন্তু হেসে বললেন—রাজগৃহের

উষ্ণ প্রস্রবণটি ত' আর পুণ্যসলিলা জাহ্নবী নয় যে অবগাহনে কোটি জন্মের পাপ ক্ষয় হবে ?

আমি বললেম—ভাগীরথী জলে এক জন্মেরই পাপ ক্ষয় হয় কিনা সে তো আমরা কিছু বুঝতে পারিনি কিন্তু হট-প্রাংয়ে নেয়ে যে রোগক্ষয় হয় এটার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাই।

বন্ধুবর একটু অপ্রসন্নমুখে বললেন—আচ্ছা, বাড়ী দেখব।

তিনি কথী রেখেছিলেন। দু'একদিনের মধ্যেই তাঁর পোস্টকার্ড পেলুম। বাড়ী ঠিক হয়েছে। সুন্দর বিস্তল বাড়ী। প্রায় ~~নতুন~~ তবে দীর্ঘকাল খালি অবস্থায় পড়ে থাকায় একটু অপরিষ্কার হয়ে আছে। ভাড়া খুব সুবিধা। মাসিক তিরিশ টাকা মাত্র! এখানে এই একখানি মাত্র বাড়ীই খালি আছে, আর সব বাড়ীতেই লোক এসেছে। এমন কি ধর্মশালাগুলি সম্পূর্ণরূপে যেন গো-শালা হয়ে উঠেছে। অতএব সত্তর চলে এস।

আনন্দে সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো!

রাজগৃহ। একাধারে ভারতের ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক পুণ্য ক্ষেত্র। এইখানেই মহাবলী ভীমসেন প্রবল পরাক্রান্ত অরাসন্ধ রাজাকে বধ করেছিলেন। পঞ্চপাণ্ডবের পবিত্র স্মৃতি বিজড়িত, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মপ্রচারের নীলাভূমি এই রাজগীর। তাহাড়া বাস্যকালে-ভূগোলে পড়া সেই ছেলেবেলাকার প্রচণ্ড বিষয়—‘উষ্ণ প্রস্রবণ’ এখানে দেখতে পাবো। শুনেছি চালফেলে দিলে নাকি ভাত হয়ে যায়!

উল্লাসে চিৎকার করে ডাক দিলাম—গিন্নী! বৌচকা-বুঁচকি বাধো। চপো কালই রওনা হই। রাজগীরে বাড়ী স্থির। গিন্নী ছুটে এলেন। তাঁরও হাতে এক পোস্টকার্ড। বললেন—ওই রাজগীর থেকেই ত' দেখছি শ্রামল আমাদের বিজ্ঞান প্রণাম জানিয়েছে।

বললুম—ভালই হয়েছে। তোমার ভাইপোটি যখন পূজার ছুটিতে জুথাক্নেই বেড়াতে গেছে, তাকেই লিখে দাও যে, আমাদের নেওরা বাড়ীখানা ও যেন লোকজন দিয়ে কাড়িয়ে মুছিয়ে ধুইয়ে রাখে। আমরা নিম্নকে নিয়ে ওখানে যাচ্ছি।

গিন্নী প্রচণ্ড উৎসাহ নিয়ে তখনি ছুটলেন লিখতে।

স্বামল পিসির চিঠি পেয়ে পরদিনই জানালে—বাড়ীখানি ভালই পিসিমা। কিন্তু মিছকে নিয়ে এবাড়ীতে আসা উচিত হবে না। খবর পেলুম একটি টি-বি ক্রগী এই বাড়ীতে দীর্ঘকাল ছিল এবং এই খানিই সে মারা যায়। সেই থেকে আজ প্রায় ছ'মাস হল বাড়ীখানা খালি পড়ে আছে। কেউ ভাড়া নিতে চায় না।

পত্নী চমকে উঠলেন। টি-বি তে মারা গেছে! ছ'মাস হয়নি? ওই বাড়ীতে? বাপরে! আমার রোগা মেয়ে মিছ, তাকে নিয়ে কি—

সজোরে ঘাড় নেড়ে গভীর কণ্ঠে বললুম—কখনই না।

রাজগৃহের স্বপ্ন বাতাসে মিলিয়ে গেল। হায় জরাসন্ধ! হায় ভীমসেন! কোথায় ভেঙ্গে গেলেন। তথাগত বুদ্ধ আর জৈন তীর্থঙ্করের দল। আর...আমার বড় আশার 'ঊষ প্রস্রবণ' নিমেষে যেন হিম শীতল হয়ে গেল!

তাইত! কি করা যায়। বীরেন্দ্র ভায়া দেওঘরে রয়েছে। তাকে একখানা বাড়ী ঠিক করবার জন্ত লিখে দেব কি?

স্ত্রী বললেন—না। সে বৈচারি গেছে শরীর সারতে। তাকে আর উত্থাপ্ত করতে হবে না। এইত ভোলানাথ! সেদিন আশা বোদির জন্ত বাড়ী ঠিক করতে গিয়ে সারা দেওঘর চুম্ব এসেছে। একখানি বাড়ীও খালি নেই সেখানে।

অগত্যা নিরুপায়ের মতো বসে থাকা ছাড়া গত্যন্তর কি?

স্ত্রী মুখভার করে রয়েছেন। মিহু যোজাই প্রশ্ন করে—বাবা !
আমরা কবে বাইরে যাবো ?

‘বাড়ী পেলেই যাব মা ।’ এই বলে মেয়েকে প্রবোধ দিই । কিন্তু
মনের মধ্যে একটা অশান্তির খোঁচা লেগেই থাকে ।

মিহুর মামা আর মামী নার্সিং থেকে লিখলে—মিহুকে নিয়ে দিন-
কয়েকের জন্ত এখানে ঘুরে যান না ।

ক্যালিফোর্নিয়ার পাতায় দেখা গেল—নভেম্বর শুরু হয়েছে । ডাক্তারবাবু
বললেন—এত ঠাণ্ডায় পাঁহাড়ে নিয়ে যাওয়া চলবেনা ।

চলবেনা যে সেটা আমিও বুঝি । কিন্তু, যাই কোথা ? এহেন
অসহায় অবস্থায় অকস্মে বন্ধ খগেনবাবুর সঙ্গে একদিন দেখা হয়ে
গেল । জিজ্ঞাসা করলেন—আপনারা এখনও যাননি কোথাও ?

বাড়ীর সমস্তা সবিস্তারে তাঁকে জানালুম । তিনি বললেন—আমার
বাড়ীত’ খালি পড়ে রয়েছে । আপনারা চলে যান সেখানে ।

বাড়ী তাঁর সাঁওতাল পরগণার একটি প্রসিদ্ধ স্বাস্থ্যকর স্থানে
কিন্তু বিপদ হল, সেখানেও ইপেকটিক নেই । তিনি আর কেরাসিন
কন্ট্রোলের কবলে অবরুদ্ধ । কাজেই তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে সবিনয়ে
জানালুম যে দীর্ঘ চার বছরের ব্লাক-আউটেও আমি অক্ষত করে অভ্যস্ত
হ’তে পারিনি । দেখানে গিয়ে কেরাসিনের জন্ত আমি ‘কিছু’ দিতে
পারবনা । তাছাড়া, সেখানে আমার এমন কোনও পরিচিত ‘চিক্কামপি’
নেই যিনি আমাকে টিনি বোগাবেন ।

খগেনবাবু খুব হেসে উঠে বললেন—আমি যদিও চিক্কামপি নই,
তাই’লেও আপনাদের টিনি জুর কেরাসিন বোগাবার ভারটা আমিই
নিগুম ।

উদারজন্ম খগেনবাবুর কাছে এই অভয় পেয়ে ‘দুর্গা’ বলে আমরা

বেরিয়ে পড়লুম। তিনি আমাদের সঙ্গে বাড়ীর সমস্ত ঘরের একতাতা চাবি দিয়ে দিলেন। মালীর নামে চিঠি দিলেন। পথের হৃদিস বাংলা দিয়ে বাড়ীর নক্সা এঁকে এমনভাবে বুঝিয়ে দিলেন যাতে অক্লোকেও চোখ বুজে সেখানে পৌছতে পারে।

বাড়ীর সামনে কম্পাউণ্ড ও বাগান ত' আছেই। চণ্ডা রাস্তার উপর বাড়ী। পশ্চিমমুখী বাংলা। ফটকের সামনে মাইলের পর মাইল একেবারে খোলা। দিগন্ত বিস্তৃত বিশাল প্রান্তর। স্বাস্থ্যকর পশ্চিমে হাওয়া অবাধে সারাদিন খেলে যায় তাঁর বাড়ীতে। খগেনবাবুর মুখে বাড়ীখানির চিত্তাকর্ষক বর্ণনা শুনতে শুনতে সমস্ত মন আনন্দে উৎফুল্ল হ'য়ে উঠল। মানসচক্ষে আমরা যেন সেই প্রবাস-গৃহের রমণীয়ত্বটুকু কল্পনা ক'রে মুগ্ধ হয়ে গেলুম! সেখানে ছুটে যাবার জন্ত চিন্তা চঞ্চল হয়ে উঠলো। গাড়ী ব্রিজার্ডের হাঙ্গামায় দেবী হয়ে যেতে পারে আশঙ্কা করে আমরা পরদিন দুপুরেই সপরিবারে বেরিয়ে পড়লুম।

খগেনবাবু বারবার বিশেষ করে বলে দিয়েছিলেন—কিছুই আপনাদের সঙ্গে নিতে হবেনা। সংসারের যাবতীয় প্রয়োজনের বস্তু জীবন যাত্রার জন্ত আবশ্যকীয় সমস্ত সরঞ্জাম সেখানে সাজানোই আছে। মায় বিছানা বালিস লেপ কম্বল ইত্যাদি শয্যাভ্রব্যও নিতে হবেনা।

কিন্তু তা' সংখ্যেও গ্রহণী দেখি খুব কম করেও অন্ততঃ তেরটি লাগেজ সঙ্গে নিয়েছেন! আমি ঘোরতর আপত্তি করায় রোগে উঠে কললেন—কিছু নিতে হবে না মানে কি? অস্ত্রের বিছানায় শুয়ে আমি আরামে ঘুমুতে পারবনা। তাই, এ ছোটো বিছানার লাগেজ নিয়েছি। লেপ-কম্বল-তোষকে একটু মোটা দেখাচ্ছে। শীতের বিছানা-ওর চেয়ে কম হতে পারেনা।'

তিনটে স্নাটকেস দেখে চমকে উঠেছ? তোমার, আমার, মিছর কোট, ওভার-কোট, ট্রাউজার পুলওভার শাল জুগোয়ান মোজা টুপী এগুলো নিতে হবে, না হবে না? সামনে পৌষমাস, পশ্চিমের শীত!

আমি একটু ইতস্ততঃ করে বললুম, তা যেন চল—কিন্তু ও ছুটো ষ্টীলট্রাক আবার কেন?

“হাঃ! পরবার ধুতি শাড়ী সেমিজ ব্লাউজ স্নাট আভার-ওয়ার এগুলো দরকার হবে না? তোয়ালে গামছা ঝাড়ন এগুলো নেব, না নেবনা? চুপ করো তুমি। কিছু অদরকারী জিনিষ ~~আমি~~ নিইনি।

নতমুখে নিরন্তরে আর একবার লাগেজগুলো গুণে নিলুম। বিছানার লাগেজ দুটো। স্নাটকেস তিনটে। ষ্টীলট্রাক দুটো। ওষুধের বাস একটা। আমার হাঁকো কলকে গড়গড়া নল তামাক টিকে এক প্রহ! মনটা খুলী হ’ল দেখে। গৃহিণীর প্রেম তবে এঅধমের প্রতি আকর্ষণও পরিপূর্ণ আছে!

—কিন্তু, ইকমিক্ কুকার আবার কেন?

—খাক সঙ্গে। যদি কোথাও আউটিংয়ে বাই, দরকার হবে।

—এটা কি?

—আঃ! ও আমার ঠাকুরপুজোর সন্ধ্যাম। তোমরা হিঁদুয়ানী তুলে দিয়েছ বলেত’ আর আমরা এখনও খ্রীষ্টান হ’তে পারিনি।

—কিন্তু এ গ্রামোফোনটা ঘাড়ে করে চললে কেন?

—বুঝতে পারবে কেন, যখন সঙ্কেতর অন্তকারে হ্যারিক্যান আলো দেখে পালাতে চাইবে না এবং রেডিওর অভাবে মেজাজটা মুন্ডে পড়বে—

—আচ্ছা, আচ্ছা, থাক। ওটা আবার কি গো?

গল্প-ভারতী

—ঠাকুর চাকরের বিছানা আর কাপড় চোপড় গো!

নাঃ একটাও বাদ দেবার উপায় নেই! ‘আনলাকি থার্টিন’ লাগেজ নিয়েই একটা ঘোড়ার গাড়ীতে উপরে নীচে ভিতর বার ঠেসে রওনা হলুম।

মুন্ডিলে পড়লুম হাওড়া ষ্টেশনে গিয়ে। সেকেণ্ড ক্লাশ টিকিট থাকলে কি হবে? লাগেজগুলো যথাসম্ভব ব্রেকে দিয়ে গাড়ীতে উঠতে গিয়ে দেখি থার্ড ক্লাশের চেয়েও বেশী ভীড়। এক বৃদ্ধ ভদ্রলোক প্র্যাটফর্মে ছুটোছুটি করছেন আর বলছেন—
~~হঠাৎ~~ কায়ের বাজারে কিছু পয়সা পিটে যত সব থার্ড ক্লাশের লোকগুলো হুসু করেছে সেকেণ্ড ক্লাশে ভীড় করতে। যাক লড়াইত’ থেমেছে। এইবার দেখা যাবে। বাছাধনদের সব লটবহর নিয়ে এইবার মালগাড়ীতে যেতে হবে।

পন্থী ও কস্তার হাত ধরে এগাড়ী ও-গাড়ী উকি মেয়ে দেখি—কোথাও “নস্থানং পোন্ত ধারয়েৎ!” লেডিজকম্পার্টমেন্টে একেবারে ‘অল ইণ্ডিয়া উইমেনস্ কনফারেন্সের’ চেয়েও ভীড়। সমস্ত গাড়ীখানায় যেন সিনেমার ‘হুউসফুল’ বোর্ড আঁটা। হঠাৎ চোখে পড়ে গেল একখানা ফোরবার্থ সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেন্টের একটা বেঞ্চে একজন স্থলকায় লম্বোদর ভদ্রলোক বিছানা পেতে হুঁড়ি তুলে শুয়ে আছেন। অপর বেঞ্চে জনপাঁচের ছোকরা গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করে বসে। ভিতরে কেউ দাঁড়িয়ে নেই দেখে উঠে পড়লুম স্ত্রীকন্ডাকে নিয়ে মরিয়া হয়ে সেই গাড়ীতেই।

একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা গাড়ীতে উঠে দাঁড়িয়ে রয়েছেন দেখেও সেই শায়িত লম্বোদর ব্যক্তিটি একটুও নড়বার লক্ষণ প্রকাশ করলেন না।

• অপর বেঞ্চের ছোকরারা আশা করছিল যে হয়ত সেই অনন্ত-শয়নে শায়িত বিশ্বস্তর নারায়ণ, মহিলার সম্মান রাখতে বিছানাটা একটু

গুটিয়ে নিয়ে তাঁকে বসবার জায়গা দেবে। কিন্তু গরুড়বাহনের নির্ভীকায় অবস্থা লক্ষ্য করে শেষে তারাই একে একে উঠে টাড়ালো এবং আমার সঙ্গেই সেই সুন্দরী সহযাত্রীটিকে বসবার জন্ত আসন ছেড়ে দিলে।

আমার পক্ষী তাঁদের ধনুবাদ জানিয়ে বললেন—না না, আপনারা বহুন। এমন অত্যাচার করতে পারবেনা। আপনাদের পাঁচজনকে দাঁড় করিয়ে রেখে নিজে বসবে এতটা স্বার্থপর এদেশের মেয়েরা এখনও হয়নি। তার চেয়ে আমি বরং এই স্বহস্তে সবল বিপুলকায় ভদ্রলোকটির দিবানিজার যদি একটু ব্যাঘাত করি তাতে অপরাধ বোধ করব—কিন্তু হতে পারে—বলতে বলতে তিনি ভদ্রলোকের প্রায় পায়ের উপরই বসে পড়বার উপক্রম করলেন, ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি তাঁর পাছ'খানি বাঁচাবার জন্ত বিদ্যুৎবেগে সরিয়ে নিলেন। কারণ আমার অর্দ্ধাঙ্গিণীর সৌন্দর্য্যের খ্যাতি থাকলেও তাঁর পুষ্ঠাঙ্গ কলেবর ওজনে প্রায় ছ'মনের উপর হবে। তাঁকে ঠিক হাল আমলের 'তরী' বলা চলে না।

ছোকরাগুলি অতি ভদ্র। তারা কেউ মুখ ফিরিয়ে, কেউ মুখে রুমাল চাপা দিয়ে অতিকষ্টে তাদের উচ্ছৃঙ্খিত হাস্যবেগ সত্বর করছিল।

আমার স্ত্রী ভদ্রলোকের আরামের ব্যাঘাত উৎপাদন করলেন। আমি ভদ্রতার খাতিরে তাঁর ক্রকুটিপূর্ণ মুখভাবকে প্রসন্ন করবার চেষ্টায় বিনীতভাবে বললাম—অপরাধ নেবেন না ম্যার। আপনার বেশ একটু অসুবিধা হল দেখছি। কিন্তু মুক্তিলাভ হয়েছে কি জানেন? আপনি যেমন চলন্ত ট্রেনে নিইক বসে বসে যেতে পারেন না, এই ভদ্র মহিলাটিও তেমনি চলন্ত ট্রেনে মোটেই দাঁড়িয়ে যেতে পারেন না। তাইত' ঠেকে বলি আমি, যে, ভাগ্যে ভূমি অক্ষিদের কেরাণী হয়ে জন্মাওনি, তাহলে তোমাকে সেই টালিগঞ্জ থেকে ড্যানহাউসি স্কোয়ার দুবেলা-ট্রামে দাঁড়িয়ে যেতে হ'ত।

গল্প-ভারতী

ভদ্রলোকের কোলা ব্যাঙের মতো চাপটা নাকওয়ালা খাবড়া মুখে, ঈষৎ একটু কুত্তীরসদৃশ হাসি ফুটে উঠল। হাসির আমেজটুকুতে ভরসা পেয়ে আমি সেই জলহন্তী প্রমাণকে জিজ্ঞাসা করলুম—মহাশয়ের কতদূর যাওয়া হবে?

তিনি—একটু গমগদ কণ্ঠে বললেন—কানী চলেছি। শেষজীবনটা বাবা বিশ্বনাথের চরণেই আশ্রয় নেব।

মনে মনে বললুম—মণিকর্ণিকার ঘাটে তিনি যেন আপনাকে চির-শাস্তিময় ক্রোড়ে স্থান দেন। প্রকাশে বললুম—তাইলে আপনার বিশেষ ~~কিছু~~ ~~অবস্থা~~ বিধা হবেনা। আমরা সন্ধ্যা নাগাদ নেমে যাচ্ছি। তারপর আপনি সারারাত নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমবেন।

হোকরাদের মধ্যে একজন বলে উঠলো—অমন কাজটি করবেন না। আমরা আসানদোলে নেমে গেলে আপনি গাড়ীতে নিছক একলা হয়ে পড়বেন। সে অবস্থায় ঘুমিয়েছেন কি মরেছেন।

ভদ্রলোক বেশ একটু চঞ্চল হয়ে উঠে প্রশ্ন করলেন—কেন?

হোকরাটি বললে—আপনি কি শোনেননি আজকাল ভীষণ ‘ট্রেন-রবারি’ চলছে। এইত গেল সম্ভাষে আমাদের দুই বন্ধু আসছিলেন বেনারস থেকে কলকাতায়। সেকেওক্লাশে বার্থ না পেয়ে শেষে কিছু দক্ষিণা দিয়ে একখানি ফার্ট্রাশকে সেকেওক্লাশে কনভার্ট করিয়ে নিয়ে ছিলেন। সে গাড়ীতে তাঁরা দুজনছাড়া আর কেউ না থাকায় তাঁরা বেশ খুসী হয়ে আরামে বিছানা বিছিয়ে শুয়ে পড়েন। একজন হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার আর একজন হাসপাতালের ডাক্তার। শোবার ~~আড়ম্বর~~ নিজেদের কোট ওজারকোট ট্রাউজার টুপি সব খুলে গাড়ীর হাভারে ঝুলিয়ে রাখেন। ব্যারিষ্টার স্লিপিংস্ম্যাট পরে শুয়েছিলেন। হাতের রিষ্টওয়াচ আংটি খুলে কোটের পকেটে রেখেছিলেন। ডাক্তার তাঁর স্মার্টকেস থেকে একখানি ধূতি বার করে নিয়ে পরেছিলেন।

ব্যারিষ্টারের দেখা^১ তিনি ঘড়ি আংটি খুলে রাখেননি। পরেই শুয়ে ছিলেন। কারণ, হাত্রে ঘুম ভাঙলে তাঁর ছিল ঘড়ি দেখা অভ্যাস। তাছাড়া ডাক্তার ছিলেন একটু সাবধানী মানুষ। ট্রেনের টিকিট এবং মোটা টাকা সমেত পাস্‌টি কাপড় বার করবার সময় স্টাটকেসে পুরে চাবি দিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যারিষ্টারের নোটকেসটি তাঁর কোটের ইনসাইডপকেটেই পড়ে রইল। ডাক্তার একবার বললেন—ওহে, ওটা স্টাটকেসের ভিতর রাখলে ভাল হতনা। ব্যারিষ্টার তাঁর উত্তরে বিজ্ঞপ করে বন্ধুকে বলেছিলেন—Silly !

গাড়ীতে কোনও ‘ডিসটার্ব্যান্স’ হয়নি। দোর জানালা বন্ধ করে দিয়ে তাঁরা বেশ আরামে ঘুমিয়েছিলেন। সকালে বর্ধমান স্টেশনে গাড়ী এসে দাঁড়াতে তাঁদের ঘুম ভাঙল চায়ের গন্ধ পেয়ে। জানলা খুলে মুখ বাড়িয়ে ডাকহাঁক করে তাঁরা ছুপেয়ালা চা সংগ্রহ করলেন এবং কিছু মিহিদানাও টাটকা দেখে নিলেন। পয়সা বার করে দিতে গিয়ে দেখেন গাড়ীতে কিছু নেই। কোট ওভারকোট ট্রাউজার টুপি তাঁদের গায়ের রাগ ছাানা, মায় স্টাটকেস দুটিও গাড়ী থেকে উধাও ! ডাক্তার ধৃতি পরে শুয়ে ছিলেন, হঠাৎ তাঁর দৃষ্টি পড়লো যে পরশে ধৃতিখানি নেই ! শুধু আঙারওয়ারটি রয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে হাতের দিকে চেয়ে দেখলেন একোষ্ঠ শূন্য করে রিটওয়াচটি অন্তর্হিত। আঙুলও অনুন্নয়কহীন।

মুখের চা আর টাটকা মিহিদানার চৌঙা তাঁরা পরস্পরের মুখ চাওয়া-চাওয়ি ক’রে^২ বিষয়মনে ফেরত দিলেন। ব্যারিষ্টার সাহেব স্লিপিং স্টাট পরেই প্র্যাটফর্মে নেমে পড়ে^৩ গার্ডকে তাঁদের বিপদের কথা জানানলেন। স্টেশনমাষ্টার^৪ অবহা পরিদর্শনে এলেন। সঙ্গে সঙ্গে রেলওয়ে পুলিশের আবির্ভাব হ’ল। ইনস্পেক্টার সাহেব সমস্ত শুনে প্রশ্ন করলেন—কিছু মনে করবেন না শ্রাব, যদি একটা কথা জিজ্ঞাসা

করি, মাপ করবেন আমাকে। মহাশয়রা কি কাল রাতে নেশার মাঝাটা একটু বাড়িয়ে ফেলেছিলেন? নইলে হাতের আংটি, গারের র্যাগ, মায় পরণের কাপড়খানা পর্যন্ত খুলে নিয়ে গেল, তবু কুস্তকর্ণের নিভ্রাভঙ্গ হ'লনা—এত বড় আশ্চর্য ব্যাপার!

আর একজন পুলিশ অফিসার হেসে উঠে বললেন—ভাগ্যে প্রভুদের নিভ্রাভঙ্গ হয়নি তাই পৈতৃক প্রাণটা আপনাদের বেঁচে গেছে। জেগে উঠলে আপনাদের তারা খুন ক'রে রেখে যেত।

ইনস্পেক্টার সাহেব সেই হাসিতে ষোঁগ দিয়ে বললেন—কথাটা মিথ্যে নয়—জেগে উঠলে আমাদের আর চুরির তখিরে না এসে খুনের তদারকেই আসতে হ'ত। আজকাল রোলে এই রকম রাহাজানি প্রায়ই হচ্ছে। জানতে পারা গেছে যে একটা পেশোয়ারী গ্যাঙ এই কাজ করছে। তারা এখনও ধরা পড়েনি কিন্তু। এই গ্যাঙটা ধরা না পড়া পর্যন্ত রাতে ট্রেনে ট্রাভেল করা আর নিরাপদ নয়—

গল্পের বাকিটুকু শোনবার আর ধৈর্য্য রইলনা সে ভক্তলোকের। তিনি ভাড়াতাড়ি উঠে পড়ে হ্যাঙারে যা কিছু ঝুলিয়ে রেখেছিলেন সত্বর সব পোড়ে নিয়ে হোল্ড-অল পুরে ফেললেন। কাতরভাবে ছোকরাদের হিজ্রাসা করলেন—আপনারা তো বিক্যাচলে বেড়াতে যাবেন বলছিলেন গাড়ীতে উঠেই?

ছেলেটি বললে—আজ্ঞে হ্যাঁ, কাশী বিক্যাচল সব ঘুরে আসবার ইচ্ছে আছে আমাদের, কিন্তু উপস্থিত আমরা এই আসানসোলেই নামবো।

ভক্তলোক একেবারে আঁতর্ক উঠে বললেন—সূর্যনাশ! গাড়ী যে তাহলে একেবারে ফাঁকা হয়ে যাবে! আমি একা একখানা গাড়ীতে স্মারাত থাকবো? ওরে বাগ'রে! জেগে বসে থাকলেও তো রক্ষে নেই! দোঁহাই মশাই, আপনারা আমার সঙ্গে চলুন। কাশী বিক্যাচলটা

না হয় আগেই ঘুরে আসুন না! !কেরবার মুখে আসানসোলে নামলেইত' হবে।

ছেলেটি বললে—তার উপায় নেই। আমাদের টিকিট কেনা হয়েছে আসানসোল পর্যন্ত।

ভদ্রলোক উৎসাহিত হ'য়ে উঠে বললেন—তাতে আর কি হয়েছে? আপনারা টিকিটগুলো বদলে নিন না বর্জ্যমানে।

ছেলেটি একটু ইতস্ততঃ করে বললে—তাতে একটু বাধা আছে। আমাদের কাছে যথেষ্ট টাকা নেই। আসানসোলে যে বন্ধুটির বাড়ী যাচ্ছি তাঁর কাছে কিছু টাকা নিয়ে তবে ওদিকে যেতে পারবো।

ভদ্রলোক ক্ষণকাল কি ভাবলেন। তারপর একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন—কিছু যদি মনে না করেন, আপনাদের ট্রেনভাড়াটা না হয় আমিই দিয়ে দিচ্ছি। আপনারা আমার সঙ্গেই চলুন। কাশীতে আপনাদের থাকার কোনও অসুবিধা হবে না। আমার বাড়ীতেই উঠবেন। আমার ফ্যামিলি ওখানেই রয়েছে।

ছেলেরা পরস্পরের সঙ্গে কানে কানে কি পরামর্শ করলে তারপর বললে—আচ্ছা বেশ, তবে তাই হবে। আপনি যখন এমন করে অসুযোগ করছেন তখন আর 'না' বলি কেমন করে? আমরা ত ঘুরতেই বেরিয়েছি। তবে, আপনার টাকাটা কেরত পেতে, কিন্তু একটু সেরী হবে। বুঝতেই ত' পারছেন—আমরা আসানসোলে না-ফেরা পর্যন্ত আপনার ঋণ শোধ করতে পারবোনা।

ভদ্রলোক পরম নিশ্চিত হয়ে একটু স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বললেন—বেশ! বেশ! সেজ্ঞ ব্যস্ত হবেন না। আপনাদের যেমন সুবিধা হবে তেমনি করবেন। আসুন, বসুন সব? অনেক্ষণ দাঁড়িয়ে আছেন। এতক্ষণে ভদ্রলোক তাদের বসবার জায়গা দিলেন।

বর্তমানে গাড়ী এসে পৌছতে ভদ্রলোক হিসাব করে পাঁচজনের সেকেন্ড ক্লাস টিকিটের দাম বাবদ দশ খানা দশটাকার নোট বার করে তাদের হাতে দিলেন।

• দু'জন ছেলে টিকিট করে আনতে চলে গেল। বাকি তিনজনকে বলে গেল—তোরা তাহ'লে এইখানেই নেমে রিক্রেশমেন্টরুমে কিছু খেয়ে নে। আমাদের দু'জনের মতো খাবার গাড়ীতে নিয়ে এসে রাখিস। ভদ্রলোকের সঙ্গে কুঁজো গেলাস রয়েছে দেখছি, জলখাবার ভাবনা নেই।

ভায়া চলে যাবার পর বাকি তিনজন বাথরুমে ঢুকে মুখ হাত ধুয়ে ফ্রেশ হয়ে রিক্রেশমেন্টরুমে যাবার জন্তু নেমে গেল।

আমার কেমন ঐকটু সন্দেহ হল। কাশী বিদ্যালয় ঘুরতে যাবে—সঙ্গে ওদের লাগেজ বলে কিছু নেই! দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম ভদ্রলোককে—আপনার টাকাটা কি ওরা ফেরত দেবে বলে মনে করেন?

ভদ্রলোক উদাসকণ্ঠে বললেন—নাই যদি দেয়, ক্ষতি নেই কিছু। সারারাত একা খালি গাড়িতে গেলে ধনে প্রাণে মারা যাবার ভয় আছে। এ না হয় একশ টাকার উপর দিয়েই গেল।

কথাটা যুক্তিযুক্ত। আমি চুপ করে গেলুম।

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এল। ছোকরাদের কান্নার দেখা নেই। প্রথম ঘণ্টা পড়তে ভদ্রলোক বেশ একটু ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। বার বার আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন কি ব্যাপার বলুনত? এরা যে এখনও কিরল না কেউ। এত দেয়ী করছে কিসের জন্তে?

• আমি একটু হেসে বললুম—অনেকগুলো টাকা হাতে পেয়েছে। রিক্রেশমেন্ট রুমে বসে মনের আনন্দে ভালমন্দ পাঁচরকম খাচ্ছে।

গাড়ী ছাড়বার সময় হয়ে এসেছে খেয়াল নেই আর কি ? আসবে এখন ঠিক সময়ে ।

ভদ্রলোক যেন একটু আশ্বস্ত হয়ে বললেন—আপনি ঠিক ধরেছেন । হাজার হোক ছেলে ছোকরাত । আনন্দ করার এইত বয়স ওদের ।

দ্বিতীয় ঘণ্টা পড়ল । ভদ্রলোক লাফিয়ে উঠলেন । আমি যাই একবার, কি বলেন ? রিক্রেশমেন্ট রুম তো এই কাছেই । ডেকে নিয়ে আসি গিয়ে । আমার যথাসর্বস্ব রইল গাড়ীতে একটু নজর রাখবেন ।

একটু স্থিধাশ্রুত ভাবে বললুম তাইত ! আপনিও নামবেন ?—না গেলেন । এখনি গাড়ী ছেড়ে দেবে যে !

আমি এখনি চট করে আসছি । বলে ভদ্রলোক ব্যস্ত হয়ে নেমে গেলেন । প্রায় ছুটতে ছুটতে চললেন রিক্রেশমেন্ট রুমের দিকে । সে এক দৃশ্য । যেন কুরুক্ষেত্রে হিড়িম্বা-নন্দন ঘটোৎকচ দৌড়চ্ছে ।

তৃতীয় ঘণ্টা পড়ল । সঙ্গে সঙ্গে গার্ডের হুইস্‌সও শোনা গেল । কিন্তু না ফিরল ছেলেরা, না ফিরলেন সেই ভদ্রলোক ।

এবার ব্যস্ত হ'য়ে ওঠবার পালা এল আমার । জানলা দিয়ে আধখানা মাথা গলিয়ে দেখছি । ভদ্রলোকের নাম জানি না যে চোঁচিয়ে ডাকব ! আমিও নামব কিনা ভাবছি । জ্বী বললেন—ফেপেছ ? বুড়ো ঠিক আসবে । ওর 'যথাসর্বস্ব' গাড়ীতে রয়েছে । কিন্তু বাপু তুমার ওই ছেলের দল ফিরবে কিনা আমার সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ ।

দ্বিতীয় কথা শেষ হল না । ইঞ্জিনের বাণী বেজে উঠল । গাড়ী নড়তে শুরু করল । জানলা দিয়ে তখনও মুখ বাড়িয়ে আছি । দূরে কে যেন ছুটে আসছে মনে হল । চুলস্ত ট্রেন ধরবার চেষ্টা করছে । বোধ হল যেন আমাদেরই সেই সঁহায্যত্রিটি । কিন্তু গাড়ী তখন পূর্ণবেগে ছুটছে ।

বর্ধমান স্টেশন পার হয়ে গেলুর্ দেথতে দেথতে। স্ত্রী বললেন—
কী ঝকঝকি গা! ভাল আপন হলত! এখন এ পরের বোঝা বাড়ে
নিয়ে কি করবে বল তো?

চিন্তিত ভাবে বললুম—তাই ত! এ আবার এক ঝকঝকি হ'ল!
কি আর করা যাবে?—চলো, আমরা গন্তব্যস্থানে নেমে জিনিষপত্র-
গুলোর একটা লিস্ট করে পুলিশের বা স্টেশনমাষ্টারের জিম্মায় দিয়ে
বর্ধমান স্টেশনে একথানা টেলিগ্রাম করে দেব।

মিহ্ন ততক্ষণে দেখি ভদ্রলোকের পাতা বিছানায় তোফা লগা হয়ে
তরুণীমুখে পড়েছে!

২

বাড়ীর কর্তা চাকরের ওপর ভয়ানক রেগে গিয়েছেন।

—ব্যাটা, দেশলাই এনেছি, একটাও কাঠি খলে না, জিনিষ
দেখে আনতে পারিস্ না?

ছদিন পরে আবার একটা দেশলাই কিনতে দিয়েছেন। বাগ্ন খুলে
দেখেন, একটা কাঠিতেও বারুদ নেই।

—ব্যাটা, এ কি এনেছি?

মাথা চুলকোতে চুলকোতে চাকর বলে, কেন, ছদ্মর যে বলেছিলেন
দেখে আনতে?

দাবী

শ্রী আশাশুভা সিংহ

পরেশদের বাড়ীর অবস্থা মন্দ নয়, মোটা ভাত কাপড়ের সংস্থান আছে। এই বছর সে মেডিকেল কলেজ হইতে পাশ করিয়া বাহির হইয়াছে। শুধু বাহির হয় নাই, বাহির হইবার সঙ্গে সঙ্গে একটি চাকরিও পাইয়াছে। বিহারের একটি মাঝারি গোছের সহরে পরেশদের বাড়ী। এইখানকার দাতব্যচিকিৎসালয়ে পরেশ ডাক্তারি-চাকরি পুইল। গতবর্ষের চাকরি, মাহিনাও কিছু কম নয়, একশো পঁচিশটাকা। কতগুণা ছেলে ডাক্তারি পাশ করিয়া দুমাস ছুটিস নয়, এক আধ বছর নয়, অমন কত বছরের পর বছর ডাক্তারখানায় সাইনবোর্ড ঝুলাইয়া তাঁর কাকের মত একটি আধটি রোগীর প্রত্যাশায় বসিয়া থাকে। এদিক দিয়া পরেশের অদৃষ্ট ভালোই বলিতে হইবে। বাড়ীর বড় ছেলে, সে, তাহার এই সাফল্যে বাড়ীপুত্র সকলে অত্যন্ত খুশী হইয়া উঠিল। ছোট-ছোট ভাই বোন অনেকগুলি। তাহারা কখনো সিনেমা লইয়া যাইবার জন্ত, কখনো চকোলেট কিনিয়া দিবার জন্ত আবদার ধরিতে লাগিল। মা একমুখ হাসিয়া কহিলেন, এবার কিন্তু আমি মুখ্যদের বড়গিন্নীর মত অনন্ত গড়তে দেব। বাবা নিশ্চিত প্রমত্তমুখে বলিলেন, সুরেশটাকে মনে করেছিলাম দারভাদার মেডিকেল স্কুলে দোব। কিন্তু পরেশ যখন চাকরি পেয়েছে আর তেঁা টাকার ভাবনা রইলোনা, মনে করছি তাকে তাহলে পাটনার সার্বজনিক স্কুলে আই, এস, সি পড়তে পাঠিয়ে দিই। মনে মনে হিসাব করিয়া কহিলেন, অজ্ঞানায়গায় এই একশো পঁচিশ টাকার চাকরিপেলে খরচেই সব চলে যেত। বাড়ী-ভাড়া রে, চাকর রে, বাসন রে। বাজারখরচ, দুধেরখরচ, ঘোষাখরচ,

নেই কি? কিন্তু ভগবানের রূপা যে বাড়ীতে বসেই চাকরি পেয়েছে। পচিশ টাকা করে হাতখরচ রেখে বাকী একশো টাকা অনায়াসে সংসারে দিতে পারবে। আস্তে আস্তে বাইরে একটু একটু করে প্র্যাকটিস জমবে। পঞ্চাশটাকা করে সুরেশের পড়ার খরচ লাগবে। বাকী পঞ্চাশটাকায় মনে করচি ইন্দুর নামে একটা ম্যারেজ-ইনসিওর করবো। বলতে গেলে আজপৰ্য্যন্ত কিছুই বিশেষ জমাতে পারিনি, দেখতে দেখতে মেয়েটা নবছরে পা দিয়েছে। শেষে কি পনের টাকা যোগাড় করতে ভিটে-মাটি বন্ধক রাখতে হবে? এককথায় বলিতে গেলে পরেশের চাকরি পাওয়াতে পরিবারটির উপর একটি সুখ সমৃদ্ধির উজ্জল আভা আসিয়া লাগিল। কিছুদিন হইতেই পরেশের বিবাহের জন্ত মনোমত পাত্রী খোঁজা হইতেছিল কিন্তু স্ত্রী মেয়েটি হইবে অথচ পনের অঙ্কটি বেশ ভারি হইবে তার উপর পরেশ বন্ধু বান্ধবের মারফত নিজের পছন্দও একটু জানাইয়া দিয়াছে অন্তত ম্যাট্রিক পাশ হওয়া চাই, তার বেশী হইলে খুব ভালো কিন্তু কমে মন উঠিবেনা। গান বাজনা জানা চাই, আধুনিক রুচিসম্মতা হওয়া চাই। একাধারে এত দাবী মিটাইয়া পাত্রী সহজে হয়তো পাওয়া যায় না কিন্তু এতদিন এই খোঁজার পালাটা মন্দাক্রান্তা ছন্দে চলিতেছিল, এখন পরেশ ভালো চাকরি পাওয়াতে কল্যাণদায়গ্রস্থ পিতাদের হড়াহড়ি লাগিয়া গেল। সকলেই প্রায় মরিয়া গোছের হইয়া উঠিয়াছেন পরেশকে জামাতা করিতে। এরই মধ্যে একদিন কলিকাতায় ভবানীপুর অঞ্চলের একটি কল্লার সহিত পরেশের বিবাহ স্থির হইয়া গেল। মেয়েটি আই, এ পড়িতেছে, এইবার সেকেন্ড ইয়ার। ভালোপাত্র পাইলে যে ইয়ারই হোক তৎক্ষণাৎ বিবাহ দিতে অতিভাবকদের কোনই আপত্তি নাই। দেখিতে স্ত্রী, গানবাজনা আজকালকার সব মেয়েতেই যেমন জানে নঞ্জলাও তেমনিই জানে। আধুনিকতম সিনেমার গান "চাদের হাসি বাধ ভেঙ্গেছে, উছলে

পড়ে আলো..."গাইতে পারে হার্মোনিয়াম বাজাইয়া। বাপের অবস্থাও মন্দ নয়, ভবানীপুর অকলে ডাক্তারি করিয়া বেশ নাম করিয়াছেন। যেমনটি সকলে কামনা করিয়াছিলেন এবং যেমনটি ঠিক পরেশ চাহিতেছিল তেমনই সকল দিকে মিলিয়াছে। অবিশেষে এখানেই বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহের পর কলিকাতা হইতে প্রথম বিহারের এই ছোট নগরটিতে আসিয়া মঞ্জুলার ভালোই লাগিতেছে। এখানে টামের বাসের উৎকট ঘরঘরখনি অবিশ্রান্ত শুনিতে হয়না। তাদের বাড়ীটি নদীর ধারে। সন্ধ্যায় কান্তকর্ম্য সারিয়া পরেশ তাহাকে ডাকিয়া নেয়, এরই মধ্যে মঞ্জুলা বেশবাসের একটু আধটু পরিবর্তন করিয়া ফেলিয়াছে। হিন্দুস্থানী ধরণে সাংঘের দিকে আঁচল দিয়া শাড়ি পরিতে শুরু করিয়াছে। হাতে মোটা মোটা গালার চুড়ি পরিয়া লম্বা বেণী হুলাইয়া নদীর ধারের একটি বটগাছের তলায় যখন তাহারা দুজনে আসিয়া বসে তখন নদীর বালুময় সৈকত-ভূমির উপর ঈষৎ জোয়ার আভাস আসিয়া পড়িয়াছে। পাশের মটরশুঁটি ও কফির ক্ষেতগুলি দূর সবুজ পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে। ইদারা হইতে বন্দকে দিয়া এই ভর সন্ধ্যাতেও কোন কফির ক্ষেতের মালিক জল তুলাইতেছে, একটানা করণ শব্দ আসিতেছে জল ভরিবার। সমস্ত জড়াইয়া কলিকাতার সেই আলো, জনতা, কোণাহল হইতে বেন সম্পূর্ণ এক নূতন জগৎ। পরেশ মুগ্ধ হইয়া মঞ্জুলার দিকে চাহিয়া ব্লিত, 'ঠিক এমনটি আর পড়িলনা চোখে, আমার যেমন আছে।' মঞ্জুলা নিজেরও কম ভালো লাগে নাই। দু'জনে মিলিয়া জীবিতের অনেক প্ল্যান হইত। পরেশ কহিল, 'মঞ্জু, তুমি পড়া ছেড়োনা। এই তো আর কটা মাস পরীক্ষার বাকী আছে। কলিকাতায় কিরে গিয়ে আই, এ টা দিয়ে দাও। আমাদের এখানে কীরিও অমত হবেনা। তারপর যদি সুবিধা হয় প্রাইভেটে বি, এ দেবে। তোমাকে সবারই আদর্শ হর্তে হবে।

গল্প-ভারতী

কেবল যে প্রমোদের স্রোতে তরলী ভাসিয়ে দেব—এ আদর্শ আমাদের ছ'জনের নয়। মঞ্জুলা নিজেও তাহাতে সম্পূর্ণ সায় দিত। তাদের ছ'জনের জীবন যে, পৃথিবীর অল্প সমস্ত প্রণয়ীযুগলের অপেক্ষা মহৎ ও মৌলিক এ বিষয়ে সে নিজেও নিঃসন্দেহ ছিল। এই সকল মধুর বিশ্রান্তালাপের মধ্যে মাঝে মাঝে রসভঙ্গ করিয়া পরেশের ত' একটি জরুরি 'কল' আসিত। হতবিধিকে অভিসম্পাত দিতে দিতে পরেশ রোগের বাড়ীর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হইত। ভবিষ্যতের মধুর স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে মঞ্জুলা নিশি জাগিয়া বসিয়া থাকিত। প্রথম স্বপ্নের বাড়ীতে থাকিবার দিনগুলি এইরূপ স্বপ্ন দেখিয়া কাটিয়া গেছে। আজ আট নয়দিন হইল সে কলিকাতার পিত্রালয়ে ফিরিয়া আসিয়াছে। প্রেমকে ঘনীভূত করিতে বিরহের প্রয়োজন। এই বিরহের অন্তরালে সে দিনে দিনে কাস্তিমান ও পরিপুষ্ট হইয়া উঠে। পরেশ ও মঞ্জুলার পত্র বিনিময়ের ফলে বিরহের রূপটি তাহাদের কাছে আদর্শ ও শুভ্রী মণ্ডিত হইয়া অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে। ফলে মঞ্জুলা সিনেমা দেখা ছাড়িয়া দিয়াছে, বন্ধুস্বামীদের বাড়ীতে বৈকালিক ভ্রমণে গিয়া ব্লাউজের নবতম সংস্করণ এবং বেশভূষার ক্রমবিবর্তনবাদের বিষয়ে হাক্কা মুখরোচক গল্পগুজব করা প্রায় পরিত্যাগ করিয়াছে। পরেশ লিখিয়াছে এবং মুখেও বারংবার বলিয়াছে তাহাদের ছ'জনের প্রেম একান্ত অনন্তসাধারণ। সাধারণের মত আলোদ-তরগীতে গা-ভাসাইয়া দিয়া তারা চলিবে না। আই-এ পাশ এতদ্বারা মঞ্জুলাকে করিতেই হইবে। পাশ করিয়া সে দেখাইবে বিবাহের ফলে কর্তব্যহানি ঘটেনা বরঞ্চ কর্তব্যের প্রতি আরও নিষ্ঠা জন্মায়। পাঠ-কক্ষের দেয়ালে সারাদিনের পড়ার কটিন টাঙ্গাইয়া সে আসন্ন পরীক্ষার জন্য চারিদিকের ছড়াক্স মনকে সংহত করিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। ইতিমধ্যে পরেশদের বাড়ী হইতে হঠাৎ একদিন একটি

টেলিগ্রাম আসিয়া উপস্থিত : মা দীড়িতা, মজ্জাকে অবিলম্বে পাঠাইয়া দেওয়া হোক। চিঠিও ডাকে দেওয়া হইয়াছে। সঙ্গে চলিল।

মজ্জা প্রায় কীদ কীদ হইয়া কহিল, আমার যে আর পরীক্ষার মাত্র দেড় মাস বাকী। এখন কামাই করলে আর কি আমার পরীক্ষা দেওয়া হবে? মজ্জার মা নাসিকা কুঞ্চিত করিয়া কহিলেন, খাণ্ডির অল্পখ করেছে, তা নতুন দো কি যেয়েই হাঁড়ি ধরবে? এই তো মোটে দু'মাস বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে এত তাড়া কিসের? মজ্জার বাবা একটু বিরক্ত হইয়া কহিলেন, হাঁড়ি ধরবার জন্তেই যে মজ্জাকে যেতে তার করেছে এমন কথা মনে করবার কারণ কি? বেয়ানের অল্পখ হয়েছে তিনি এখন বৌকে কাছে চান। নিজের লোক অল্পের সময় কাছে থাকে, সেবা গুরুত্ব করে এটা একটা স্বাভাবিক কামনা। ভগবান করুন তেমন জীবন-মরণের ব্যাপার কিছু না হয় যেন।

মজ্জার মা স্বাকার দিয়া বলিলেন, আমরা বাপু মেয়েমানুষ অত কাব্য করে কথা বলতে পারিনে, হ্যারে থুকা, তোর স্বত্তর বাড়ীতে রাঁধুণী নেই তো? তুই বলছিলি তোর খাণ্ডিই রান্নাবান্না করে। মজ্জা একটু লজ্জিত অপ্রতিভ হইয়া কহিল, হ্যাঁ, আজকাল যুদ্ধের জন্তে ওদিকে মোটেই লোকজন পাওয়া যায়না। কাছেই সব এয়ারোড্রোম হয়েছে, মিলিটারি কন্ট্রাক্টে খুব বেশী মাইনে দিয়ে লোকজন সবই নিয়ে নিচ্ছে। ক্রমশঃ এই প্রকার আলোচনা এবং বাদ-প্রতিবাদে সেদিনকার সন্ধ্যার ট্রেনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গেল। ঠিক হইল, পরের দিন ডাকে কি পত্র আসে দেখিয়া, যাইবার বিষয়ে স্থির করা হইবে। পরের দিন ডাকে পরেশের এক দীর্ঘ পত্র আসিল। পরেশ লিখিয়াছে:—খুব একটা উচুসূরে আমাদের জীবনকে বাধতে হবে তোমাতে আমাতে দু'জনে মিলে এই সংকল্প স্থির করেছিলাম কিন্তু বাড়ীর ভূমি কল্যাণী বধু, সবাইকে সেবা

দিয়ে, যত্ন দিয়ে তুট করবে এটা। এই মহান সূরের একটা রেশ, তুলোনা সে কথা। মাঘের কয়েকদিন থেকে ইনফ্লুয়েন্জা হয়েছে। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন, পত্রপাঠ তুমি তোমার ছোটদার সঙ্গে চলে এসো। পড়ার বইগুলো সমস্তই যেন গুছিয়ে সঙ্গে আনতে তুলোনা। এখানে এসে দেখবে সংসারের কাজ-কর্মের মাঝখানেও বেশ পড়া হয়। আমি নিজেই কাজের ফাঁকে ফাঁকে তোমাকে পড়াব।

মঞ্জু একহাতে চোখ মুছিয়া অন্যহাতে যাইবার জন্ত বাস্তব গুছাইতে বলিল। বন্ধুরা আসিয়া বিস্তর শোক প্রকাশ করিল। মাধবী বলিল, টেবু তো হ'য়েই গেছে, তুই না হয় পরীক্ষা দেবার সাতদিন আগে এখানে চলে আসবি। রমলা কহিল, পরেশবাবু যখন নিজে পড়াবেন তখন কে জানে হয়তো এখানকার চেয়ে ভালোই পড়াশোনা হবে। সুধা ঠোট উন্টাইয়া কহিল, কি আবার ভালো হবে তুমি? পরেশবাবুর তো মেডিক্যাল লাইন। সেই কবে কোন জন্মে আই. এস. সি পাশ করেচেন, তাও এতদিনে রোগীর নাড়ি টিপে টিপে সুস্থ হয়ে নিশ্চয় ভুলে ব'সে আছেন। এষা কহিল, না না, রোগীর নাড়ী টিপেও ভুললোকের বেশ রসজ্ঞান টনটনে আছে! মঞ্জু, তুই না গল্প করছিলি পরেশবাবু রোজ সন্ধ্যায় তোকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে শোনাতেন? এক একদিন নাকি ইংরেজ কবিতাও বাদ যেতেন না? মঞ্জুলা বলিল, হ্যাঁ তাই, 'ডাক্তারি পাশ করলেও ইংরিজী, বাংলা দু'টোতেই ওর খুব দখল রয়েছে। ক্রমে সন্ধ্যার ট্রেনের সময় নিকটবর্তী হইয়া আসিল। খানিকটা নিরাশা এবং খানিকটা স্বপ্ন দেখার ভাব লইয়া মঞ্জুলা ট্রেনে আসিয়া বসিল। কিন্তু হায়, তাহার প্রথম বিবাহিত জীবনের দিনগুলির স্বপ্ন দ্বিগুণ রচা সেই নদীর ধারের বটগাছভাটাটি কোথায়? যেখানে ইদারা হইতে জল তুলিবার শব্দ মন্দের সন্ধ্যার কণগুলিকে অনির্বচনীয় করিয়া তুলিত। জ্যোৎস্নার

অফুট ইঞ্জিত নদীর সৈকত-ভূমিষ্টক রহস্যময় করিয়া কেলিত। কোথা গেল সেসব দিন? এই তো দু'মাস আগেকার কথা! কিন্তু মনে হয় যেন যুগান্তরের কাহিনী। এয়েন আসিয়া পড়িয়াছে সে সম্পূর্ণ নূতন এক জগতে। গাড়ী হইতে নামিতেই নন্দ ইন্দু নোড়িয়া আসিয়া বলিল, বোদি এসেচ, বাঁচা গিয়েছে। বাবা এই ক'দিন যা কষ্ট! সেদিন ডাল নামাতে যেয়ে বড়দার হাতটাই পুড়ে গেল। বিত্তয়া শুরু পালিয়েছে। সে নাকি নোকো তৈরীর মিলিটারি কনট্রোল্টের কাজে মাসে তিরিশ টাকা পাচ্ছে এখন। আর কি আমাদের বাড়ী চাকরি করে! ছোট দেওর লালু তাড়া দিয়া কহিল, আহা. এই বোদি গাড়ী থেকে নামছেন, এখনই মেয়ে এলেন শুঁকে দুঃখের কাহিনী শোনাতে। লজ্জা লাগে না! তার চেয়ে যেয়ে দেখ উছনটা ধরেচে কি না. শীগগীর এক কেটুপি চায়ের জল চড়িয়ে দে। বোদির সঙ্গে গুর দাদা এসেচেন, আমি চট করে দোকান থেকে কিছু খাবার নিয়ে আসি। ইন্দু ঠোট ফুলাইয়া কহিল, বাবা, যা ভিজ্জে ঘুঁটে, কিছুতেই উছন ধরেনো। সেই থেকে হাওয়া করে করে আমার হাত ব্যথা হয়ে গেল! তখন এত করে বল্লাম ছোটদা ঠোভটা মারিয়ে দাও, তা কথা কানে তোলা হোলনা।

মঞ্জুলা ক্ষীণস্বরে কহিল, চা খাব এখন, এত তাড়াতাড়ি কিসের। মা কেমন আছেন? কোন ঘরে রয়েচেন? চল দেখে আসি আগে শুঁকে। কি বলছিল তোমার দাদা, ইনফ্লুয়েন্সার সঙ্গে নাকি নিউ-মোনিয়া হয়েছে তাঁর। খুব দুর্বল হয়ে পড়েছেন। শুনে আমার যা ভয় ক'রছিল, যাক ভগবানের খুব দয়া যে, এখন একটু ভালোও দিকে এসেচেন।

আবার সেই মায়াবী সন্ধ্যা আসিয়াছে। কিন্তু এবার তাঁদের আলোয় নদীর মোহানায়, তরুজলতলের ছায়াঙ্কিত জ্যোৎস্নায় নয়,

এবার দেখা হইল রান্নাঘরের ধূমে আচ্ছন্ন-প্রাঙ্গণে। মঞ্জুলা অনভ্যস্ত হস্তে একহাতে উত্তন ধরাইবার জন্ত পাখা করিতেছিল। অন্যহাতে কড়াই চড়াইয়া কি একটা রাঁধিবার চেষ্টা করিতেছিল। পরেশ জুতাটা বাইরে খুলিয়া ঢুকিয়া কহিল, ঝোলটা চড়িয়ে দাও, যে সময়ে ওটা সিদ্ধ হবে সে সময়ে বেশ খানিকটা পড়া হয়ে যাবে। বলতো এই সময়ে আমি তোমার ইংরিজিটা একটু পড়িয়ে দিই। এইমাত্র হাস-পাতালের কাজকর্ম সেরে এলাম। একটা “কল” ছিঁড়। তবে সেটা তেমন আর্জেন্টেকেস নয় ব’লে সকালে যাব বলে দিয়েছি। মঞ্জুলা তখনও হাল ছাড়ে নাই, তাই কহিল, আচ্ছা তুমি মোড়াটায় একটু ব’স, আমি উত্তনটা ভালো করে ধরিয়ে ঘর থেকে বই নিয়ে আসছি। পরেশ আরাম করিয়া বসিয়া কহিল, একপেয়ালা চা খাওয়াতে পার মঞ্জু? সারাদিন ঘুরে এসময় ভালো করে তৈরী চা পেলে এক পেয়ালা খুব ইন্স্পিরেশন পাওয়া যায়। অগত্যা, বই আনিবার পরিবর্তে মঞ্জুলা চায়ের জল চড়াইল ঝোলের কড়াই নামাইয়া। চায়ের দুধ তিনি সাজাইয়া কেটলি পেয়ালা ধুইয়া আনিতেছে, এমন সময় ওঘর হইতে ইন্স টীংকার করিয়া কহিল, বোদি, গরমজল বসিয়ে মায়ের এ্যাক্টিভিজিটেন্ গরম করে দাও জলদি। দেবী কোরোনা। এখনই বুকে পিঠে বেঁধে দিতে হবে। দাদাকেও অমনি পাঠিয়ে দাও, বেঁধে দিয়ে যাবে। পরেশ উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, আচ্ছা তুমি এক কাজ কর চায়ের জন্নে যে জলটা গরম করেচ ওতেই আগে মায়ের ওষুট্টা গরম করে দাও বেঁধে দিয়ে আসি। ফিরে এসে আরাম করে ধীরে স্বপ্নে চা খাব, সে সময়ে তোমার পড়াটাও হ’য়ে যাবে এখন।

চা তৈয়ারী যথাসময়ে হইল, কিন্তু তখন ঝোল নামাইয়া ছোট থোকার স্ক্রুজি, মায়ের বালি এবং বাবার খই-দুধ অত্যাবশ্যক।

পরেশের উত্তম সম্বন্ধে রাতি এগারোটা অবধি মঞ্জুলার অবসর মিলিলনা। এগারোটায় পরে মঞ্জু যখন শয়নকক্ষে আসিল তখনও পরেশ বাতির সম্মুখে বসিয়া সেইদিনকার খবরের কাগজটা নাড়াচাড়া করিতেছিল। মঞ্জুকে দেখিয়া কহিল, এতরা পাউণ্ডের একটা কবিতা বেছে রেখেচি, আজ তোমাকে পড়িয়ে শোনাব। দুই একটা কথাবার্তা হইতে হইতে মঞ্জু হাই উঠিতে লাগিল, সারা দিন রাতি, সংসারের চাকায় তৈল দান করিতে করিতে সে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ক্লান্তির সময় ভালো জিনিসেও ক্লান্তি আসে তাছাড়া আগামী প্রভাতের জন্য তাহার শক্তি সঞ্চয় অত্যাবশ্যক; একথা তাহার প্রকৃতি নিগূঢ়ভাবে তাহাকে বলিয়া দিতেছিল। অবচেতনায় সঞ্চারিত তাহার এই সাবধান বাণী মঞ্জুকে অধিক রাতি জাগিতে দিল না। কাল ভোর পাঁচটা হইতে আবার সংগ্রামক্ষেত্রের দাবী পড়িয়া আছে। পরেশ কহিল, আজ আর থাক তুমি ক্লান্ত হয়ে পড়েছ। কাল হবে এখন।

যথানিয়মে সেই কাল আসিল কিন্তু সংসারের দাবী তখন শতবাহু প্রসারিত করিয়া মঞ্জুকে ঘিরিয়া ধরিয়াছে। সেদিন সকাল বেলায় পরেশের এক বাল্যবন্ধু তাহার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছেন। তিনি একই কলেজে পরেশের সহিত কিছুকাল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন তাহার পর পরেশ ডাক্তারি পড়িতে শুরু করে তিনি এম.এ পাশ করিয়া উচ্চতর গবেষণার জন্ত যুরোপ যাত্রা করেন। দুই বন্ধুতে অকস্মাৎ বহুদিন পরে দেখা। পরেশ কহিল, এত ছোট সহরে কোনদিন যে হঠাৎ তুমি আসবে স্বপ্নেও কল্পনা করিনি। বন্ধু সুবোধবলিল, এজায়গাটা খুব স্বাস্থ্যকর শুনেচি, আমার স্ত্রীর কোথাও উপকার হচ্ছেনা। এজায়গাটা এককর চেষ্টা করে দেখি। স্ত্রীর কথা উঠিতে মঞ্জুলার কথা উঠিল। পরেশ মুখ বিনয়ে

স্বীকার করিল, তাহার মত স্ত্রীভাগ্যা কম লোকেরই হয়। রান্না করিতে রোগীর সেবা করিতে, সংসারের নিপুণ কর্ণধার হইতেও সে যেমন তৎপর, ইনটেলেক্চুয়াল দিকটাতেও সে তেমনই সযত্নে রক্ষা করিতে জানে। রান্নাঘরে ভাত চড়াইয়া দিয়া সে শেলী ওয়ার্ডস-ওয়ার্থ পড়ে। চাকর অবধি এই যুদ্ধের দুর্দিনে টিকিতেছে না, চাকরের অভাব, রাধুণীর অভাব, তেলের অভাব, চিনির অভাব, পরিধেয় বস্ত্রের অভাব, এত অভাবের মধ্যেও মঞ্জু বিপ্রহরের বিরল অবকাশে রবীন্দ্রনাথের কাব্য পড়িতে ভোলেনা। বাগুবের মল্লভূমির মাঝে ছোট একটু কুচ্চিফুল। সুবোধ শ্রকার নতি জানাইয়া মঞ্জুদেবীর সহিত আলাপ করিতে চাহিলে পরেশ ছোট বোন ইন্দুকে আদেশ করিল, তোর বৌদিকে ডেকে আন। মঞ্জু তখন রান্নাঘরে হলুদ ঝাটিতেছিল, তাহার কাপড়ে কয়লার কালি, হলুদের ছোপ; এমন সময়ে ইন্দু ঝড়ের বেগে ঢুকিয়া বলিল, বৌদি জ্বলদি, দাদা ডাকচে একবার বাইরের ঘরে। কে একজন দাদার বন্ধু এসেছেন, তোমার সঙ্গে আলাপ করতে চাইছেন। মন্তবড় নাকি একজন লেখক। চোহারার আর জানা কাপড়ের যা ঘটা! এই কাপড়ে তাই বলে যেওনা, কাপড়খানা ছেড়ে একটা পরিষ্কার কাপড় পরে যাবে। উল্লুনে তখন ভাত ফুটিতেছিল, সেইদিকে আশঙ্কাকুল নেত্রে চাহিয়া মঞ্জু বলিল, আসতে যদি দেবী হয় ভাতটা তুই নামিয়ে নিতে পারবি তো ভাই?

ইন্দু কহিল, তুমি চট করে ঘিরে আসবে। অত বড় হাঁড়ি আমি নামান্তে পারবনা বৌদি। কিন্তু শীগগীর যাও। দেবী হলে দাদা রাগ করতে পারে। আপনকক্ষে বেশ-বাসের কিছু কিছু পরিবর্তন করিয়া মঞ্জু। যখন স্বামীর পুষ্প আসিয়া দাঁড়াইল তখন তাহার স্নানোদ্যম লাগণ্যে জ্যোতির্ময় মুখমণ্ডলে ভ্রমের রক্তাক্তা পড়িয়া তাহাকে অপরূপ দেখাইতেছিল। সুবোধ প্রতিনমস্কার করিয়া মশক

কণ্ঠে কহিল, আপনার কথাই এতক্ষণ শুনছিলাম, এখন চোখে দেখবার সৌভাগ্য হ'লো। সত্যি আপনারদের মত যেরেয়াই স্ত্রীমাদের ভবিষ্যতের আশা। পরেশ শ্মিত বিনীত ভঙ্গীতে কহিল, তোমাকে এত কমপ্লিমেন্ট দিচ্ছে স্ববোধ, তুমি চট করে একপেয়াল চা করে নিজের হাতে নিয়ে এসে স্ববোধকে দাও। প্রত্যুত্তরে স্ববোধ আরও বিনীত ভঙ্গীতে কি যেন কহিল। কিন্তু তাহাদের কথাবার্তা কানে ভালো করিয়া যাইবার আগেই, আজ অনেকদিন পরে হঠাৎ বাইরেটায় মঞ্জুলার চোখ পড়িয়া গেল। ফাস্তুন মাস পড়িয়া গেছে। সামনের মাঠের আমগাছ-গুলিতে মুকুলের কী অল্পস্র সমারোহ! সমস্ত আকাশে বাতাসে একটা ঘন সুরভি! বসন্তের যে বাতাসে গত জীবনের স্মৃতি উদ্বেলিত, আবর্তিত হইয়া উঠে, নীল আকাশের কিনারা বাহিয়া সেই বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। সামনের দেয়ালে টাঙ্গানো ক্যালেন্ডারটার দিকে চোখ পড়িতে চমকাইয়া তারিখটা সে দেখিল, আজ প্রায় তিনদিন হইল আই, এ পরীক্ষা সুরু হইয়া গেছে। ছুপেয়াল চা চাই। উহুনের উপর মস্ত বড় একটা ভাতের হাড়ি চাপানো আছে, ইন্দু নামাইতে পারিবেনা, হয়তো এখনই কি একটা বিজ্রাট বাধাইয়া বসিবে। প্রতিটি মুহূর্ত তাহার সংসারের দাবীতে বাধা। ইচ্ছা থাকিলেও ক্ষতি নাই, অনিচ্ছাতেও কিছু যায় আসে না। সংসারের নির্মম রথচক্র আপন দাবী একতিলও জায়গা ছাড়িয়া দিবে না। মঞ্জু এই স্বযোগে মুখে কল্প হাদি টানিয়া আনিয়া কহিল, একটুও দেরী হবেনা, আমি পাঁচমিনিটের মধ্যে দু'পেয়াল চা পাঠিয়ে দিচ্ছি। এই বলিয়া ক্ষিপ্ৰপদে সে কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল। কে জানে ভাতটা ধরিয়া গেল, না বেকী, গলিয়া গিয়া অথাত্তে পরিণত হইল। সে এখনই যাইয়া কেনটা ঝরাইয়া রাখিয়া চায়ের জল চড়াইয়া দিবে।

বজ্রকল

ত্ৰিপবিত্ৰ গঙ্গোপাধ্যায়

—

— [এখানে যে-কবির স্মৃতি-কাহিনী পবিত্ৰস্বাবু লিখেছেন, এ-যুগের বাঙালীর কাছে তাঁর পরিচয় দেবার কোন প্রয়োজন নেই। তার জ্ঞাও এ ভূমিকা নয়। আজ *সেই কবির জীবনকে কেন্দ্র করে, জগতের চরমতম এক ট্রাজেডীর সংঘটন হয়েছে, অনাগত কালে যা স্মরণ করে মানুষ মাত্রেই দীর্ঘশ্বাস-ফেলবে এবং মনে*মনে কামনা করবে, হায় কবি, সেদিন আমি যদি বেঁচে থাকতাম, তাহলে নিশ্চয়ই তোমার এ-বেদনার অংশ বহন করে ধন্য হতাম। কিন্তু এমনি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, আজ আমরা যারা কবির সমসাময়িকী, কবির দেশের সেই লোকেরা, আজ সে-সম্বন্ধে একরকম উদাসীন বজ্জেই হয়। হয়ত কোন কালে এই কবির প্রতিমূর্তি গড়ে আমরা বৎসরে বৎসরে শ্রদ্ধাজলীও দিতে পারি, কিন্তু আজ সে-কবি, দেশ, সমাজ ও রাষ্ট্রের এক কণা স্থায়ী সহানুভূতিও পেলো না। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবার সমাবর্তন উৎসবে কবির কাব্যকে সম্মান দেবিয়ে বহু বাঞ্ছিত পদক উপহার দিয়েছেন কিন্তু হায়, যত্নক এ সম্মান *দেওয়া হলো, এ সম্মান গ্রহণ করবার মত আজ *তাঁর মানসিক চেতনা পর্যাস্ত *নেই। ভগবানের কাছে একান্ত ভাবে প্রার্থনা করি, কবিকে আবার তিনি ফিরিয়ে দিন তাঁর কাব্য-স্মৃতি, ফিরিয়ে দিন

যা নিয়েছেন অপহরণ করে তাঁর কাছ থেকে। এই বৃহৎ দেশ, এত ক্রোড়পতির জন্মভূমি...কেউ কি পারেন না, তাঁর জাতির একজন শ্রেষ্ঠ কবিকে, রবীন্দ্র-পরবর্তী বাংলা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিকে, এই নিদারুণ দৈব-অপঘাতের বৃহৎ দৈন্য থেকে অস্তুত খানিকটা মুক্তি দিতে ?]

—সম্পাদক

১৯১৮ সাল। আমি তখন 'সবুজ পত্র'-এ শিক্ষানবিশী করি। একদিন সবুজপত্র-সম্পাদক মহাশয়ের নামে একখানি চিঠি আসে। চিঠিখানা এসেছে করাচী থেকে, লেখক উনপঞ্চাশ নম্বর ~~কলিকাতা~~ ^{কলিকাতা} পল্টনের একজন হাবিলদার, নাম কাজী নজরুল ইসলাম। ছোট্ট চিঠির সঙ্গে ছোট্ট একটি কবিতা। কবিতাটি রবীন্দ্রনাথের বলে অনায়াসেই চালিয়ে দেওয়া যায়।

যথাসময়ে সম্পাদক মহাশয়ের নিকট রচনাটি পেশ করলাম। চৌধুরী মহাশয় বললেন, কবিতাটি সুলিখিত, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রভাব বড় বেশী, লেখকের স্বকীয়তা খুব কম।

লেখাটি তিনি সবুজপত্রে প্রকাশ করতে অসম্মত হলেন। আমার কিন্তু লেখাটি ভাল লেগেছিল। তাই সেটি নিয়ে আমি 'প্রবাসীর' চাকর বাবুর কাছে গেলাম। তিনি সানন্দে লেখাটি প্রকাশ করতে রাজী হলেন এবং সেই মাসের প্রবাসীতেই কবিতাটি প্রকাশিত হ'ল। চাকর বললেন, এর লেখা পেলে ছাপব। ওকে চিঠি লিখে দাও।

সৈনিক-কবির কাছে খবরটা শুয়ে ভয়ে পাঠালাম কেন না, কবিতাটি যে-কাগজের জন্যে প্রেরিত, সেই কাগজে ছাপা না হয়ে লেখকের অজ্ঞাতেই তা পত্রান্তরে প্রকাশ করার মধ্যে একটি অশোভনতা আছে বই কি।

কিন্তু কবি আমাকে ভুল বোঝেন নি, সঙ্গে সঙ্গে সাধুবাদ দিয়ে আমাকে পত্র দিলেন। চিঠিতে একটা আশ্বীয়তার সুর।

এমনি করেই নজরুলের সঙ্গে আমার পত্রালাপ চলতে লাগল। এক চিঠিতে লিখলেন, শীঘ্রই তাঁদের বাহিনী ভেঙে দেওয়া হবে, তিনিও বাঙলায় ফিরে আসছেন।

এরই কিছুদিন বাদে সবুজপত্র 'আপিসে গিয়ে একদিন শুনি—কে-একজন হাবিলদার কাজী নজরুল ইসলাম আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। ঠিকানা রেখে গেছেন : বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীট।

বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলায় তখন একঘরে থাকেন বন্ধুবর আফজল উল হক, আর এক ঘরে বন্ধুবর মুজফ্ফর আহমদ। সামনেকার ঘরে বঙ্গীয় সাহিত্য সমিতির দফতর ও পাঠাগার। আফজল তখন তাঁর মোসলেম পাবলিশিং হাউস নামক বইয়ের দোকান পরিচালনা করেন, আর মুজফ্ফর সাহিত্যের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের স্বপ্ন দেখেন। তখনও তিনি সাম্যবাদে দীক্ষা গ্রহণ করেন নি। ইতিপূর্বে এঁদের সঙ্গে আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের সুযোগ ঘটেছিল। আফজলের ঘরেই তাঁর জ্যেষ্ঠতাত দাদা আজিজ-উল হক (বর্তমানে স্ত্রীর মোহাম্মদ আজিজুল হক) সাহেবের সঙ্গে পরিচিত হই। তিনি তখন আইন পরীক্ষায় পাশ করে কুমিল্লাগরে ওকালতি শুরু করেছেন। কাজী আবদুল ওহুদ সাহেবও এই সময়ে আফজলের ঘরে উঠে আসেন।

সেই দিনই রিকশে বত্রিশ নম্বরে এসে হাজির হলাম। সমিতির ঘর ও আফজলের ঘর তালা বন্ধ, ভিতরের দিকে থাকেন মুজফ্ফর। সেই ঘরের দিক থেকে- ভাঙা হারমোনিয়মের বেহুরো আওয়াজ কানে এল।

ভিতরে গিয়ে দেখি একটি প্রাণবন্ত তরুণ তরুণীপুষ্পের উপর বসে-ভাঙা হারমোনিয়মের সাহায্যেই সুর তাঁজছেন। গারে তাঁর

একটি নতুন-কেনা ধোলাই গেঞ্জি, পরণেও একটি রঙিন নতুন লুঙ্গি। আমাকে দেখতে পেয়েই প্রসন্ন জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। আমি বললাম : হাবিলদার-কবিকে চাই।

তরুণ সহাস্ত্রে লাফ দিয়ে উঠেই আমার দুহাত জড়িয়ে ধরলেন।

সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্ন হল : আপনিই কি পবিত্র গাঙুলী ?

আমার জবাবের আগেই কখন যে তার আলিঙ্গনে পিষ্ট হলাম, আজ এতদিন পরে তা মনে করতে পারছি নে। মিনিট কয়েকের মধ্যেই ‘আপনি’ থেকে-তুমিতে এসে পৌছলাম এবং যখন দু’জনের ছাড়া-ছাড়ি হল তখন উভয়ে এই ধারণা নিয়েই ফিরলাম যে, আমাদের পরিচয় অনন্তকালের। আর সেই সঙ্গে আমি এই ধারণাটি ফাউহিসেবে নিয়ে এলাম যে, এতদিন যাদের চিনেছি জেনেছি—এ তাদের স্বগোষ্ঠীয় নয়, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ভিন্ন জগতের, ভিন্ন জাতের।

প্রতিদিনই আড্ডা চলতে লাগল। সে আড্ডায় মুজফ্ফর, আফজল, শৈলকামন্দ, নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ, মঈনুদ্দী হোসেন, খান মঈনুদ্দীন, কবি সাহাদৎ হোসেন, মহম্মদ শহীদুল্লাহ্ (তখনও ডকটর হন নি), ভোলার মোজাম্মেল হক, কবি গোলাম মোস্তফা—আরও অনেকে এসে জুটতে লাগলেন। গান, হাসি, ঠাট্টায় বাড়ীটা কাপতে থাকত। অমন প্রাণখোলা অট্টহাসি আর কারুর মধ্যে দেখিনি। তবে মনে আছে, একবার স্পেনের প্রসিদ্ধ লেখক ভিসেন্ট ব্রাবো ইবানেজকে অমন অট্টহাসিতে দেখেছিলাম। রাত নেই, দুপুর নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যা নেই—নজরুলের অট্টহাসি আর গান লেগেই আছে। একাধিকমে তিন-চার ঘণ্টা গান সে প্রসন্নমনেই চাপিয়ে যেত। হেসে হেসে বলত : ঘাড়ের উপর মাথাটা যতক্ষণ খাড়া আছে ততক্ষণ গান চলতে পারে। স্বকণ্ঠনা হলেও শ্রোতাকে গান শুনিতে বশ করবার অনন্যসাধারণ নৈপুণ্য তাঁর আঠারআনাই ছিল। চা

খেতে খেতে নবাগত কোন বন্ধুকে দেখতে পেয়ে চোঁচিয়ে ওঠা : দে
গল্পের গা ধুইয়ে !

শান্তিভঙ্গের অভূহাতে বাড়ীওয়ালারা (তাঁরা ভিতরের দিকে
থাকতেন) আকঙ্কলকে শাসাতে লাগলেন কিন্তু প্রাণপ্রচুর তরুণ
কবির হাঁস নেই। রবীন্দ্রনাথের গান, কবিতা তখন আমাদের আড্ডার
বিষয়বস্তু, আর নজরুল তার মধ্যমণি।

এই সময়েই আকঙ্কল একখানা সচিত্র মাসিকপত্র বার করবেন
স্থির হল। কাগজের নাম হল “মোসলেম ভারত”—সম্পাদক হলেন
আকঙ্কলের বাবা প্রবীণ কবি মোজাম্মেল হক সাহেব। নজরুল
প্রোৎসাহিত হয়ে ‘মোসলেম ভারত’-এর জন্তে গদ্য পদ্য লিখতে
লাগলেন। নজরুলের আসল কবি-জীবনের শুরু হল। প্রথম সংখ্যায়
কবির “সাতিল আরব” কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এই কবিতাটি
রচনার একটি ইতিহাস আছে। সৈনিক-কবির কাছে কতকগুলি
সচিত্র যুদ্ধ প্রপাগান্ডা পুস্তিকা ছিল। তার মধ্যে ভারী সুন্দর
একখানা প্রাকৃতিক দৃশ্যের ছবি ছিল—ছবিখানার নাম,
সাতিল আরব। আকঙ্কল তাঁর কাগজের প্রথম সংখ্যায় এই ছবিখানি
প্রকাশ করবেন স্থির হল। চিত্র-পরিচয় লিখতে গিয়ে নজরুল ঘণ্টা
খানেকের মধ্যে যে কবিতা রচনা করলেন, সেটিই উক্ত প্রসিদ্ধ
কবিতা। এর সুর, এর ছন্দ, এর শব্দসম্পদ—সব কিছুই বাঙলা
কাব্য-সাহিত্যে একটা নতুনত্বের আমদানি করল। একদিনেই
বাঙলার কণ্ঠ্যমোদীরা বাঙলার কাব্য গগনে সব সূর্যোদয়ের আভাস
লক্ষ্য করল। অনেকেই প্রশংসা করতে লাগলেন—এক এই কবি !

একদিন গজেনদার আড্ডায় কবি মোহিত লাল জিজ্ঞাসা করলেন :

“ওহে, হাবিলদার-কবিটি কে জান ?

মণিলাল বললেন : হাঁ, ছোকরার কলমে একটা নতুনদের সুর পাচ্ছি। 'ভারতী'র জন্মে ওর লেখা পেলো ভাল হয়।

অতএব ছোকরাকে হাঙ্গির করতেই হবে।

— এর দু-চার দিন পর নজরুল আর আমি কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট দিয়ে কোথায় যাচ্ছিলাম। আটত্রিশ নম্বর কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীটের রকে দরজার একপাশে গজেনদা অপর পাশে মণিদা বসে গল্প করছেন, বেলা তখন প্রায় নয়টা।

বল্লাম : মণিদা, এই আপনাদের জাবিলদার কবি, পরিচয় হয়ে গেল। গজেনদা বললেন, চল, ভিতরে গিয়ে বস।

— ঘবে ঢুকেই নজরুলের নজর পড়ল অব্যবহার্য ধূলি-ধূসরিত টেবিল-হার্মোনিয়মটার উপর। আমরা এতদিন ওই শব্দে আড্ডা দিচ্ছি, ওটা যে একটা টেবিল-হার্মোনিয়ম এ কখনও মনেই হয় নি। নজরুল কারুর সঙ্গে আর কথা না বলেই টুলটি চোঁকির উপর লক্ষ্য বস্তুটির কাছে নিয়ে গিয়ে বসে ডালা খুলে তার অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে লাগলেন।

গজেনদা হেসে বলে উঠলেন : ও ধুলো ঘেঁটে কোন ফয়দা নেই ভাই, ওটা একেবারে অচল। কতদিন যে ধুলো মেখে ওটা ওখানে পড়ে আছে তা মনেও পড়ে না।

নজরুল অস্ত্রমন্ড অবস্থায় দাদার দিকে মুখ না ফিরিয়েই জবাব দিলেন : দেখিই না কেমন আছে।

ঘন্টা দুই ধরে 'দৈখা' চলল। অনেক চেঁচানোর পর প্রাথমিক 'দৈখা' শেষ হল। হার্মোনিয়মে দু'টাং শব্দ বেরুল। নজরুলের সে কি উল্লাস!

বেলা তখন প্রায় বারটা, বাড়ীর ভিতর থেকে বোমি (গজেনদার স্ত্রী) বলে পাঠালেন : আমরা ঘেন অত ঝেলায় অতুল না চলে যাই। অতএব নজরুলকে রেখে আমি বাসায় চলে এলাম। বিংকল

পাঁচটায় গজেনদার বাড়ীর সামনে দিয়ে যাচ্ছিলাম, আমাদের আড়া ঘরে থেকে হার্মোনিয়মের স্বর ভেসে আসছে। ভিতরে গিয়ে দেখি, হার্মোনিয়মের গায়ের ধুলো নজরুলের সর্বাঙ্গে ছড়িয়ে আছে, আর মনের আনন্দে নজরুল হার্মোনিয়ম বাজিয়েই চলেছে।

মোহিত লাগেই সঙ্গে পরিচয়ও ওই গজেনদার আড়াতেই হয়ে গেল। মোহিতবাবু তখনই স্প্রুতিষ্ঠ কবি। কিন্তু তা হলে কি হবে, তাঁর ভিতর যে একজন গুরুমহাশয় ছিলেন তিনি আত্মপ্রকাশে বিলম্ব করলেন না : নজরুলকে ইংরেজ কবিদের কাব্য পাঠ করতে হবে। ভয়ে ভয়ে নজরুল মোহিতবাবুর প্রস্তাবে সম্মত হলেন। কিন্তু নিয়ম করে ব্রাউনিং-শেলী-কীটস পড়বার উৎসাহ দুদিনেই উবে গেল। একদিন যখন মোহিতবাবু একটি ইংরেজী কবিতা আবৃত্তি করছিলেন তখন নজরুল মোহিত বাবুর নিম্নলিখিত নেত্রের স্বেগ নিয়ে তাঁকে বক দেখাতে শুরু করলেন। হঠাৎ মোহিত বাবুর নজরে পড়ে গেল। বলা বাহুল্য, তিনি ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে তখনই স্থান ত্যাগ করলেন। এর পর থেকে এ দুজনের আর কখনও মিলন হয়নি বলেই আমি জানি।

‘মোসলেম ভারত’-এর পর্ব শেষ হতে না হতেই নজরুলের ইচ্ছে হল, একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বের করেন। কাগজের নাম দেওয়া হল ‘ধুমকেতু’। সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্যের গলি থেকে ‘ধুমকেতু’ প্রকাশিত হল। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ আর আদমজল-উল-হক হলো তার পুচ্ছ। রবীন্দ্রনাথ আশীর্বাদ করে পাঠালেন :

“অয়ি চলে আয় রে ধুমকেতু

আধারে বাধ অয়িসেতু,

দুর্দিনের এই দুর্গনিরে

উড়িয়ে দে তোর বিজয়-কেতন।

নজরুল

অলক্ষণের তিলক-রেখা

রাতির ভালে হোক না লেখা

ঐগিয়ে দে রে চমক মেয়ে

আছে যারা অর্দ্ধচেনা।”

কাগজ হু হু করে চলতে লাগল। নজরুল গাঞ্জে পঞ্জে সম্পাদকীয় চালাতে লাগলেন। জলবিছুটির-রসে-ভেজানো শব্দর মাছের চাবুকের ঘা যেন পড়তে লাগল ভক্তদের পিঠে। সে এক উন্মাদনার যুগ। কত লোক এল, কত হাসি, কত গল্প—সে যেন আর কুরায় না।

একদিন জোড়াসাঁকো থেকে আমেশ এল নজরুলকে নিয়ে যেতে হবে। যথাসময়ে হাজির হলাম। গুরুদেব নজরুলকে কত প্রশ্ন করে তাঁর সব কিছু খবর জেনে নিলেন। গানও শুনলেন, খুশীও হলেন। পরে বললেন : হাঁরে, তুই তলোয়ার দিয়ে দাড়ি কামান কেন ? তলোয়ার দিয়ে দাড়ি কামানো যায় বটে, কিন্তু তলোয়ারের পৃষ্টি তো দাড়ি কামানার জন্তে নয়।

একথার কোন জবাব না দিয়ে, নজরুল গুরুদেবের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলেন।

“মোসলেম ভারত”-এই নজরুলের উৎকৃষ্ট কবিতাগুলির বেলীরা ভাগ প্রকাশিত হয়। বিদ্রোহী কবি বাঙলার শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত হলেন। স্বল্পায়ু “ধুমকেতু”ও অল্প সময়ের মধ্যেই দেশবাসীর চিন্তা জর করল। সঙ্গে সঙ্গে পুলিস-শাসিত বাঙলা সরকারের স্তন্যদুষ্টিও “ধুমকেতুর” পানে নিবদ্ধ হন। পুজোর সংখ্যা “ধুমকেতু” মহামারার বোধন করলেন :

“আর কতকাল থাকবি কেঁদে

মাটির ঢেলার মূর্তি আড়াল,

গল্প-ভারতী

স্বর্ণ যে আজ জয় করেছে

অত্যাচারী শক্তি-টাডাণ ।...

কলে কবি হলেন চিফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের এজলাসে রাজদ্রোহের অপরাধে অপরাধী। বিচারে এক বছর সশ্রম কারাবাসের আদেশ হল। নজরুল আদেশ শুনে চুপি চুপি আমাকে বললেন : ছুঃঃ করিস নে ভাই, একটা বছর দেখতে দেখতে কেটে যাবে। হ্যাঁ, আর এক কথা, ‘আমার জগতের’ খবরগুলি যেন নিয়মিত জোগান দিস।

জবাবে বললাম : নিশ্চয় পাবি। তার জন্তে ভাবিস নে। সময়টা কেবলি আড্ডা মেয়ে কাটাস নি। লেখা ছেড়ে দিস নে। যেমন যেমন লেখা হবে পাঠিয়ে দিস। সেগুলির বিনিময়ে যে অর্থ সাময়িক পত্রিকা থেকে পাব, তাই দিয়েই ‘তোার জগতের’ সব খবর পৌছানোর ব্যয় নির্বাহ করব। তা নইলে আমি অন্ত জোগাব কোথেকে!

নজরুল হাসিমুখে আলিঙ্গন করে কয়েদীর বন্ধগাড়ীতে প্রবেশ করলেন।

*

*

*

*

“ধুমকেতু” উঠে গেল। বীরেন সেন চালাতে চেষ্টা করলেন কিন্তু আর জমল না। যে প্রাণপ্রাচুর্য ‘ধুমকেতু’র ছিল জান—সে তখন ইংরেজের কয়েদখানায় আবদ্ধ।

একদিন জোড়াসাঁকো থেকে খবর এল—রবীন্দ্রনাথ ডেকেছেন।

কবি-গুরুকে প্রণাম করুতেই তিনি সর্বাঙ্গে নজরুলের খবর জানতে চাইলেন। বললাম : আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে আছে, শারীরিক ভালই আছে। মামলার খবরও বিস্তারিত শুনলেন। সব শুনে বললেন : কি শীগগির ওর সঙ্গে দেখা করতে যাবি ?

নজরুল

—হাঁ, দরখাস্ত করেছি।

—তা হলে ত ভালই হল।^১ আমার “বসন্ত” নাটিকা ওর নামে উৎসর্গ করেছি। বই^২ একখানা ওকে পৌছে দেওয়া দরকার।

এই বলে তিনি একখানা “বসন্ত” আমাকে দিলেন। উৎসর্গ-পত্রে নাম দস্তখত করে দিতেও তুললেন না।

যথাসময়ে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে গিয়ে হাজির হলাম। সঙ্গে মিঠা পান, জুড়া, দাড়ি কামানো ব্রেড, চিকি সুপারী, হেজলিন ন্নো ইত্যাদি বরাদ্দী জিনিসগুলি। কুশলপ্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর মোটা লোহার গরাদে ও মোটা তারের বেড়ার ও-পাশ থেকে নজরুল জললেন : সব এনেছিস ত ?

জবাবে বললাম : হাঁ, সব কিছুই এনেছি। তার সঙ্গে আর একটা এমন বস্তু ফাউ এনেছি—যা পেয়ে তোরা -কারাবাসও স্বর্গবাসে পরিণত হবে।

জিজ্ঞাসাদৃষ্টিতে নজরুল তাকিয়ে রইলেন, চোখে তাঁর বিপুল বিস্ময়। বস্তুটা কি জানবার জন্তে ছটফট করতে লাগলেন। পকেট থেকে “বসন্ত” নাটিকাখানা বার করে ওঁকে দেখালাম। আনন্দে নৃত্য করে উঠলেন।

বললাম : শুধু এই নয় রে, আরও আছে। দাঁড়া, দেখাচ্ছি।

পরে উৎসর্গ পৃষ্ঠাটি বার করে পড়লাম :

“শ্রীমান করি কাজি নজরুল ইসলাম

কল্যাণীয়েষু—

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রথমটা শুনেই দুচোখ^৩ কপালে তুলে স্বামীর দিকে অবিশ্বাসের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। বইখানা হাতে পাওয়ার জন্তে এমন চঞ্চল

হয়ে উঠলেন যে, পারেন ত তাঁর বেড়া লোহার গরাদ ভেঙেই বাইরে বেরিয়ে আসেন। সঙ্গে সঙ্গে চিড়িয়াখানার খাঁচাবন্ধ বাঘের ছবি চোখের সামনে ভেসে উঠল!

বললাম : অত বাস্তব হয়ে লাভ কি? বই যখন এনেছি, একসময় হাতে পাবিই।

জবাবে বলল : তুই বুঝবিনে পবিত্র, এই মুহূর্তে ওটা হাতে পাওয়ার ক্ষমতা আমি জীবন দিতে পারি, সত্যি পারি।

বললাম : তা জানি। কিন্তু জীবন দিয়ে কোন লাভ নেই। একটু সবুজ কর।

একজন ফিরিশ্চি অফিসার এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করল : কয়েকটা এমন করছে কেন? বললাম : এই বইখানি হাতে পাওয়ার ক্ষমতা।

—ও বইয়ে কি আছে?

—কবি-গুরু রবীন্দ্রনাথের সদ্যপ্রকাশিত নাট্যকাব্য, ঠেকে উৎসর্গ করেছেন।

—তাই না কি, ইনি অত বড়?

—তা নয় ত কি!

অফিসারটি কি ভেবে দরজা খুলে দিতে বলল। দরজা খোলা হতে না-হতেই এক লাফে বাইরে এসে নজরুল আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। বইয়ের কথা আর তখন তাঁর মনেই রইল না। বইখানা তখন আমার হাত থেকে মেয়েতে পড়ে গেছে।

ইতিমধ্যে অফিসারটি নজরুলকে আবার জড়িতরে যেতে বলল। একান্ত ভাল ছেলের মত প্রসন্নমনেই তিনি চলে গেলেন। ভুলুটিত বইখানি ভাড়াভাড়ি তাঁর হাতে তুলে দিলাম।

ভিতরে গিয়ে বইখানি কপালে ছোয়ালেন এবং শিছন ফিকে

নজরুল

বললেন : আজ আর না। আর একদিন আসিস—শীগগির। আজ থেকেই তোরা কবিতা লিখতে শুরু করব।

জেল থেকে প্রথম কবিতা পেলাম—“স্বাধীনতার উল্লাসে,” লাল কালিতে লেখা। কবিতাটি প্রথম সংখ্যা “কল্লোল”-এ প্রকাশিত হয়। পরে “দোলন চাপা”র গোড়ায় সেটিকে ভূমিকান্তরূপ দিই। আজও হয়ত সে ব্যবস্থাই রয়ে গেছে। “দোলন চাপা”র সব কবিতাই জেল-বাসের সময় লেখা।

সেট্রাল জেলে বেশী দিন ছিলেন না। সেখান থেকে ঠুকে হুগলী জেলে বদলী করা হল। সেখানে কর্তৃপক্ষের অসম্মত আচরণের প্রতিবাদে নজরুল আর-আর রাজবন্দীদের নিয়ে অনশন ধর্মঘট শুরু করলেন। কলে প্রতিদনই নতুন, নতুন শাস্তির ব্যবস্থা চলল। পরে ঠাঁর মুখে শুনেছি, কারা-আইনের হুদায় কয়েদীর প্রতি যে-সব শাস্তির বিধান আছে, একে একে তার সবগুলোর সঙ্গেই নাকি ঠাঁর মোকাবেলা হয়েছে।

অনশন ধর্মঘটের সময় বহু চেষ্টা করেও দেখা করবার অসুযোগ পাই নি। এমন কি, অনশন ধর্মঘট ভেঙে দেবো—এ প্রতিশ্রুতিও কোন কাজে আসে নি। বাঙলা সরকারের চিক সেফ্রেটারীকে দার্জিলিঙে তার করলাম। সেখান থেকেও অসুযোগ এল না। জবাবে চিক সেফ্রেটারী জানানলেন—“আপনার অসুযোগ রক্ষা করতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করছি।” এদিকে খবর পেলাম, নজরুলকে জোর করে নল দিয়ে দুধ খাওয়ানো চলছে। কুমিল্লার বীরেনের মাঁকে আসবার জন্য খবর দিলাম এই মনে করে যে, তিনি জীলোক, তাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হবে না, আর তিনি জেলে গিয়ে নজরুলকে অনশন ভাঙতে রাজী করাতে পারবেন। তাঁ ছাড়া, পরদ্ব্যাকগত ব্যারিস্টার মিঃ আবদুল্লাহ সুরহাওয়ারী তখন বাঙলার বেসরকারী জেল-পরিদর্শক।

হাইকোর্টের প্রসিদ্ধ এডভোকেট শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রকুমার বসু মহাশয়ের সাহায্যে মিঃ সুরহাওয়ার্মিকে হুগলী জেলে পাঠানো হল। তিনি ব্যর্থ মনোর্থ হয়ে ফিরে এলেন। নজরুল অনশন/ভাঙতে রাজী হলেন না। কবি-গুরু তখন শিলং-এ। নিরুপায় হয়ে তাঁকে এ খবর দিলাম। তিনি লিখলেন—আদর্শবাদী নজরুলকে তার আদর্শচ্যুত করতে তিনি কোন সাহায্যই করতে পারেন না। অনশনের ঊনচল্লিশ দিনের দিন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে সভাপতি করে কলেজ স্কোয়ারে এক প্রতিবাদ-সভা আহ্বান করলাম। সভায় সর্বসম্মতিক্রমে যে-প্রস্তাব গৃহীত হল সেটি নজরুলকে পাঠালাম। সেই দিনই চাটগাঁ মেলে বীরেনের মা কলকাতায় এলেন। পরদিন প্রাতে তাঁকে নিয়ে হুগলী গিয়ে সাক্ষাতের অহুমতি চাইলাম। মাকেই শুধু দেখা করবার অহুমতি দেওয়া হল। আমি ও বীরেন বাইরে অপেক্ষা করতে লাগলাম।

মা এখন চোখ মুছতে মুছতে বাইরে চলে আসছিলেন, তাঁর পিছনে দেখি নজরুল হাসতে হাসতে আসছে। ফটকের ওপাশ থেকে ছহাতে গরাদে ধরে আমাদের শুধু এই বললেন : তোর চেষ্টা সফল হল পবিত্র। নিশ্চিন্ত মনে চলে যা। আর তোদের বিব্রত করব না।

নজরুল অনশন ভঙ্গ করলেন।

শহরের মাঝখানে কবির প্রস্তর-মূর্তি। তার'পর বসেছে একটা কাক।

অনুন্নয় করে কাক বলে- তোমার ওপর একটু বললাম রাগ কোরো না কবি !

কবি হেসে বলে, তবু তো তুমি এসেছ, যারা আমার এই পাথরের মূর্তি-পড়লো, তারা যে এ-পথ দিয়েও হাটে না।

জয়-পরাজয়

শ্রীজয়ন্তকুমার চৌধুরী

‘শ্রামহরি ফাষ্ট’ লেন।’

গলির মুখে দাঁড়িয়ে আপনি হয়তো ভাববেন কর্পোরেশনের অবিবেচনার কথা। গলিটার নাম ‘লেন’ না দিয়ে ‘ষ্ট্রীট’ দিলেই ত হোতো।

অনেকেই এ কথা ভাববেন জানি, কারণ কাউকে তো আর গলির শেষ পর্যন্ত যেতে হয় না। শেষ পর্যন্ত মানে—এর বাড়ীর বাইরের ঘরের দরজার চৌকাটে মাথা খুঁড়তে খুঁড়তে; এর বাড়ীর রান্নাঘরের জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে, ধাক্কা খেতে খেতে রাস্তাটা যেখানে এসে শেষ হয়েছে। আপনাকে চমকে এবং রীতিমত ঠকিয়ে দেবার গর্বের :—আপনার অবাক-হওয়া মুখের পানে চেয়ে মুচ্কি হেসে রাস্তাটা যেখানে পনেরো ফুট থেকে হঠাৎ এবং নিতান্ত আকস্মিক ভাবে দেড় ফুটে পর্যাবসিত হয়েছে,—সেইখানে।

এহেন শ্রামহরি ফাষ্ট’ লেনের শেষ সীমার, ঠেকে যাবার ভয়ে যেখানে আপনারা পারংপক্ষে চোকেন না—ওটি বাড়ী।

এবাড়ী আর ওবাড়ী। লাল আর হলদে। সামনা-সামনি ;—যেন দুজনে দুজনকে কোলাকুলি করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এবাড়ীর রান্নাঘরে আলো আললল ওবাড়ীর বাইরের ঘরের অন্ধকার ঘুচে যায়।

এহেন বাড়ীতেও লোক থাকে। হ্যাঁ, সত্যিই দুটো বাড়ীতেই লোক থাকে সপরিবারে। হরিহর বাবু আর শ্রামলাল বাবু।

এবাড়ীতে হরিবাবু আর বিন্দুবাসিনী দেবী, আর ওবাড়ীতে শ্রামবাবু আর জগজ্জ্যোতি দেবী।

গল্প-ভারতী

হু-বাড়ীর কর্তায়-কর্তায় এবং গিন্নিতে-গিন্নিতে ভাব অসাধারণ।—
ঠিক বাড়ী ছোটোরই মত।

নির্জন এই দেড়ফুট গলির মধ্যে হু-বাড়ীর ভাব হওয়াই স্বাভাবিক।
নির্জন মানে, কেউ-ই তো পারংপক্ষে মাথা গলায় না ওদিকটায়।

কর্তায়-কর্তায় ভাবের পরিচয় পাওয়া যায় বাজারে আর আপিস
বাবার পথে। আর গিন্নীর তাঁদের ভাবের পরিচয় দেন ছাত্তের
পাঁচিলে ভর দিয়ে, দুজনের মধ্যে মাত্র এক হাত ব্যবধান রেখে।

দুপুরে কর্তাদের আপিসে পাঠিয়ে নিজেদের খাওয়া চুকিয়ে পান
খেতে খেতে এবং আঁচলের গেরোয় কিছু পান ও দোস্তার সঞ্চয়
নিরে দুজনে গিয়ে ছাতে ওঠেন। তারপর মুখ আর আঁচলের পুঙ্খ
যখন খালি হয় তখন নিতান্ত অনিচ্ছাসহেও নেবে আসতে হয়
দুজনকে ;—ততক্ষণে কর্তারাও এসে পড়েন।

দুজনে পাঁচিলের ওপর ভর দিয়ে গল্প করেন। পান খান আর
পিচ্ ফেলেন, পিচ্ ফেলেন আর পান খান। এবাড়ীর পিচে এবাড়ীর
পাঁচিলের কার্ণিস হয় লাল, এবাড়ীর পিচে এবাড়ীর কার্ণিস। দুজনে
তু ধু দোস্তা আর পানের কোটো খুলে গল্প করে যান না, সেই
সঙ্গে প্রাণের কপাটও যায় খুলে।

—সত্যি ভাই, ওরকম জাগ্রত দেবতা আর দুটি নেই!

—তবে বলি ভাই, আমাদের পীরপুরের মা-মন্সোও কম যান না।
আমাদের বাড়ীর পাশে এক চাষা থাকতো, তার সোমোস্তো ছেলেটাকে
কামড়ালে সাপে। যা-তা সাপ নয়, একবারে বকউটে। মেকি যে-
সে বিষ দিদি, পাঁচ মিনিটের ভেতরেই ছেলেটা মরে একেবারে
কাঠ। মাঠ থেকে তার বাপ আর লোকজন সকলে মিলে মরা-
ছেলেটাকে আর আধমস্ত সাপটাকে তৈরি নিয়ে এলো ভাই।
হ্যাঁ, সাপ বটে দিদি। মার খেয়ে কি তার ফোসফোসানি,

বাপু! তা ভাই সেই ছেলেটার মা কি কান্নাটাই না কাদলে সেই মনসা-তলায় পড়ে। তা দিদি, বলে বিশ্বাস করবেনা, পাঁচ মিনিটের ভেতর ছেলেটা তড়াং করে উঠে পাড়িয়ে বলে কি না—
‘আমায় কান্ডে দে আমি মাঠে যাবো!’

ওবাড়ীর গাঁয়ের ওলাই-চণ্ডীর মহিমা-কীর্তন আগেই সমারোহে সুসম্পন্ন হয়ে গেছে; সুতরাং এ-প্রসঙ্গে তাঁর আর নতুন কিছু বলবার নেই এবং সেটা এঁদের কথোপকথনের নিয়ম-বিরুদ্ধ ব্যাপার; কাজেই ও-প্রসঙ্গ ঐখানেই থেমে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয় নতুন প্রসঙ্গের—

—হ্যাঁ দিদি, তোমার ওনার আপিসের বড়বাবু লোক কেমন ভাই?

—তা যদি বলো দিদি, মিথ্যে বলবো না, ঠেকে একবারে—

—ঠিক আমাদের ঠুন্দের মতই দেখছি। তা হবে না কেন ভাই, কতবড় কাজের লোক উনি।

—কাজের কথা যদি বল দিদি,—সে ঠুর। বড়বাবু ত পট্টাই বলেন, চকোত্তি ভূমি আছে বলেই আজও মানে মানে চাকরি বজায় রেখে চলেছি। এক একদিন নিজের কাজ পর্য্যন্ত ঠেকে দিয়ে করিয়ে নেন।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর আসে—আমাদের ওঁরও ভাই ঠিক ভাই। দেখনি, এক একদিন আপিস থেকে আসতে কত রাত হয়ে যায়।

অনেকখানি পিচং মুখের মধ্যে জমেছিল। নীচের ঠোঁটের ফাঁকে এতক্ষণ সেটা অনেক কায়দা করে রেখেছিলেন বাড়টাকে ওপোর দিকে তুলে। কেবলমাত্র জিভ এবং তালুর সাহায্যে কথা চালিয়ে আসছিলেন এতক্ষণ; আর পারলেন না। ওবাড়ীর কার্নিস্ টিপ করে পিচটি ফেলে দিয়ে আবার বক্তৃতা শুরু করলেন—

—তা দেবী কেন হয় জানো তো? গোড়ায় গোড়ায় আমি জানতুম না ভাই। একদিন ওইরকম দেবী করে বাসায় ফিরেছেন; —আমি তো খুব খানিকটা বকুনি দিলাম। তা তাতে যা উত্তর দিলেন ভাই, তারপর আমার আর রাগ রইলো না। বললেন কি জানো? বললেন, কি করব বল, বড়বাবু যে আমাদের ছাড়তে চায় না,—ঘোষ এটা কোরে দিয়ে যাও, ঘোষ, এটা তোমায় আল কোরে দিয়ে যেতেই হবে;—তা ভাই, সেদিন রাত্তিরে উনি আর কিছু খেলেন না, বড় বাবু না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়লেন নী।

—হ্যাঁ ভাই, এসময় পুরীর জল হাওয়া কি ভালো? কি যে করি কিছুই ঠিক করতে পারছি না। আমার মন চাইছে না যেতে দিতে, অথচ বড়বাবু অতো কোরে ধরেছে, ভালোও বাসে লোকটা। কি স্বজ্ঞাতে ফেলেছে দেখতো ভাই! তুই যাবি তিথি করতে, তা ওঁকে ধরে টানাটানি কেন বাপু! যাক্ দেখি কি করি। এদিকে বাড়ী ফিরতে বোধ হয় রাত দশটা হবে।

‘বোধ হয়’ টা একটু জোর দিয়েই বলেন তিনি।

অবশেষে দুজনেরই ওনার বড়বাবুর কল্যাণ কামনা করে এবং দুজনের ওনারই ছুটির সময়কে পাঁচটা থেকে দশটায় পৌঁছে দিয়ে যথের শেষ পিচুটি অনেক কায়দায় সামনের কার্ণিসে টিপ করে ফেলে দিয়ে দুজনে নীচে নেমে আসেন।

দুজনের কর্তাই ঠিক সময়ে অর্থাৎ সাড়ে পাঁচটার ভেতরেই বাড়ী ফেরেন। দুবাড়ীর গিন্নীই স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করেন, কিন্তু তাতে কিছুই যায় আসে না এঁদের। কারণ পরের দিন যে এ প্রসঙ্গের আর পুনরাবহারণ হবে না সে বিষয়ে দুজনেই নিশ্চিন্ত।

এমনি করে সামনা-সামনি দুবাড়ীর গিন্নী দিনের পর দিন পতিচর্চা করে কাটিয়ে দেন—পরচর্চার সময়ই পান না। দিনগুলো কাটে

জয়-পরাজয়

মন্দ নয়। কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। কতি নেই তাতে একটুও। অবাধ অত্যাচার আনন্দে মন ভরে ওঠে, সেইটাই পরম লাভ।

কিন্তু বিধাতা বাদ সাধলেন। হঠাৎ একদিন ওবাড়ীর গিন্নী এবাড়ীর গিন্নীকে ডেকে বলেন—

—বাস ওঠাতে হোলো দিদি;—কতা ডিল্লিতে বনলি হলেন। পাঁচ-ছদিনের ভেতরেই কলিকাতা ছাড়তে হচ্ছে। বড় হওয়ার অনেক ঝগড়াট দিদি—অনেক ঝগড়াট। অমন কাজের লোক ত আর বাংলামুহুরে দুটি নেই, তাই না এতো টানা-হ্যাঁচড়া। ছোট ছোটসারের ছাড়তে চায় না। কিন্তু হলে হবে কি, বড়লাটসাহেবের জোর যে বেশী। জিদ ধরে বসেছেন, চকোত্তিকে চাই-ই চাই। বলে—যতো মাইনে লাগে দোবো। পয়সার ত আর অভাব নেই দিদি। ছোটলাট হচ্ছে বাংলামুহুরের রাজা, আর বড়লাট হচ্ছে সাংগঠনিক মুহুরের রাজা;—কার জোর বেশী তুমিই বল না তাই।

এবাড়ীর গিন্নী জবাব দেয়—তবে বল তাই, আমাদের ঠিকো নিয়ে যাবার জন্যে বড়লাটসাহেব দিনকতক খুব জেদাজিদি করেছিল, উনি বললেন চাকরি ছেড়ে দোবো তবু কলকাতা ছেড়ে একপা নড়তি না। শেষপর্যন্ত ওঁর জিদই বজায় রইলো। বড় রাষ্ট্রতন্ত্রী লোক কিনা, ঘাঁটাতে কেউ সাহায্য করলে না।

কেউ কাউকে বিশ্বাস করলে না বটে কিন্তু প্রাণ খুলে বেপরোয়া নিজের মনের মত কথাটা অবাধে আর একজনের কাছে ব্যক্ত করার কোণায় একটা আনন্দ আছে, নেশা আছে।

* * * * *

কিছুদিন পরে সামনের বাড়ীর কতা-গিন্নী কিন্তু হঠাৎ একদিন তল্লিতলা বেধে বাসা ছেড়ে চলে যায়।—কলকাতা ছেড়ে দিল্লীতে

নয়—শ্রামহরি ফাষ্টলেন ছেড়ে আর একটা গলিতে। সেখানে কম ভাড়ায় এর চেয়ে ভালো বাড়ী পাওয়া গেছে। বাড়ীটাতে ঘর বেশি, সাবলেট করে দু-পয়সা পাওয়া যায়।

বাড়ীটা খালি পড়ে থাকে না একবেলাও। দেখতে দেখতে নতুন ভাড়াটে এসে জোটে। নতুন ভাড়াটেদের গিন্নীর সঙ্গে নতুন করে আলাপ হয় সামনের বাড়ীর কেরানী গিন্নীর। ভাব জমে ওঠে দু-দিনেই।

কত কথা কয় দুজনে। বুজের কথা, জিনিসপত্রের হুমুঁল্যতার কথা, বস্ত্রসকটের কথা। তারি হুজুরে কেরানী-গিন্নী বলে ওঠে—

আর বল কেন ভাই, সবজিনিসেই ভ্যাজাল। এই সেদিন কত মাইনে পেয়ে একশ টাকার চারখানা নোট এনে হাতে দিলে। ওমা কি কাগজের ছিরি! একটু নাড়া-চাড়া করতেই নেতিয়ে গেল! একশ টাকার নোটেও কি ছাই ভ্যাজাল! বলত দিদি!

কর্তার বেতনটাকে বেপরোয়া বাড়িয়ে চারশ টাকায় নিয়ে গিয়ে গিন্নী ঠাকরুণ মনে মনে রীতিমত উল্লসিত হয়ে উঠলেন; উল্লাসটা কিন্তু বেশিক্ষণ স্থায়ী হোলো না। সামনের বাড়ীর গিন্নী মুহূ হেসে হুঙ্ক করেন—তবে বলি ভাই, হাজার টাকার নোটেরও ঐ দুন্দশ। উনি সেদিন পাঁচ খানা হাজার-টাকার নোট এনে হাতে দিলেন,—বললে বিশ্বাস করবে না দিদি; মনে হোলো যেন মুদীর মোকানের ফর্দে।

সঙ্গে সঙ্গে শুনিয়া দেন—তাদের উনিটি বাধা-মাইনের কেরানীগিরি করেন না—করেন ব্যবসা, যেখানে দুশো-পাঁচশো তো কোন্ ছার, পাঁচহাজার-দশহাজারই খই পায় না।

কেরানীগিন্নীর মুখখানা ভারী হয়ে ওঠে। রাস্তিরে বিছানায় শুয়ে — কর্তাকে বকিয়ে মারে। ব্যবসাদার-গিন্নীর দেমাকের কথা শুনায়। কর্তা কেবল হুঁ দিয়ে সারে। গিন্নী খোঁচাতে থাকে—বলে—দশহাজার

জয়-পরাজয়

বিশহাজার মাগীর মুখে লেগেই আছে। বলি, দশহাজার-বিশহাজার চোখে দেখেছিস কখনো? যত সব...

কর্তা এইবার মুখ খোলে, বলে—আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই এর মধ্যে। ব্র্যাক্-মার্কেটের দৌলতে আজকাল রামা-শ্রামাও ব্যবসা করে লাল হয়ে উঠছে। দশ-বিশহাজার টাকা আজকাল হাতের ময়লা বহিতো নয়।

সঙ্গে সঙ্গে ব্র্যাক্-মার্কেটের স্বরূপটা গিন্নীকে বুঝিয়ে বলতে হয়। কেনন করে দুজাপা জিনিস ঘরে মজুত করে সময় বুঝে অসম্ভব চড়া দরে বিক্রি করে এক একুজন দেখতে দেখতে রাতারাতি লাল হয়ে উঠেছে; তারই কাহিনী।

কেরালী-গিন্নীর মাথা যায় খুলে। মনে মনে কল্পনায় কর্তাকে পাঠিয়ে দেয় ব্র্যাক্-মার্কেটে। দশ-বিশহাজার টাকার ব্যবস্থা হয়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে। কল্পনার জোরে দেখতে দেখতে বাসা-বাড়ীর নীচেকার খরগুলো ভরে ওঠে চোরা-মালে—মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত।

সবই হয়ে গেছে, বাকী কেবল সামনের বাড়ীর ঐ দেমাকী গিন্নীমাগীকে ব্যাপারটা শুনিয়ে দেওয়া। নেহাত গভীর রাত্তির, নইলে ছাতে উঠে.....

পরদিন দুই গিন্নীতে দেখা হয় বিকেলের দিকে। বিপরীত দু'বাড়ীর ছাতের আলসেয় ঠেস দিয়ে দাঁড়ায় দুজনে। পান-দোকানার সঙ্গে চলে একথা-সেকথা। হঠাৎ একসময় কেরালীগিন্নী বলে ওঠে—এইবার দেখছি বাড়ী ছাড়তে হোলো দিদি।

ওবাড়ীর গিন্নী কারণ জিজ্ঞাসা করে। কেরালীগিন্নী ব্যাজার হয়ে বলে—আমি বলেই তাই এখনো এবাড়ীতে টিকে আছি, অন্য কেউ হলে.....

গল্প-ভারতী

সামনের বাড়ীর গিন্নী কিছুই বুঝতে পারে না। হাঁ করে চেয়ে থাকে।

কেরানীগিন্নী কর্তার নামে অভিযোগ করে;—বলে—আঁকেগটা দেখনা ভাই। একে তো একরত্তি বাড়ী, তার ওপর আবার যদি রাজ্যের মালপত্তোর এনে বাড়ী বোঝাই করা হয়, তাহলে টিকি কেমন করে বলত! বলে বলেন, বেলাক্-মার্কেট করতে হলে ওসব সহজে হয়। যত বলি—চাকরী করছ, চাকরী কর, ওসব নিতি নতুন ফ্যাশং আবার কেনরে বাপু! বলেন—যা বোঝো না তা নিয়ে মাথা ঘামাতে এসো না। কি বলব বল দিদি!

তারপর এই বেলাক্-মার্কেটের দৌলতে কর্তাটি ক্রমশঃ ক্রম হুমাসের মধ্যে শতরূ-মুখে ছাই দিয়ে ক্রমশঃ-ক্রম চার-পাঁচ লাখ টাকা জমিয়ে ফেলেছেন, সেই কথাটা প্রসঙ্গক্রমে শুনিয়া দেয়।

সামনের বাড়ার গিন্নী ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারে না। কিন্তু সে কথা স্বীকার করে খেলো হতে রাজী নয়। কাজেই সমজদারের মত ঘাড় নেড়ে যায়।

রাত্তিরে কর্তাকে সব কথা খুলে বনে। কর্তা চোখ দুটো কপালে তোলে। কেরানীগাঁও ভেতরে ভেতরে ব্লাক্-মার্কেট জুঝ করে নিয়েছে। আর ব্যবসাদার ধয়েও সে কি না...

—হোক না ছোট বাবিসাদার, তবু বাবসার লাইনেই তো রয়েছে চিরকালটা। মনের মধ্যে কোথায় যেন খচ্-খচ্ করতে থাকে। কতকটা যেন আপনমনেই বলতে থাকে—বাড়ীতেই চোরাই-মাল লুকিয়ে রেখেছে তা হলে?*

গিন্নী বলে—তবে শুনে কি ছাই এতক্ষণ? মাল দিয়ে বাড়ী একবারে বোঝাই করে ফেলেছে। মাথা গোঁজবার জায়গাটি পর্যন্ত রাখে নি।

তার সারান্নাও ঘুম হয় না। তার কে এক পিস্তুলতো না মাসতুলো ভাই কাজ করে পুলিশের গোয়েন্দা-বিভাগে। ভোর না হতেই খবর দেয় তাকে।

ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যেই লালপাগড়ীর দল এসে কেরাগীগিরীর বাড়ী ঘেরাও করে ফেলে। তারপর চলে খানাতল্লাস।

বিছানাপত্র ছিঁড়ে, বাক্স-প্যাটরা ভেঙ্গে, পুলিশের দল বাড়ীটাকে একবারে তচনচ করে ফেলে। শেবপর্যন্ত কিন্তু আবিষ্কার করে কচুটা।

হতাশ হয়ে লালপাগড়ীর দল যায় ফিরে। কর্তাবেশার ঠক ঠক করে কাপোয়ার ফাল্ ফাল্ করে আহাশকের মত চারিদিকে তাকায়। কিছুই বুঝে উঠতে পারে না। তার বাড়ীতে খানাতল্লাস! এমনটা হয় কি করে? গিন্নীকে জিজ্ঞেস করে। গিন্নী বলে—কি জানি বাপু, কিছুই তো বুঝতে পারছি না। মনে মনে কিন্তু সামনের বাড়ীর গিন্নীকে স্মরণ করে।

বিকেলের দিকে দুই গিন্নীতে দেখা হয় ছাত্তের আলসের ধারে। কথায় কথায় খানাতল্লাসের কথা ওঠে। সামনের বাড়ীর গিন্নী চোখ দুটো কপালে তুলে ভুরু কুঁচকে বলে—কার মুখ দেখে উঠেছিলে দিদি! কে এমন শত্রুরতা সাধলে তোমাদের? তারপর হঠাৎ বলে ওঠে—আমাকে সন্দেহ কর নি তো দিদি? কি জানি ভাই, মানুষের মন, কিছুই বলা যায় না।

কেরাগীগিন্নী হেসে বলে—তোমাকে সন্দেহ করতে যাবো কেন দিদি!

গল্প-ভারতী

তারপর গলার স্বরটাকে যথাসম্ভব নীচু করিয়া ফিস্-ফিস্ করে বলতে থাকে—এসব জিনিস কি বেশিদিন চাপা থাকে দিদি? এক-আধ টাকা নয়, পঁচাত্তর হাজার টাকা দিয়ে বালিগঞ্জে বাড়ী করা; পঁচাত্তর হাজার টালিগঞ্জে জমি কেনা; দেড় লাখ টাকা ব্যাঙ্কে জমা দেওয়া। সবইতো লোকে চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছে। কেরানীগিরি করে কেউ কখন রাতারাতি অত টাকা জমাতে পারে দিদি? হোল্‌ই বা চাক-পাচশো টাকা মাইনের কেরানী;—তুমিই বল, না ভাই! কাজেই পুলিশে তো সন্দেহ করবেই। তাদের দোষ কি বল!

তারপর গলার স্বরটাকে আরো নীচু করে ফিস্-ফিস্ করে বলে—চ্যাটার্জী ঠিক ঝাঁচ করেছিল দিদি। মালও খুঁজে বার করেছিল।

অবাক হয়ে সাধনের বাড়ীর গিন্নী বলে—তবে যে শুনলুম কিছুই পায় নি।

কেরানীগিন্নী আলসের ওপর হুঁকে মুখটাকে আরো খানিকটা বাড়িয়ে দিয়ে খুব চুপি-চুপি বলে—তবে সত্যি কথা বলি দিদি, দশটি হাজার টাকা ঘুষ দিতে হয়েছে পুলিশকে। কর্তাকে বললুম—কেমন হোলো তো;—দশটি হাজার টাকা বেরিয়ে গেল তো এক কথায়! কত কি বলে জানো দিদি, বলে—বেল্যাঙ্ক-মার্কেট করে যা জমিয়েছি, তাতে দু-দশ হাজার টাকা এলেই বা কি, আর গেলেই বা কি!

তারপর নিতান্ত ভালমাহুটির মত বলে—কি জানি ভাই, মেয়ে মাহুঘ অত-শত বুঝিনা, কাজেই চুপ করে থাকি।

উৎসর্গ মত্যাংগুলাগী

ত্রিবিম্ব মুখোপাধ্যায়

[ওয়াক্লো সোলঙ্কি জাতিতে পোল এবং লেখক হিসাবে খ্যাতিসম্পন্ন। খুব বেশি না লিখলেও, আজ পর্যন্ত তাঁর প্রায় ষোলখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। সোলঙ্কির কোন কোন রচনার মধ্যে উগ্র আধুনিকতার ছাপ থাকলেও তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি ঐকটু ভিন্ন ধরনের। নিজের লেখা সম্বন্ধে বলতে গিয়ে তিনি একজায়গায় লিখেছেন, ‘আমার প্রথম নাটক ‘my first play’ ১৯৩২ সালে প্রাগ্ শহরে অভিনীত হয়, এবং সেই প্রথম ব্যাপারেই সবাই মিলে বসিয়ে দেয় আমাকে। উক্ত দেশের প্রায় সমস্ত কাগজওয়ালারাই আমায় ছিছি করতে থাকে, কেবল একটি কাগজ ছাড়া। ঐ কাগজের সমালোচক কেবল লেখেন যে, এটি একটি অদ্বুত ধরনের অপূর্ব বই এবং এর অন্তর্নিহিত গভীর অর্থ সাধারণের পক্ষে বোঝা শক্ত। এতে আসি বেশ খানিকটা উৎসাহিত হই এবং প্রথম গ্রন্থ হিসাবে তা হবার কথাই; কিন্তু পরে খবর নিয়ে জানতে পারি যে, সেই সমালোচক ভদ্রলোক কোন দিনই আমার বই দেখতে রঙ্গমঞ্চে পা দেন নি। নিজের সম্বন্ধে এমনি সত্য ও স্পষ্ট কথা যিনিই লিখুন তিনিই রসিক নিঃসন্দেহ। ছোট গল্প, মানে সত্যিকার ছোট গল্প বলতে

যা বোঝায় তাতে সোলাস্কির হাত বেশ পাকা। এমন অপ্রামাণ্যিক কথাবর্জিত ঠাস বুননের গল্প ওদেশে খুব কম লোকই লিখতে পেরেছেন। গল্প ছাড়া নাটক নভেলও তিনি যেগুলি লিখেছেন সেগুলিও বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। তিনি নিজেকে অবিবাহিত কিন্তু ছোট ছেলেমেয়ে ভালোবাসেন অত্যন্ত। এছাড়া কালো কুকুর পোষা, বাই-সাইকেল চড়া ও পোকার খেলায় তাঁর দারুণ আকর্ষণ দেখা যায়। এই গল্পটি তাঁর ‘The man who hated lies’ হইতে অনূদিত।]

“উঠে দাঁড়াও!” সামনে রাখা নখিপত্রের উপর চোখ বুলিয়েই বিচারপতি অপরাধীর প্রতি নির্দেশ দেন।

“তোমার নাম জারোল্ড ম্যাটুশেক, বয়স চল্লিশ, তুমি অবিবাহিত। কিছুদিন পূর্বে তুমি ত্রাটিলভায় কাজ করছিলে, তারপর ডাক বিভাগে তোমায় এখানে বদলি করে। কিন্তু ইতিমধ্যেই তুমি আমাদের এই ছোট শহরে একটা ভ্রমন্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছ, এবং এ-ধরনের বদখ্যেয়ালী তুমি কেন করেছ তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না—আশা করি কোর্টের সামনে তুমি নিজেই সে সত্য প্রকাশ করবে, এবং মিথ্যা গোপন না করেই বলবে—বলবে কেন তুমি, কি কারণে এ-সব করেছ?” জজ প্রশ্ন করেন অপরাধীকে।

“নিশ্চয়ই বলব!” অপরাধী উত্তর দেয়। “কিন্তু আমার পক্ষে দু’ চার কথায় তা বলা সম্ভব নয়। এ ব্যাপারে প্রথমেই আমি বলতে চাই যে, চিরকালই আমি উৎকট সত্যাহরণী—সত্যকে যনেপ্রাণে আমি পালন করি, এক সত্যকে অঙ্গসর্গণ করাই আমার জীবনের ধর্ম—মিথ্যাকে আমি ঘৃণা করি।

“পোষ্ট অফিসের বহু চিঠিই নিত্য আমার হাত দিয়ে যায় আসে। একদিন এখানকার স্থানীয় লোকদের বিজ্ঞাবুদ্ধির দোড় কতখানি তা দেখবার জন্তে আমার উৎস্রুত্যা জাগে, এবং পরপর কতকগুলি চিঠি আমি খুলে পড়ি।

“চিঠি খুলে পড়া এবং পড়ে বন্ধ করে দেওয়া এমন কিছু একটা শক্ত ব্যাপার নয়। একটু বুদ্ধি খাটালেই তা করা সম্ভব। কিন্তু চিঠিগুলি পড়ে হতাশাই জন্মে ওঠে আমার মনে—এখনকার মানুষগুলি সম্বন্ধে নিয়ন্ত্রণের ধারণা জন্মায়। দেখি, চিঠিগুলি শুধুই নানা ধরণের নোংরামি, হিংসে আর আজে বাজে মিথ্যা কথায় ভরা। আপনাদের এই শহরের ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলাদের এই ব্যাপারে লজ্জিতই হওয়া উচিত।” শেষের দিকে কথাগুলির উপর বেশ জোর দিয়েই বিচারালয়ের উপস্থিত জনসাধারণকে বলে অপরাধী।

কথাটা এ-ধরণের একজন অপরাধীর মুখ থেকে শুনে রাগে সকলেই হৈ হৈ করে ওঠে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি তাতে জ্বলমল না করেই, তৎক্ষণাৎ আবার বলতে আরম্ভ করে :

“—সুতরাং, এ অবস্থায় আমি আমার উদ্ধাবিত উপায় কাজে লাগাবার জন্তে—মানে, কতকগুলি লোককে শিক্ষা দেবার জন্তে, অপরের হত্যাকর হবহ নকল করতে উঠে পড়ে লাগি। ব্যাপারটা আমার কাছে কিছুই শক্ত বলে মনে হয়নি, এবং মাত্র মাস তিনেকের চেষ্টাতেই কৃতকার্য হয়ে, প্রথম প্রচেষ্টায় হাত দিই।

“মোরাতার অস্ট্রাভ্ নামীয় একটি যুবতীর চিঠি একদিন আমি খুলি; এই শহরেরই এক যুবকের লেখা। এমন বাজে, নিরস, নিরানন্দময় বিশ্রী চিঠি, বিশেষতঃ যুবতীকে লেখা, জীবনে আমি পড়িনি—তার ওপর তা’তে আবার জঘন্য ধরণের তিন তিনটে বানান ভুল। অথচ সেই যুবতীর চিঠির ভাব ও ভাষা দেখে বুঝি যে, চরমপ্রদ

চরিত্র তার,—তার ভক্তে আমার অভ্যস্ত দুঃখ হয় এবং ঐ বোকা ছেলেটার হাত থেকে রক্ষা করার ভক্তে, ছেলেটির চিঠি নষ্ট করি—তার জাগ্রগায় সুন্দর করে, সেই মেয়ের ত্রিপুঙ্ক্ত চিঠি, যা তার কাম্য, সেইমত একখানি প্রেমপত্র লিখি—ছেলেটির হাতের লেখা নকল করে।—এসো প্রিয়, চলে এসো, আর দেরি করো না—চলে এসো আমার কাছে, অসহ যন্ত্রণা পাচ্ছি আমি’—আরো লিখি, ‘—আর এক মুহূর্ত আমি সহ্য করতে পাচ্ছি না—তুমিই আমার সব, আমি তোমায় বিয়ে করব।’ চিঠিতে কাজ হয়। মেয়েটি চলে আসে এবং বিবাহ করে; তবে সেই বোকা ছেলেটিকে নয়—তারই আর এক বন্ধুকে। এখানে এসে যার সঙ্গে তার আলাপ হয়, এবং যে তাকে ঢের বেশী আকর্ষণ করে ঐ হতভাগা যুবকটির চেয়ে।—এতো আমার দোষ নয়—যার সঙ্গে যার ভবিষ্যৎ! ছেলেটি যে বাজে সে সম্বন্ধে সত্য প্রকাশ হয়—ছেলেটিকে চেনবার সুযোগ হয় মেয়েটির—এতে আমার কি থাকতে পারে বিচার করুন ধর্ম্ম-বতার!” বলেই সে করুণদৃষ্টিতে চায় বিচারকের দিকে।*

“এই প্রেমপত্র ছাড়াও আরও অনেক বিশ্লেী জিনিস তুমি লিখেছ ও করেছ?” বিচারপতি একখানা চিঠি হাতে নিয়ে দণ্ডায়মান অপরাধীকে প্রশ্ন করেন।

“হ্যাঁ, এ ছাড়া অল্প জিনিসও আমি লিখেছি, কিন্তু সেখানেও কর্তব্যজ্ঞান ও সত্যবুদ্ধি আমাকে অমুপ্রেরণা জুগিয়েছে, এবং ঐ যুবতীর চিঠি ও স্প্রিন্টা নোভাকের চিঠির মধ্যে—যে চিঠির কথা আপনি বলছেন, তার মধ্যে তফাৎ আছে যথেষ্ট। নোভাকের জনৈক বন্ধু মিঃ কার্ট্ প্রাণে গিছল করেক সপ্তাহের জন্যে হাওয়া বদলাতে। নোভাক প্রায়ই তাকে চিঠি লিখত। একবার এক চিঠিতে সে লিখলে: ‘প্রিয় কার্ট, তুমি আবার কবে

উৎকট সত্যাস্থরাগী

কিরে আসছ? তোমাকে ছেড়ে; ভয়ানক কষ্ট পাচ্ছি আমি—এতো বিপ্রী লাগছে আমার—প্রভৃতি নরদের অনেককিছু প্রায় হু'পাতা ধরে। কিন্তু আমি জানতুম, এবং সত্যিই জানতুম, কার্ট সঙ্ঘকে নোভাকের ধারণা মোটেই ভালো ছিল না। এমন কি, তার সঙ্ঘকে এখানে-ওখানে নিন্দাবাদই করে বেড়াত সে। মিথ্যাকে প্রশ্রয় দেওয়া ডাকবিভাগের উদ্দেশ্য নয়, আর আমার ত নয়ই! তাই মিথ্যাকে মিথ্যা ও সত্যকে সত্য বলে প্রকাশ করার সমিচ্ছা নিয়েই একদিন মিঃ নোভাকের চিঠির সঙ্গে একটি টুকরোতে লিখে দিই, অবশ্য হুবহু তার হাতের লেখাতেই, (এবং পূর্বেই বলেছি এতে আমি বেশ পোক্ত হয়ে গিছলুম) লিখে দিই: ‘আমার পূর্বাপর চিঠিতে ও বর্তমান সমস্ত চিঠিটায় যা লিখেছি তা সমস্তই বিপরীতার্থক, শ্রেষ্ট করাই ওগুলো লিখেছি তোমায়। সত্যি করে বলতে কি, আসলে তুমি একটি অপদার্থ মাতাল, বদমাইশ ও ঝঞ্ঝোর; তোমার সঙ্ঘকে আমি এতটুকুও ভাবিনা, তোমার বাঁচা-মরায় আমার কিছুই এসে যায় না।’—এ ধরনের লেখাতে সত্যিই কাজ হয়।” অপরাধী হাসতে হাসতে বলে, “এক সপ্তাহ পরেই মিঃ কার্ট প্রাগ থেকে কিরে আসে, এবং একদিন পশ্চিমঘো মিঃ নোভাককে দেখেই, তাকে কিছু বলতে দেওয়ার পূর্বেই, কার্ট বেশ বিরশি সিকে ওজনের একটি ঘুঘি ঝাড়েন নোভাকের খুতনিতে। সেই ঘুঘির প্রকোপে চোয়ালটা বেকে যায় তার।” বলেই আবার হো হো করে হেসে অপরাধী বলে, “এই হল মিথ্যার সত্যোষধি!”

“কোটে ভদ্রভাবে কথা বল!” বিচারক অগ্নিশর্মা হয়ে টেচিয়ে উঠেন। “জাননা, ডাকঘরের সাহায্যে পাঠানো জিনিসপত্র চুরি করার অপরাধেও তুমি অপরাধী!” বলেন তিনি।

“আপনি বা বলতে চাইছেন তা আমি জানি।” অভিযুক্ত ব্যক্তি

উত্তর দেয়। “কিন্তু ব্যাপারটা মোটেই চুরির পর্যায়ে পড়ে না।” আবার সে বলতে আরম্ভ করে, “ঐ ঘটেছিল তা হচ্ছে এই : একদিন ফ্রান্সের প্যারিস শহর থেকে একখানি চিঠি এসে আমার হাতে পড়ে। চিঠির ওপরে প্রেরকের ঠিকানা ছিল, ‘মসিঁয়ে লে কোমে মন্টি ক্রিষ্টো সেকেন্ট, পোষ্ট রিসটেণ্ট।’ ঠিকানাটা আমার কাছে অত্যন্ত সন্দেহজনক মনে হয়, আমি চিঠিটা খুলে ফেলি। এবং খুলে দেখেই একেবারে তাক্জব হয়ে যাই—তার ভেতর থেকে বেরোয় ভিনখানা অল্লীল ধরণের পোষ্টকার্ড। আপনারা ঠিক যে ধরণের অল্লীল মনে কচ্ছেন, ছবিগুলো একেবারে ততটা কুৎসিত না হলেও, নেহাৎ কম নয়! সঙ্গে সঙ্গে সৈগুলিকে আমি ভস্মীভূত করে ফেলি, আমার ঘৃণা-প্রকাশের জন্তে তার মধ্যে পুরে দিই খানিকটা টয়লেট পেপার। এখন কি ধরণের লোক এই চিঠির মালিক হতে পারে আপনারা একবার ভাবুন।—আপনারা হয়ত অত্যন্ত একজন বাজে লোকের কথাই ভাববেন, কিন্তু পরের দিন যিনি সশরীরে এলেন, তিনি স্বয়ং হচ্ছেন, ছ’ছেলের বাপ, আমাদের সকলেরই সম্মানার্থ ব্যক্তি এই শহরেরই মেয়র মিঃ কেরল ডসটালেক।”

কথাটা শুনে উপস্থিত অনেকেই আর হাসি সম্বরণ করতে পারলে না, কেউ কেউ বা মুখে রুমাল দিয়ে হাসি চাপলে। ঠিক সেই সময় একটি ট্রাক মাথার মোটাসোটা লোক রঙিন রুমালে ধবধবে এক-জোড়া গৌর পুঁছতে পুঁছতে বেরিয়ে গেল বর থেকে। ইনিই হচ্ছেন মিঃ ডসটালেক। অপরাধীর বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবার জন্তে জনসাধারণের মধ্যে তিনিও উপস্থিত ছিলেন কোর্টঘরে।

একথা শুনে বিচারক অত্যন্ত উত্তেজিত হয়ে ওঠেন। অপরাধী ম্যাট্রিককে লক্ষ্য করে ঝুলেন, “আমি পোষ্ট অফিসের এসব ব্যাপার খোলাখোলি প্রকাশ করতে নিষেধ করছি তোমায়,—যদি কর তাহলে

আরো কঠিন শাস্তি পেতে হবে তোমার—আমি কিছুতেই আর কোন কথা বরদাস্ত করব না।”

এই সময় সরকার পক্ষের উকিল বিচারকের কানের কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে কি বলে; বিচারক তার কথায় উত্তর দিয়ে যান, কিন্তু ঠিক সেই সময় অপরাধী এবার একটু গলা ছেড়েই বলে ওঠে :

“ধর্ম্মবিতার ! ও আপনার বক্তৃত্ত্বের সম্পূর্ণ অমুণ্ডবৃক্ষ । ওর কথা কানে নেওয়া মানেই আপনার মর্যাদা ক্ষুণ্ণ করা ।”

“খবরদার, একটাও কথা বলবে না আর ! অপরের ব্যাপারে তোমার মাথা ঘামাবার কোনই প্রয়োজন নেই।” বিচারক চোঁচিয়ে ওঠেন ।

সঙ্গে সঙ্গে সরকার পক্ষের উকিলও বক্তার দিয়ে বলে ওঠে, “পাজি, নচ্ছার কোথাকার,—হত্ভাকভার মুখের ওপর তুমি আবার কথা বলতে এসেছ—বিচারকের মুখে মুখে তর্ক করছ বার বার ! অপরাধ করেও তোমার লজ্জা নেই ! সাধারণতঃ যে শাস্তি তোমার হওয়া উচিত, তার দ্বিগুণ হলে তবে রাগ মেটে !”

“বেশ ভালো কথা।” বিচারকের দিকে করুণভাবে চেয়েই বলে সে, “—তবে আর একটা কথা যদি শোনেন, এইটাই আমার শেষ কথা—পরে হয়ত আপনার কাজে লাগতে পারে।—আর কই করুন, এই উকিলটিকে এতোটা প্রলয় দেওয়া আপনার উচিত নয়—উনি মোটেই উপযুক্ত নন আপনার বিশ্বাসের।”

“আবার তুমি ঐ কথা তুলছ !” এবার যেন একটু সহজ ভাবেই বলেন বিচারক । পূর্বের সেই রাগের রেশ এবার যেন ততটা নেই তাঁর । কিছু যেন জানতে চান তিনি—অবশ্য যদি কিছু সত্য থাকে এর মধ্যে ।

কিন্তু উকিলের মুখ এবার যেন কালো, এতটুকু হয়ে যায় । রাগে

গরগর করেন তিনি। কথাটাকে ধামাচাপা দিয়ে তাড়াতাড়ি বলেন, “নেবে যাও কাটগড়া থেকে—আর কিছু জানতে চাই না আমরা তোমার কাছ থেকে!”

“না না, বলুক; কিছু বলবার থাকে বলুক—তবে পোষ্ট অফিসের গোপনীয় কিছু বলোনা আর।” একটু সহাত্বকৃতি যেন চিড়িক দেয় বিচারকের কথায়।

উপস্থিত সকলের মধ্যেই একটা চাকল্যের ভাব প্রকাশ পায়। ছেলে-ছোকরাদের মধ্যে দু’একজন বলে, “অপরাধ কল্লের লোকটা কিন্তু খাটি সত্যবাদী, স্পষ্ট বক্তা—বলছে ভালোই।”

অপরাধী বিচারকের দিকে হাত নেড়ে আবার বলতে থাকে, “কিছুই জানেন না আপনি, সস্ত্রীতি একখানা চিঠিতে এই উকিল ভদ্রলোক আপনার সম্বন্ধে কি ধরণের সব অভদ্রোচিত কথা বলেছে।”

“কখনই না,—অভদ্রোচিত কথা?—হতেই পারে না।” এজ যেন আকাশ থেকে পড়েন, মুখ তার লাল হয়ে ওঠে।

ম্যাট্রশেখ পকেট থেকে একখানা কাগজ বার করে পড়তে আরম্ভ করে। পড়ার বিশেষ ভঙ্গিমায়া স্থান বিশেষের জবন্য বক্তব্য, তেলে-বেগুনে জলে ওঠেন তিনি। “—জীবনে আমাদের এই বিচার-পতিটির মতো মিথ্যাবাদী, পক্ষবিশেষের প্রতি অমুরাগী, সাধারণ বিচার বুদ্ধিহীন লোক আমি খুব কমই দেখেছি! নিরুপায় হয়েই এখানে গর পায়ে তেল দিতে হচ্ছে আমাদের—এইখানটা শুনেই, অপরাধীর হাত থেকে, থপ করে চিঠিটা ছিনিয়ে একবার দেখে নেন তিনি, তারপর তাঁর আসন ছেঁড়েই লাফিয়ে ওঠেন। এবং কোর্টের কাজ বন্ধ করেই তক্ষুনি দ্রুত বেরিয়ে যান ঘর থেকে—যাবার সময় শুধু বলে যান, “কেস ডিসমিস।”

গরকার পক্ষের অভিযোগকারী উকিলও তাঁর পিছু পিছু বলতে

উৎকট সত্যানুরাগী

বলতে ছোট্টে, “—এ সব মিথ্যে, একেবারে মিথ্যে...আপনি শুনুন ...আপনাকে ব্যাপারটা সব খুলে বলি”—কিন্তু বিচারক তাঁর কথায় কর্ণপাত না করেই একেবারে সোজা গিয়ে উঠেন তাঁর গাড়িতে।

ম্যাট্রিশেক বসে পড়ে। তার পেছনেই দাঁড়ান পুলিশ অফিসারের দিকে মুখ ফিরিয়ে বলে, “সত্যিই বুঝতে পারিনা. কেন মানুষগুলো এতো মিথ্যার আশ্রয় নেয়, কি সুখ পায় এতো মিথ্যেকথা বলে! তার চেয়ে সকলে যদি সত্যিকথা বলে, সত্যিই যদি সুবার লক্ষ্য হয়, তাহলে এই পৃথিবী কি সুখেরই না হয় মানুষের কাছে!”

পুলিশ অফিসারটি ষাড় নাড়ে—অপরোধের সত্যনিষ্ঠায় অভিভূত হয়েই ঘেন। সর্বাস্বত্বকরণে সমর্থনই করে যেন সেই কথাগুলিকে। তারপর কোর্ট থেকে সবাই বেরিয়ে যায় তারা একে একে।



দুঃস্থ ছেলে ম্যাগটা ছিঁড়ে কুচি-কুচি করে ফেলেছে।

বাপ তাই না দেখে, ছেলেকে হুকুম করলেন, যতক্ষণ না ঐ ছেঁড়া কাগজ জোড়া দিয়ে ম্যাগটা ঠিক করতে পারছো, ততক্ষণ খাওয়া বন্ধ।
ম্যাগটা ছিল বিশ্বের মানচিত্র।

ছেলেটি এক মিনিটের মধ্যে ছেঁড়া কাগজগুলো জুড়ে ম্যাগটা ঠিক করে দিল।

বাপ অবাক হয়ে গেলেন।

—এত তাড়াতাড়ি কি করে পারলি?

—কেন, ম্যাগের পেছনে ছিল একটা মানুষের চোখার। মানুষের চোখারটা জোড়া লাগান্নই তোমার বিশ্ব মানচিত্রও জোড়া লেগে গেল আপনি থেকে।

রূপান্তর

অন্নপূর্ণা গোস্বামী

প্রশান্ত ডাক্তারকে আবার কাউনিয়া আসতে হয়েছে। প্রশান্ত বেঙ্গল এণ্ড আসাম রেলওয়েতে চাকরি করে, আপাতত ও অস্থায়ী পদে নিযুক্ত রয়েছে— স্থায়ী চিকিৎসকগণ ছুটি গ্রহণ করলে ওকে সেই স্থান পূরণ করতে হয়।

কাউনিয়া ডাক্তারখানার স্থায়ী ডাক্তার রমেশ গান্ধুলীকে যেন ছুটি-গ্রহণে পেয়েছে! বাপের মৃত্যু, সম্মান-প্রসবের পর স্ত্রীর অসুস্থ নিয়ে টানাটানি, ছেলের স্বাস্থ্য পরিবর্তন। ছুটি না নিয়ে উপায় ছিলনা, তারমধ্যে আবার বৃদ্ধের ট্রেনিংয়ে ডাক পড়েছিল— মাস কয়েক পার হতে না হতেই, ডাক্তার গান্ধুলি নিজেই ডায়বেটিস রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়লেন, তাই অনিদিষ্ট সময়ের জন্যে তাঁকে এবার ছুটি নিতে হয়েছিল।

এক—দুই—তিন—চার—পাঁচ, করাঙ্গুলিতে গুণে প্রশান্ত মেথলো বছর দু-একের মধ্যে এই ডাক্তারখানায় ওকে বার পাচেক আসতে হয়েছে। যেন এট অঞ্চলটা ওকে নিরন্তর আকর্ষণ করেছে। রংপুরের মধ্যে ছোট-ছোট-গ্রামগুলির সঙ্গে মৈত্রেরী বন্ধনের সৃষ্টি হয়েছে, যেন হৃদয়ের নিরবচ্ছিন্ন যোগাযোগ।

হৃদয়ের যোগাযোগ বৈকি! রমেশ এখানকার স্থায়ী ডাক্তার। ইউনিয়ন বোর্ডের ডাক্তারের খ্যাতি কীর্তন করতে ভাড়াটে প্রচারক রয়েছে, তা ছাড়া অগুণতি চুনোপুঁটি। তবু প্রশান্ত ডাক্তার বলতে আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা উন্মুখ হয়ে ওঠে, ওদের উৎসুক আগ্রহ ওর প্রশংসায় মুখর।

রূপান্তর

প্রশংসা পাবার মতই যে ও তরুণ-চিকিৎসক, মজুরী গুণেও নেয়না, পারিশ্রমিক নিরে দর কষাকষিও করে না। রোগী দেখে রোগনির্ণয় করে, নিজেই সমস্ত শিক্কা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে রোগীর রোগমুক্ত করতে চেষ্টা করে। ওর সে-পরিশ্রমের সঙ্গে পারিশ্রমিকের সমতা রক্ষা হয় না। তবুও ক্লান্ত নয়। বলে, জনসেবা যে ডাক্তারের ব্রত, ডাক্তারের উদারতাই যে মুমূর্ষু আত্মকে বাঁচিয়ে রাখবে—স্বস্থ সবল মানুষের পরিচয় দেবে। তবুও সে সমস্ত কাজের অন্তে ঘামে-ভেজা কোঁটের পকেট থেকে, শ্রান্ত হাতে টাকা পয়সাগুলো ঠিক মুড়ি মুড়কির মত বের করে—মুঠো মুঠো বের করে। প্রশান্তর চোখ-মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে—উপার্জনের সার্থকতায় নয়, সেবার আনন্দে। কাগজের টাকাগুলোও গোপে, উইয়ে-খাওয়া, ইঁদুরে-কাটা কয়েকটা টাকা বের হয়—কিছু অচল সিকি ও দুয়ানী, তবুও হুঃখিত নয়। বলে, এই তো ডাক্তারের সম্মান, ডাক্তারকে ওরা বিশ্বাস করে, ভালবাসে—তাই ফাঁকী দিলেও বঞ্চিত করতে পারেনা। অব্যবহার্য টাকা-পয়সাগুলো এই কথাই প্রমাণ করছে, অতাব অনটনই স্বভাবের পদাঙ্কলন ঘটায়।

প্রশান্ত ডাক্তার গ্রামে আসছে শুনলে অস্ফাল্ট ডাক্তাররা রীতিমত আতঙ্কগ্রস্ত হয়।

ওর বিরুদ্ধে ওদের এই অভিযোগ : ও বাজারদর নামায়, ডাক্তারের কী কবিয়ে দেয়—উদারতা, মানবতা এসব দরিদ্র ভারতবাসীর অস্ত্রে নয়।

প্রশান্তর কানেও এই উক্তিগুলি আসে। ও তার স্বভাব সুলভ দৃঢ়-ভঙ্গির সঙ্গে উত্তর দেয়—“এ কথা ভুল, ভাগ ভারতবর্ষের স্বকীয় ধর্ম, মানুষ মাত্রকেই মানবতা ও উদারতাকে আগত্যাধীন করতে হয়।

গল্প-ভারতী

পরাদীন দেশ শুধু নিজের কথা ভাবতে শেখায়, বৃহত্তরকে বিম্বত করায়—সে সঙ্গীর্ণ গণ্ডিকে অতিক্রম করতে পারাই শুভ বুদ্ধির পরিচয়।”

• একজন প্রতিবাদ করেছিল—“আগে আশ্ব—পরে ধর্ম”—

প্রশান্ত বলেছিল—“শতকরা নব্বইজন কৃষক-সম্প্রদায়ের কাছে ডাক্তারের বেশী দাবী করা মানে, চিকিৎসাসাশ্ত্রে ওদের ভীতি সঞ্চার করা, ওদের পরোক্ষভাবে বলা—“মৃত্যুই তোদের অনিবার্য পাওনা, মরণকে আলিঙ্গন করাই তোদের জন্মের যোগ্য পুরস্কার—”

এলা বারোটায় প্রশান্ত ট্রেন থেকে নামতে, ওর প্রাক্তন রোগী-পত্নী ঠিক মোমাছির মত করে ওকে ছেকে ধরলো। একটু হেসে প্রশান্ত বললো—“তোরা কী ভাবলি, আমি তোদের জন্তে এলুম— আমি সরকারী চাকরি করি ভুলে যাসনে যেন—”

তাই কী ভুলতে পারি বাবু—সেই দৌলতেই যে তোমাকে পাওয়া। তুমি আসছ শুনে ছুটে এলুম তোমাকে প্রণাম করতে—ওরা জন দশ-বারো একে একে হেঁট হয়ে ওর পদধূলি গ্রহণ করলো এবং প্রত্যেকে নিজ-নিজ রোগীর বর্ণনা করতে লাগলো।

কিছুদূরেই রেলওয়ে ডাক্তারখানা, তারই অভিমুখে যেতে যেতে প্রশান্ত বললো—“তোরা যে দেখছি রোগের সঙ্গে একেবারে বন্ধুত্ব জমিয়ে ফেলেছিস? বিকেলবেলা সাইকেল নিয়ে বেগ হব, একে একে তোদের সকলের বাড়ী কাব।

একটি প্রোড় বয়সের লোক কিন্তু ওর মুখ ছাড়লোনা—গায়ের পাঁজর গোণা যায় এমনি শীর্ণ চেহারা ওর। সর্বাঙ্গ উলঙ্গ, মাত্র একটুকরো লেংটিতে ও লজ্জা নিবারণ করেছে, মূতুরো ফুলের মত সাদা এক আর্ধা রুক্ষ চুল চোখে মুখে ঝুলে আছে।

লোকটি বললো—“তুমি সরকারী কাজ কর বাবু—আমি বসে রইলুম, তুমি আসবে শুনে তিন দিন থেকে ছুটোছুটি করছি। বউটা তো মরবে জানি, তবু শেষ দেখা তোমাকে একবার—
“ওর কণ্ঠস্বর অবরুদ্ধ হয়ে এসেছিল, একটা ঢোক গিলে ও বললো—
“পঞ্চাশের ধাক্কায় বাবু ছেলে মেয়ে গুলোকে ঘরের মুখে তুলে দিয়েছি—
জানোই তো ওদের মুখে ভাত দিতে পারিনি। দুধ, তামাক...
থেমে গেল, উচ্ছ্বসিত অঙ্গকে আয়তাবলী করতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেললো।

প্রশান্ত বিম্বিত না হয়ে পারলোনা। মাসকয়েক আগে ও এই অঞ্চলে এসেছিল, রজনী বর্মনের স্ত্রীকে চিকিৎসা করেছিল, এখনও সে আরোগ্য লাভ করেনি। আশ্চর্যের কর্ত্তে ও জিজ্ঞেস করলে—
“কী রজনী, এখনও তোমার বউ ভালো হয়নি? আমি যে-ওষুধটা লিখে দিয়েছিলুম—”

রজনী বললো—“বাজারে লে-ওষুধ কী পাওয়া যায় বাবু? ঘরের আর একটা টিন সস্থল ছিল, বেচে যদি বা কালো-বাজারে ওষুধ জোগার করলুম, প্রতিবার ফুঁড়তে জন্তার দুই টাকা মিস্ চায়—কোথায় পাব বাবু?

এর কোনও উত্তর নেই। আশ্রয় আকর্ষণই এ যুগের ধর্ম তাই একদিকে সরকারের লুপ্ত প্রত্যাশা, অপরদিকে নিঃসীম শূন্যতা! সরকারী কাজকর্ম সেরে প্রশান্ত একখানা বড় মাঠ পার হয়ে দুই পাশে খাল-বিল-ডোবা রেখে, ফসলের জমির আল ধরে, রজনীর গ্রাম অভিমুখে যেতে লাগলো। পূর্বপ্রান্তে তিস্তা নদীর ধারে ধু ধু করছে একখানা মাঠ। তাই দেখিয়ে রজনী বললো, ওই পাঙ্কজ-ভাঙ্গা গ্রামের অবস্থা দেখ বাবু, গ্রাম নিশ্চিহ্ন—কিছুই আর অস্তিত্ব নেই। একদিনে এক বাড়ীতে বসন্তে দুই তিনটে ছেলে শূকো-মারা পড়লো, তার

পর সে কী মালেরিয়া! কোথাও এক ফোটা কুইনাইন নেই, দেখতে-দেখতে গ্রামটা একেবারে উজার হয়ে গেল!

উজার নয়, বলো রূপান্তর ঘটেছে। পঞ্চাশের মদন্তর, সর্বত্রই এখনো রূপান্তর—একটু ভ্রিয়মান হেসে প্রশান্ত বল্লো, এই দেখ এই যে পথ দিয়ে হাঁটছি—চিনি-চিনি বোধ করছি, চিনতে পারছি না। এখানে উমাপদ, কেঠের বাড়ী ছিল না?

“ছিল বইকি বাবু, জালের হতো পেল না, নোকো পেল না, মাছের ব্যবসা ছেড়ে দিয়ে সামান্যদরে জমি-জমা বেচে দিয়ে ওরা গ্রাম ছেড়ে চলে গেল। গলার স্বর নামিয়ে রজনী বল্লো—ওই তো বলির সেখ, জলের দয়ে সব জমি মেরে নিলে। বিখের পর বিধে এই যে তামাক দেখছ—সব ওর, গত বছর টাকায় টাকা লাভ করেছে, এই তামাকের ব্যবসায় মিঞা সাহেব একেবারে লাল হয়ে গেল—এ বছর আবার মিলিটারী বায়না পেয়েছে।

মাইল দুই তিন পথ অতিক্রম করে রজনীদের ভাদ্রামালী গ্রামে পৌছে ও বিস্মিত হয়নি, এ গ্রামের সঙ্গে যে ও পূর্ব-পরিচিত। এর অধিবাসীদের দুঃখ সুখের সঙ্গে সে নিবিড়ভাবে জড়িত—কত রোগীকে ভালো করেছে, কত জনকে মৃত্যুর হাতে তুলে দিয়েছে, পঞ্চাশের মদন্তরের প্রতিক্রিয়া এ-গ্রামে কত পরিবর্তন এনেছে, কত রূপান্তর ঘটিয়েছে। স্বচক্ষে সে দেখেছে—ওরই চোখের স্রুখে অখাদ্য-কুখাদ্য খেয়ে, অনাহারে লোকে মৃত্যুকে বরণ করেছে, ভাতের দুঃখে পৈতৃক-ভূমি ফেলে চলে গিয়েছে।

তবু আজ সে রজনীর গৃহে ঢুকে আশ্চর্য না হয়ে পারলোনা। অনেক সংগ্রাম ও সংঘর্ষ সত্ত্বেও মাথা গোঁজবার তিনটা যে এতদিন ধরে বাচিয়ে রেখেছিল, আজ তারও কোন অস্তিত্ব নেই! কালো-বাজারে ওষুধ কিনতে রজনী একেবারে নিঃশ্ব হয়েছিল।

কয়েকটি কলাগাছে-ঘেরা উঠোনের এক প্রান্তে খড়ের একখানা ঘর মুখ খুঁবের রয়েছে, সম্মুখে ছোট্ট একটু মেটে-দাওয়া, একটা গরু শ্রান্তভঙ্গিতে বসে রয়েছে।

রজনীর স্ত্রীর অস্ত্রে ক্ষয়রোগ হয়েছে, তার সঙ্গে আরও নানী উপসর্গ জুটেছে। প্রশান্ত ঘরে ঢুকে রোগিনীকে দেখে চমকে উঠলো, এই কয় মাসে একেবারে সে বন্সে গিয়েছে! ককির মত কয়েক-খানা হাড় সার মাত্র, মেঝেতে একটা ছেঁড়া মাদুরে শুয়ে, জীবিত কী মৃত বোঝার উপায় নেই। সেহের আত্ম বলতে কিছু নেই, একেবারে উলঙ্গ অবস্থা!

প্রশান্ত একটু ইতস্ততঃ করতে, রজনী সঙ্কুচিত ভাবে টুকরো কনাপাতার সংযোগে প্রস্তুত একটি আবরণে স্ত্রীর লজ্জা নিবারণ করে বললো, বাবু—এ দেশের ঝড় আর থামবেনা! বাজারে একখানাও কাপড় নেই, কালো-বাজারের জিনিষ আমাদের ছোবার সাধ্য কী? প্রশান্ত তখন উবু হয়ে রোগিনীর সামিথ্যে উপবেশন করেছে, কানে স্টেথস্কোপ লাগিয়েছে।

রজনীর স্ত্রী এবার একটু নড়ে উঠলো, কুণ্ঠিত ভাবে কনাপাতাখানা গায়ের উপর একবার টেনে নিল, তারপর ডাক্তারের মুখের দিকে কিছুকণ ফাল ফেলিয়ে চেয়ে থেকে বললো—“ডাক্তার বাবু, তুমি এসেছ? হয়তো বাঁচবো আমি কিন্তু উঠে দাঁড়িয়ে লজ্জা নিবারণ করার যে উপায় নেই—”

দুঃখময় পরিবেশ, সাদৃশ্য দেবার ভাষা প্রশান্তর জানা নেই। অসহ্য। ছোট্ট ঘর, একটাও জানালা নেই। ঘরে একটা ভ্রূক্ষ জমাট বেঁধে রয়েছে : “ভ্যাপসা আবহাওয়া—রোগিনীর কক্ষের, মল মূত্রের গন্ধে বাইরের গোবরের গন্ধ এসে মিশেছে।

ডাক্তার বেরিয়ে এল। রজনী আগ্রহ-ব্যাকুলকণ্ঠে জিজ্ঞেস করলো,
“বাবু কী রকম দেখলেন? ভালো হ'বে তো?”

উঠানে একটা মাচায় বান্ধা বেধে শিশিজে ওষুধ ভরতে ভরতে
প্রশান্ত বললো, “আমার সাধ্যমত চেষ্টা করবো, তবে রোগির যদি
সে-ওষুধ গ্রহণের ক্ষমতা থাকে—”

এতদিনেও প্রশান্ত ওর প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারলেনা।
তিন চারখানা গ্রামে যেয়ে দশ বারোজন রোগী দেখতে বেলা
বারোটা বাজলো। কোরাটারে ফিরে ও সবিতার একখানা চিঠি
পেলো। সবিতা ওদের গ্রামের শলাক কবিরাজের মেয়ে। শলাক
কবিরাজ প্রশান্তকেই জামাই করতে চেয়েছিলেন কিন্তু ডাক্তার-পাত্রেয়
পণের দাবী মেটানো তাঁর সাধো ছিল না। তাই এখনও সবিতা
প্রশান্তকে রামচন্দ্র বলে সম্বোধন করে।

রেলের গেটম্যান শুভেন্দ্র সঙ্গে সবিতার বিয়ে হয়েছে। মাইল
দুই তিন দূরে অন্নদানগর ও পীরগাছাব মধ্যে ওদের গেট, সবিতার
মেয়ের অস্থল—তাই যেতে লিখেছে।

সবিতা লিখেছে— “শান্তদা, থবর পেলাম তুমি আসছ, সুবিধে
মত আমার মেয়েটাকে একবার দেখে বেগু এসে। তুমি যে ওষুধটা
লিখে দিয়েছিলে—এক ফাইল পেয়েছিলুম, তারপর চোরা-বাজারে
কেনা আর সম্ভব হয়নি। তুমি জানোই তো বগু স্বাক্ষর করে মাইনে
হয়েছে দুই ডবল—জিনিষপত্রের দাম চার পাঁচ গুন—”

“বাবু, ও বাবু আমার ওষুধটা আগে—বাবু আমারটা আগে।’
চিঠি পড়বার কি যো আছে? • ইতিমধ্যে প্রায় দশ-পনেরো জন
কৃষক ও মজুর শ্রমীর লোক শিশি হার্টে উপস্থিত হয়েছে, প্রত্যেকেরই
স্বপ্ন ওষুধের তাগিদ, যেন এক চোক ওষুধ খেলেই ওরা রোগমুক্ত হয়ে

রূপান্তর

যাবে। বাধা হয়ে অর্ধ-পঠিত চিঠিখানা প্রশান্ত ভাঁজ করতে করতে
 আন্ত-দৃষ্টি মেলে ওদের দিকে চেয়ে রইল। ওদের রুক্ষ গলাটের
 শীর্ণ শিরায়, নিশ্চিন্ত হৃষ্টির নৈরাশ্রের মধ্যেও আশার স্তিমিত
 • প্রদীপ শিখা অহুজল হয়ে রয়েছে। দৃষ্টি ফিরিয়ে এবার প্রশান্ত নিজের
 ঔষধপত্রের শিশি বোতলগুলির দিকে তাকাল। এই সব আশা-উষ্ম
 লোকের হাতে ও কী বা ওষুধ তুলে দেবে? রোগিকুল প্রায় মূর্খ—
 সাধারণ চিকিৎসার বহির্ভূত যে ওরা!

আবার তাগিদ—বাবু, হাল ছেড়ে অনেকগুণ এসেছি—

এই সময় একটি মধ্যবয়স্ক লোক এসে ঘরে ঢুকলো। লোকটি
 সহকারী স্টেশন মাস্টার। রং কালো, মোটা চেহারা—কথা বলার ওর
 একটা বিশিষ্ট ঢং : গলার স্বর বের করে না—শুধু একটা ফিস্ ফিস্
 শব্দ, যেন শাঁসবিহীন গোপনীয় কথা। গায়ে সবসময় একটা
 আধ-ময়লা গরদের উত্তরীয় জড়ান, হাত দুটি পর্যন্ত তারই তলে আবরিত।
 যেন কোনও মূল্যবান জিনিষ ওর মধ্যে আত্মগোপন করে রয়েছে।

হয়তো বা কিছু সম্বন্ধে রক্ষিত থাকে ওর মধ্যে, শুধু তাই নয়—
 সন্মোচন মনে ওর সমগ্র পৃথিবীটাকে...তারই অন্তরালে আয়ত্তাধীন করবার
 নিরন্তর বাসনা রয়েছে। তাই পৃথিবীর গাছের একটা পাতা খসলে,
 ফল ঝরলে এবং কেউ তা গ্রহণ করলে ও বুক বাখা অহুত্বব করে।
 যেন ওর ব্যক্তিগত সম্পত্তির ক্ষতি হয়েছে—নৈরাশ্রে এমনি শ্রিয়মাণও
 হয়ে যায়।

পরিচিত ফিস্ ফিস্ শব্দে ডাক্তার চোখ তুলে তাকালে। হেসে
 বললো—নমস্কার নন্দী মশাই, ভালো আছেন তো?

“আমাদের আর ভালো-স্থল ডাক্তারবাবু—” ফোলা গাল আরও
 ফুলিয়ে হেসে নন্দী বললো, আপনি লাকী ম্যান ডাক্তারবাবু! একদিনে
 এত রোগী—চক্ৰিশ ঘণ্টাও পার হয়নি এসেছেন—”

একটু স্নান হেসে প্রশান্ত বললো—“লাকী-মান নয় নন্দী বাবু, আমার অভ্যস্ত দুর্ভাগ্য যে এদের চিকিৎসা হাতে নিতে হয়েছে। সাধ্য নেই আমার ওদের রোগ মুক্ত করার, তবু চিকিৎসার জর হাতে নিয়োছি। আমি আশ্চর্য হয়ে যাচ্ছি দেখে, ছয় মাসের মধ্যে থাইসিস্ রোগ কী বিস্তার লাভ করেছে! অধিকাংশ রোগীর—বুক ঝাঁকরা হয়ে গিয়েছে! বিছানায় শুয়ে অনবরত কাশছে—খুঁখু সঙ্গে রক্ত উঠছে, তবু ওদের বাঁচার আশা যায়নি।

“এত লোকের থাইসিস্? চিকিৎসা করবার একটা লুক প্রত্যাশায় নন্দীর মুখ অদ্ভুত পৈশাচিক-উজ্জল হয়ে উঠলো।

“হ্যাঁ নন্দী বাবু, এত লোকের টি—বি, থাইসিস্—” প্রশান্ত বললে—“এই তো ওদের দুঃখিনী মায়ের কোলে জন্মানোর ধোঁগা—পাওনা! ভাতের ফাঁড়া যারা কাটিয়ে উঠলো, দুধ ঘি দূরে থাক—এক টুকরো মাছ ওরা পায় নি! লবনের অভাবে মুখের গ্রাস ফেলে দিতে হয়েছে—” বলতে বলতে ডাক্তার এবার উত্তেজিত হয়ে উঠলো, “বুঝে দেখুন আপনি নন্দীবাবু—জীবনী শক্তি ওদের আর নেই, ক্ষয় হয়ে গিয়েছে, কুরিয়ে গিয়েছে—রোগের সঙ্গে যুদ্ধ করবার শক্তি ওদের কুরিয়ে গিয়েছে।”

যাবার সময় নন্দী বাবু ফিস্ ফিস্ করে বলে গেল, “ডাক্তার বাবু রোগিগুলোকে হাত ছাড়া করবেন না, এই যুদ্ধ লাগতেই কিছু হোমিওপ্যাথিক কিমে ফেলেছি—যা কিছু রোজগার করা যায়, তারই সঙ্গে একটু সমাজ-সেবাও হয়।”

ডাক্তার না হেসে পারলোনা, সমাজ-সেবার সুন্দর বৃত্তি!

বিকেল বেলা গোটা দুই তিন বসন্ত রোংগী দেখে, প্রশান্ত সবিতার বাড়ী যেয়ে পৌঁছলো। ছই ষ্টেশনের মধ্যে—জনবিহীন প্রান্তরে গেটম্যানের ছোট্ট কোয়ার্টার—একখানা ছোট্ট ঘর, একটু বারান্দা, এক ফালী উঠানের মধ্যে ওদের সংসার। কয়েকবার সাইকেলের বেল বাজিয়ে, সাইকেলখানা একটা গাছের গায়ে হেলান দিয়ে রেখে প্রশান্ত ভিতরে ঢুকে পড়ে বল্লো, “কোথায় রে সবি? কী করিস?” সাইকেলের পরিচিত বেল—বহুদিনের পরিচিত এ শব্দ, সবিতা! শ্রুতে পেয়ে বুঝতে পেরেছিল প্রশান্ত এসেছে। সেমিজের উপর একটা গামছা জড়িয়ে সংসারের সে কাজকর্ম করছিল, তাড়াতাড়ি একটা পোষাকী শাট্টী পরে ঘরের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এল, একখানা জল চৌকী এগিয়ে দিয়ে চাসিমুখে বল্লো—“বসো, শ্রীরামচন্দ্র—”

প্রশান্ত ওর মুখের দিকে কিছুক্ষণ সোমাদৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে বল্লো, “তুই এখনো আমাকে রামচন্দ্র বলে সম্বোধন করবি? তোরা এখনও বুঝিনা, বাঙলা দেশের বাপেদের অবস্থা তাই ছেলেদের পিতৃ-ভক্ত বলে গাল দিবি।”

“খুব বুঝি দাদা—” পাট কাঠির সংযোগে উচুন ধরাতে ধরাতে সবিতা বল্লো—“তা নাহলে আমাদের দেশের নাম করা এটর্নি, বিশ হাজার টাকা নিয়ে ইঞ্জিনিয়ার ছেলের বিয়ে দিল জানো?”

“তোদের মেয়েদের এটা মহৎ দোষ, একজনকে নিয়ে বিশ্বকে তুলনা করবি। ভুলে যাস্নি, এদেশে গরীব বাপেরই সংখ্যা বেশী। আমার বিয়ের পণে আমার তিনটে বোন পার হয়েছে জানিস্—এখনও তিনটে বাকী—”

একটু থেমে প্রশান্ত বল্লো—“বুঝি সবিতা, এ দেশের যত :খ, যত দৈন্ত, যত সমস্তার কারণ নির্ণয় করলে দেখতে পাবি,

মুণে রয়েছে সেই দারিদ্র্য—সেই অভাব। নে, তোকে আর উঠুন বাতাস করতে হবেনা, অধমাকে বাতাস করু।”

উঠুন ধরেছিল, চায়ের জল বসিয়ে দিয়ে, সবিতা প্রশান্তর মিলিটারী ইউনিফর্মের মোটা কোটটা খুলিয়ে নিতে নিতে বল্লো—
“বড় গরম লাগছে না শান্তনা? খুব ভাল কোট কিন্তু তোমরা পেয়েছ, ভি-সি-ও কমিশন পেয়েছ—নয়? আরও সব কী পাবে?”

ওকে বাধা দিয়ে প্রশান্ত বল্লো—“পেয়েছ বলিসনি সাঁব, বল্ পেতে হয়েছে। যুদ্ধ সাহায্য করতে নয়, পঞ্চাশের মন্বন্তরের কবল থেকে সংসারকে বাঁচিয়ে রাখতে। বড়ো স্বাক্ষর করে সব কিছু পেতে হয়েছে। নে তোর মেয়ে কোথায় বল্? আমার অস্ত্রার ফিরতে রাত হয়ে যাবে—চাঁদ নেই।”

আন্তরিক যত্নের সঙ্গে ওকে বাতাস করতে করতে সবিতা বল্লো—
“শুয়ে থাকতে চায়না দাদা—বড় কীদে, উনি একটু বেড়াতে নিয়ে গেছেন।”

বলতে বলতে সবিতার স্বামী শুভেন্দু খুকিকে নিয়ে ফিরলো। প্রশান্তকে একটি প্রণাম করে বল্লো, “দাদা এসেছেন? মেয়েটাকে নিয়ে বড়ই মুরিলে পড়েছি। তিন বছরের হোল হাঁটুতে শিখলোনা, কত আর শুয়ে থাকে বলুন?”

ডাক্তার কী বা উত্তর দেবে? অমাহুযিক লোভ আর সঞ্চয়ের বর্বরতায়, বঞ্চনা-নীতি আর স্বার্থপরতার সংঘর্ষে সংসারের একমিক নিম্মেসিত হয়ে গেল। সবিতার মেয়ে ভূমিষ্ঠ হলো, মায়ের বুকের দুধ পেলনা! গরুর দুধ গরীবের কেনার সাধ্য রইলনা, দুধের শিশু দুধ না পেয়ে পেরে পঙ্গু হয়ে গেল। প্রশান্ত তার কী প্রতিবিধান করবে?

রূপান্তর

পল্লু বইকি। তিন বছরের মেয়ে—সরু লিক্লিকে হাত পা, পেটটা উচু। পিঠের শির-দাঁড়া সুগঠিত হাতে পারেনি—বসতে পারেনা, দাঁড়াতে পারেনা। কসাঁ খবধবে রং, টানাটানা চোখ। ারান্দায় একথানা ছেঁড় মাছুরে, ময়লা বালিস মাথাঘ দিয়ে শুয়ে শুন্ শুন্ করে গান করে। যখন পিঠে বাথা অল্পভব করে শুয়ে থাকতে থাকতে, শুভেন্দু ওকে কোলে করে গাইয়ে নিয়ে যায়। প্রশান্ত ওকে দুইবার পরীক্ষা করেছে, আবার করলো। আজ ও নিরুপায় চিকিৎসক— প্রকাশ্য বাজারে ওষুধ নেই, শিশুর দুধ নেই, সে তবু যাবার সময় সবিতা ও শুভেন্দুকে আশ্বাস দিয়ে বলে গেল, “ওষুধ ও যেভাবে হোক সংগ্রহ করবে, দুধেরও চেষ্টা করবে।”

প্রশান্তর ফেরবার মুখে আবার ফিস্‌ফিসের সঙ্গে দেখা। টেশনের নিকটবর্তী ওর কোয়াটার। রেল লাইন ধরে ফিরছিল, ডিসট্যান্ট সিগন্যাল পার হয়ে দেখলো, যেন কিসের উন্মুখ প্রতীক্ষায় ফিস্‌ফিস্ এবং আর একটি লোক লাইনের ধারে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

উন্মুখ প্রতীক্ষা বইকি। এখুনি রংপুরের দিক থেকে প্যাসেঞ্জার ট্রেন আসবে, তার জানালা দিয়ে দরজা দিয়ে রূপস্থাপ করে লবণ চিনি প্রভৃতির বস্তা ও মোড়ক পড়বে। ব্যবসায়ীরা দূর দূরান্ত থেকে জিনিস সংগ্রহ করে, কিন্তু আমদানী করা নিয়মের বাইরে, তাই ওরা স্টেশন টাকের কবল থেকে মুক্তি পেতে, এই উপায় অবলম্বন করেছে।

প্রশান্ত ওর সান্নিধ্যে সাইকেল থেকে নেমে পড়ে কলো—“নন্দী মশাই যে এখানে? হ্যাঁট কবে বলুন তো?”

“নানা ধান্দায় তাই জুড়ে হয়, তোমাদের মত নাড়ী টিপলেট তো পয়সা আসেনা—হ্যাঁট এইতো কাল, কেন?”

“চলুন, কাল একবার ‘দারোগা বাবুকে সঙ্গে করে হাটে যাওয়া যাক, ছুধের একটা দ্রব বাধতেই হবে—টাকায় দুই সের দর, শিশুগুলো যে মরে গেল!”

সজ্জেনে নন্দী বললো—“আচ্ছা যাওয়া যাবেখন”। ডাক্তার চোখের অঙ্গুষ্ঠে চলে গেলেই, চোখের পাতা বারকয়েক মুদ্রিত করে সঙ্গীটাকে নন্দী বললো—“দেখলে তো হে পকেটটা, কী উচু হয়ে উঠেছিল! শুধু প্র্যাকটিস আর প্র্যাকটিস—খামোনা, সাহেবের কাছে গোপন-চিঠি ছাড়ছি, সরকারী ওষুধ আর রইলনা!”

ইত্যবসরে ট্রেন এল, বেরিয়ে গেল, যথানিয়মে পুনরাবৃত্তির অবতারণা হোল। ব্যবসায়ীরা আর থাকেই ফাঁকী দিতে পারুক, নন্দীবাবুকে পারবেনা। সর্বত্র ওর অবাধ গতিবিধি, পৃথিবীর গাছের পাতাটি পর্যন্ত ওর—একটি খস্লে ও ব্যথা পায়, সেটি গ্রহণের দাবী ওরই প্রথম মনে করে।

গাছের আড়াল থেকে, এয়ার-ওয়ার থেকে জিনিষগুলোর মালিক বেরিয়ে এল। ট্রেনের মালিক, যেন লাইনের রক্ষক—স্বয়ং ঈশ্বর। নন্দীবাবুকে পূজার অর্ঘ্য খুশি করে নিজেদের লবণ চিনি প্রভৃতি জিনিষগুলো মুক্ত করে নিল।

প্রায় মিনিট দশ পনেরো অতিক্রম করেছে। কিন্তু একটি মোড়ক তখনও দুই লাইনের মধ্যে পড়ে রইল। তার স্বত্বাধিকারী কাউকে দেখা গেলনা, হয়তো বা ওর মধ্য-পথের প্রহরীস্বরূপ কেউ নেই। পায়খানার প্যানের মধ্যে দিয়ে জিনিষকে সে রক্ষা করেছে কিন্তু গাড়ীর ক্রমীয় চেকার প্রভৃতির হাতে আত্মরক্ষা করতে পারেনি।

নন্দীবাবু এবং তার সঙ্গী টিকিট ক্যালেক্টর চিনির মোড়কটি আত্মসাৎ করলো। নন্দী মোড়কটি সঙ্গীর নাকের কাছে তুলে ধরে বললো, “ওঁথো দেখতো কিছু গন্ধ পাও?”

“কী যে কর পাখানার জিনিষ—”

“পাখানায় কে না যায় ? চলো, বেচে দিই গে পরেশ ময়রা দোকানে।” মোড়কে সের পাঁচেক চিনি ছিল, কালো-বাজারের দরেই পরেশ ময়রা লুফে নিল। ওর দোকানের এক প্রান্তে দাঁউ দাঁউ করে চুলি জলছে। একাও কড়াইয়ে সের বিশ দুধ ফুটছে, একপাশে পরেশ ওর কারিগরের সঙ্গে বড় পরাতে মিষ্টান্ন গড়ছে।

কোলা গাল ফুলিয়ে চোখ নাচিয়ে সুদু হেসে নন্দী ওর অভ্যস্ত স্বরে ফিস্‌ফিস্‌ করে বললো—“পরেশ বুঝলে যে স্বর্ণ ন্যোগ”—

“কী হয়েছে মাষ্টার মশাই ?”

“ডাক্তার প্রশান্ত কাল হাটে গিয়ে দুধের দর বাধবে”—

“দুধের দর বাধবে”—পরেশ উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠে ছোট ভাই অমরকে নির্দেশ দিয়ে দিল—“কাল ভোর বেলা গ্রামে গিয়ে বেন দুধের ব্যাপারীদের এই শুভ খবর দিয়ে আসে, পরেশ ময়রা কালো-বাজারের দর দিতে পিছপাও নয়, একথা ওরা ভোলেনা যেন।”

* * * * *

প্রশান্ত অনেক চেষ্টা করেও সবিতার মেয়ের দুধের ব্যবস্থা করতে পারলোনা। পরদিন সে হাটে গেছলো, দারোগা গেছলো, ফিস্‌ফিস্‌ গেছলো—পরেশ ময়রাও গেছলো। দুধ শূন্য হাট, রীতিমত একটা অভিনয় হয়ে গেল। দূর-দূরান্ত থেকে যে দু-একজন দুধের ব্যাপারী এসেছিল, অসম্ভব দর, দর কষাকষি ক্রমে সংঘর্ষে রূপান্তরিত হয়ে ছিল। নন্দী একান্ত সুহৃদের মত ফিস্‌ফিস্‌ করে প্রশান্তকে বলেছিল, “আর নয় ডাক্তারবাবু - এবার কেয়া যাক্, ওরা বকীর প্রকৃতির লোক।”

তবু ডাক্তার বার্ষ হয়ন্টি, খাবার এবং মাখবার কড়ালিতার সবিতার মেয়েকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। শুধু তাই নয়, রম্মনী র্মনের

স্রী মারা গিয়েছে, নিঃশ্ব র্ত্তনী তবু ডাক্তারকে ফাঁকি দেয়নি, ওর শেষ সম্বল গরুটি ডাক্তারকে দক্ষিণা স্বরূপ দিয়ে তীর্থস্থানে চলে গেছলো। গরুটি অন্তঃস্বা ছিল, প্রায় আসন্ন-প্রসবা।

রজনী বলেছিল, “বাবু গাইটা যে বাচ্ছা দেবে, খাসা বাচ্ছা— একেবারে মূলতানী, গাঁটা যখন গাঁট মূত্র হয়ে গেল মিলিটারী ঠিকেদারেরা গাঁ উদ্ধার করে বাঁড়গুলো সব নিয়ে গেল, আমার গাইটা মাস্থানেক হাষা হাষা করে প্রিয়-সন্ত পায়নি, তখন আমি মরীয়া হয়ে ওকে সঙ্গরে নিয়ে গেছলাম। ডায়রী ফার্ম না কী বলে, লাটিসাহেব ঘেখানে পশ্চিমে, ইয়া বড় বড় গরু দিয়েছে, সেইখানে।”

সবিতার সম্মুখে এখন অনন্ত আশা, বৃহত্তর স্বপ্ন! প্রশান্তদা ওকে গর্ভবতী গরু পাঠিয়ে দিয়েছে, এবার ওর দুধের অভাব মিটবে— ওর পশু খুঁ হুঁ হয়ে উঠবে, ওর মেয়ে হেঁটে বেড়াবে। নিজের হাতে সবিতা গরুটির বহ্ন করে, পরিচর্যা করে। জন-প্রাণীহীন দুপুরবেলা কোয়াটারের পিছনে যেয়ে কান্তে নিয়ে গরুর ঘাস কাটে, আর গরুটি চরে। তার তত্ত্বাবধান করে, কীটা গাছ, গাছের লাউ সিদ্ধ করে লবন ক্যান দিয়ে এক উপাদেয় খাদ্য ওকে গেতে দেয়।

সেদিন প্রশান্ত এল। ও এল প্রায় দিন কুড়ি বাইশ পরে।

সবিতা অহুযোগ করে বললো—“দাদা, তুমি কত কাছে থাক, অথচ কত দিন পর এলে ?

“কি করি বল—সরকারী চাকরির এত চাপ পড়েছে—নিশ্বাস ফেলার সুসময় পাইনা।” একটু থেমে প্রশান্ত বললো—“লোকের পেটে খাদ্য নেই, এখন ছুঁড়ে ফুঁড়ে লোককে বাঁচিয়ে রাখতে হবে! এই তো বসন্তের মরশুম গেল, টাইফয়েডের সূত্র হয়েছে—”

খিল্ খিল্ করে হেসে উঠে সবিতা বললো—“দেখো দাদা, আমাদের

রূপান্তর

আর হুঁড়তে যেন। যুদ্ধের ফৌড়াতেই কাবু—আবার ফৌড়া হুঁড়ি।”

“শেষকালে রিপোর্ট করবিনা তো? ডাক্তার শুধু প্রাইভেট প্র্যাকটিস করে, সরকারী কাজ করে না—”

“করবো তো, বলবো—প্রাইভেট প্র্যাকটিসে আমার দাদা যে গরু পেয়েছে—একেবারে মূলতানী বাচ্চা, বালুতি-ভরা দুধ—তোমাদের রাশি রাশি ওষুধ, তার নথেরও যোগ্য নয়।”

এবার দুজনে ওরা হেসে উঠলো। প্রশান্ত ভিজেন্স করলো, আরও কত সময় নেবে বাচ্চা দিতে বলতো?

● “ধরে নাও দুই মাস—”

“এই দুই মাস কী করে চলবে? কত চেষ্টা করলুম—অন্ততঃ আধসের দুধ খুকুর জন্তে যদি পাওয়া যায়। তার পরিবর্তে কী পেলাম দেখ্—” ও পকেট থেকে একখানা চিঠি বের করে সবিতার হাতে দিয়ে বললো—“এর নাম গ্যানিনেমাস্ লেটার—পরিচয় দেবার যাদের সাহস থাকেনা, তারা এমনি গোপন-চিঠি বিলি করে।

আগ্রহের সঙ্গে সবিতা চিঠিখানা পাঠ করতে শুরু করলো—
অজস্র বানান ভুল, কাঁচা হাতের লেখা বাঙলা চিঠি।

“ডাক্তার বাবু, আপনি এইখানে দুইদিনের ওক্ত আসিয়া অত্যন্ত উৎপাত শুরু করিয়াছেন। কিন্তু কিছুই করিতে পারিতেছেন না—
দুধের দর বাধিতে পারেন নাই। আপনাকে জানাইয়া রাখিতেছি, যদি শেষ অস্ত্র ধারণ করেন, এস—ডি—ও দাহেবকে বলিয়া দুধের দর বাধিয়া দেন্ কিংবা মিষ্টান্ন তৈয়ারি বন্ধ করেন, আপনাকে খুন হইতে হইবে—আপনার অন্তিম একেবারে লোপ পাইবে, জানিয়া রাখিবেন।” সবিতা শিউরে উঠলো, মুহূর্তে ওর কম্পিত

হাত থেকে চিঠিখানা পড়ে গেল। খুন, খুন কী বলে দাদা—
ওরা তোমাকে খুন করবে ?

মুহূ হেসে প্রশান্ত বল্লো—“খুন নয়, বন্ ওরা আমার যোগ্য
পুরস্কার দেবে।”

মিনতি করে সবিতা বল্লো—“দাদা তোমার পায়ে পড়ি, লম্বাটি
দাদা, তুমি এসবের মধ্যে থেকনা—তোমার আশীর্বাদে আমার মেয়ে
চালো হয়ে যাবে—তুলে যেওনা, ন্যায়ের দাবীকে প্রতিহত করাই
এ যুগের ইঙ্গিত, পরোক্ষ অত্যাচারের সমর্থনই এ যুগের” আদর্শ। তুমি
সরে এস, এই সঙ্কীর্ণ এই বিবাক্ত আবহাওয়ার মধ্যে থেকে তুমি
বেরিয়ে এস—এখনি খানায় চলে যাও, দারোগা বাবুকে এই চিঠি
খানা দিয়ে দাও—তিনি যেন এ বিষয় যত্ন নেন”।

মুহূ হেসে প্রশান্ত বল্লো—“তুই কী মনে করিস্ দারোগাকে
চিঠি দেখালেই, আমার জন্তে দেহরক্ষী বাহাল হয়ে যাবে ? ওরে
নয়রে, পুলিশও আমাকে ওদের পথের কাঁটা বলেই জেনেছে।”

প্রশান্তর কোনও আপত্তি সবিতার কাছে টিকলো না, শেষপর্যন্ত
ওকে খানায় বেতে হয়েছিল। দারোগা চিঠিখানা হাতে নিয়ে চিন্তা
প্রকাশ করে বল্লো—“আমার যথাসাধ্য আমি চেষ্টা করব ডাক্তারবাবু,
তবে জনমত পরিবর্তনের আমার সাধ্য কী ?”

“আপনি দারোগা—আপনার সাধ্য রয়েছে বই কি দারোগা বাবু—”

“কিন্তু আমার উপর’য়াল্লা রয়েছে, তার উপরও রয়েছে, শাসন-
নীতি। আমরা সেই আদর্শকেই অঙ্গসরণ করি, দাসত্বকে যেদিন
মাধার মুকুট বলে বরণ করে নিয়েছি, নিজের সত্তাকে সেই দিন বিসর্জন
দিয়ে দিয়েছি, আমি জানি আমার উপরেই আবারও বেঁচে রয়েছে—
আমার অপমৃত্যু ঘটেছে।”

ফেরবার মুখে আবার ফিস্‌ফিসের সঙ্গে দেখা। হস্তদস্ত হয়ে সে থানায় প্রবেশ করছে—সঙ্গে পরেশ ময়রাও রয়েছে।

ডাক্তারকে যেন দেখতে পেলনা, এমনই ভান করে এগিয়ে গেল। যেন ওর পৃথিবীর কোনও কিছু কেউ অধিকার করে নিচ্ছে! গাঁয়ে সেই আধময়লা চাদরখানা জড়ানো, তারই অন্তরালে যেন কী সদোপন রয়েছে। দারোগা ওর বড় বড় দাঁতে অত্যর্থনাটক হাসি হেসে ওদের সমাদর করে ঘোড়ার আস্তাবলের পাশে সহিসের ঘরের মধ্যে নিয়ে গেল। ঘরে রয়েছে থরে থরে ঘি, ময়দা, চিনি—দারোগা এবার একটু গম্ভীর কণ্ঠে বললো, “এবার আমার জমাদার, সব কনেষ্টবলের রপ্তানি আপনাদের জন্তে রেখেছি—বাজার দর বেড়েছে মনে রাখবেন।”

এত জিনিষ এক সঙ্গে দেখতে পেয়ে আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে পরেশ ময়রা বললো, “দরে কী এসে যায় স্যার, এ যুগে জিনিষ দুস্তাশ্য, আপনি ভগবান, আমাদের ব্যবসা চালু করে রেখেছেন, কালো-বাজারের দরই আপনাকে দেব।”

উষল মুখে নন্দী ওর স্বভাব স্নেহে ফিস্‌ফিস করে বললো, “ষ্টেশনের ভেতরকে কিছুতেই মাথা তুলতে দেওয়া হবেনা স্তর, ওতো ডুবলো। আটার নিমকী, গুড়ের চা কেউ ছুঁতেই চায় না। ওরা পিছনের দরজা দিয়ে, গ্রামের মধ্যে দিয়ে সস্তর্পণে জিনিষগুলি নিয়ে ফিরে গেল। দারোগা অকসি এসে দেখলো, স্থধীর দরজি ওর অপেক্ষায় বসে রয়েছে। স্থধীর কীদো কীদো মুখে বললো, স্যার বাজারে কোথাও চিনি নেই, যদি একশো—আমার ছেলেটা কিছুতেই গুড়ের বালি খেতে চায় না।”

“চিনি? সে কী ভাই থাকবার ঘো আছে? দফায় দফায় চা, সরবত, ছেলেমেয়েরা চিনি না হলে দুধ খাবেনা, জল খাবারের হালুয়া

ইত্যাদি। জানোই তো পুলিশের র‍্যাশান ভালো, পনেরো দিনে দশ সের চিনি কাবার—দারোগা একটু খেমে গরিত একটা ভদ্র নিয়ে বললো, কী বলবো স্বধীর, যি ময়দাগুলো পূর্বস্তু আমার ঘরে থাকবার যো'নেই, দুই বেলা লুচি ছাড়া—”

লুচির কাহিনী শোনবার স্বধীরের অবসর ছিল না, ঘরে ওর রয়েছে রুগ্ন পুত্র, চিনির অভাবে বালি খেতে চায় না—

* * * *

প্রশান্তর ওষুধের স্তণেই হোক, অথবা দুধ খেতে পাবার আশর সম্ভাবনাতেই হোক, সবিতার মেয়ে কতকটা সুস্থ হয়েছে। সৰু লিক লিকে চাত পা, পেটুটা উচু, ফর্সা ধবধবে রং, টানাটানা চোখ তিন বছরের পন্থ মেয়ে এখন দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসতে পারে, চুপি চুপি দাঁড়াবার চেষ্টা করে কিন্তু টলে টলে পড়ে যায়, তবুও ক্রান্ত হয় না। ছোট্ট মেয়ে তবু ওর সম্মুখে অনন্ত আশা, বৃহত্তর স্বপ্ন—কানে শোনে যা, পাখীর মত কপ্চে যায়, দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে অনর্গল কণ্ঠে বকে যায়, “আমাদের গাই বাচ্ছা দেবে, মস্ত বড় বাচ্ছা হবে, বাল্‌তি বাল্‌তি দুধ দেবে” তারপর গলার স্বর নিয় করে ও বলে, আমি চোঁ চোঁ করে সব ছধ খেয়ে নিয়ে ইয়া মোটা হয়ে যাব, আমি দাঁড়াব, আমি হেঁটে বেড়াব।”

বলতে বলতে উচ্ছ্বসিত হয়ে ও আবার বলে, “শান্ত মামা বড় লক্ষ্মী, শান্ত মামা খুব লক্ষ্মী—আশা আনন্দের নানা অতিব্যক্তিতে ওর চোখ মুখ উজ্জ্বল হৃদয় হয়ে ওঠে।

ওর আশা—ওর বাপ মাকে উৎসাহিত করে, গরুটির পরিচর্যা ওরা দুজনে একাগ্র হয়ে ওঠে।

কয়েকদিন হয়েছে, প্রশান্ত ওর হেড কোয়ার্টারে ফিরে গিয়েছে। যাবার সময় সবিতা বলেছিল “দাদা আবার এস।”

স্বিচ্ছমান হেসে প্রশান্ত বলেছিল, “আসব বইকি, তবে চাকরি করতে নয়, আমাকে আসামের জঙ্গলে পোষ্টেড করা হয়েছে, বাঙালী আর অরণ্যের সঙ্গে মিতুলী পাতিয়ে আমি শুধু চাকরি করবো।

• চাকরিকেই আমার জীবনের ধান-জান ও স্বপ্ন করে তুলবো।

এতগুলি কথা সবিভা একটিও উত্তর দিল না, আনমনে অস্ত্রদিকে তাকিয়ে রইল। প্রশান্ত বললো, “কথা বল্ছিস না যে? বল্ছি তো আমি, তোর মেয়েকে পেট ভর্তি করে দুধ খেতে দিবি, তোর স্তন্য মেয়েকে দেহতে আসব বইকি—”

ওকে বাধা দিয়ে সবিভা বললো, আমি জাবছিলুম দাদা, তোমার সেন্সার এই কী যোগ্য পুরস্কার? মাহুষের সেবারত তুমি গ্রহণ করেছিলে, বন্দীজীবন যাপনই কী তার যথার্থ পাওনা? একেবারে সেই জঙ্গলে বন্দী করলো?”

“সংসারের নিয়ম তাই তাই।”

ক্রমে গরুটির প্রসবের দিন আসন্ন হয়ে এল, পালান বুলে পড়েছে। শীর্ণ হাড় বের করা চোঁহায়া ও যেন মাতৃদেহ তার বহন করতে পারছেনা। বাঙলা দেশের মেয়ে মূলতান সন্তানের মা হবে, তার অসহ্য হবে বইকি। সবিভা বললো, ও যে অত শক্তি কোথায় পাবে জানি না! প্রসব করতে পারবে কিনা কে জানে? এমন লাইনের ধারে বাসা, গরুটাকে খাওয়ানোর উপায় নেই, রোজ একটা না একটা জীব কাটা পড়বেই। গরীব মাহুষের রাশি রাশি খড় তুঘি খাওয়ানোর সাধ্য নেই, লাড়ক দিয়ে খেয়ে কখনও পেট ভরে?

গুডেন্দু বললো, “ওর দিন তো আসন্ন হয়ে এল, এ কয়টা দিন না হয় ও ছাড়াই থাক—মুঠে ঘাস লক লক করছে, পেটপুরে থাকে—শক্তিও পাবে।”

উৎসাহিত হয়ে সবিতা বল্লে—“সেই ভালো, একঘণ্টা দিন ও চরে থাক্। তোমাকে মেয়ে রাখতে হবেনা, তুমি গরুটাকে দেখো, যেন লাইনে কাটা না পড়ে, কারও জমিতে না যায়।”

গুভেন্দুর গরু চরাতে মন লাগেনা। ভদ্রলোকের ছেলে হয়ে যখন পেটের দায়ে গেটম্যানের চাকরি করছে—গরু চরাতেই বা লজ্জা কী? মহামানব শ্রীকৃষ্ণ তো একদিন গরু চরিয়েছিলেন।

প্রতি পনেরো বিশ মিনিট পর পর সৈন্ত বোঝাই গাড়ী, ওদের ষাণ্ড বোঝাই গাড়ী লাইন অতিক্রম করে। সিগন্যাল নমিত হয়, সে গেট বন্ধ করে। গাড়ী বেরিয়ে গেলে আবার খুলে দেয়। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এক প্রকাণ্ড বটগাছের ছায়ায় হেলান দিয়ে সে ব্রুসে, মেঠো সুরে বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরুটির তত্ত্বাবধান করে।

গরুটি ছাড়া পেয়ে যেন অনন্ত মুক্তির স্বাদ পেয়েছে! মাঠ ভরা সবুজ লকলকে ঘাস, খেতে খেতে কত—কতদূরে ও চলে যায়।

বাঁশী থামিয়ে গুভেন্দু ওকে তাড়িয়ে আনে। সবিতাকে বলে—“গরুটার কিন্তু বড় লোভ, খেতে খেতে আত্মহারা হয়ে কোনদিকে যে চলে যায়, সামলানই দায়!”

মুহূ হেসে সবিতা বলে—“আহা ও যে পোয়াতী, ভালো জিনিষ খেতে ইচ্ছে করে বইকি, তাই খুঁটে খুঁটে খায়।”

সেদিন বিকেলবেলা সবিতা লাইন-খালাসীদের বস্তি থেকে এক টিন ফ্যান সংগ্রহ করেছিল, তার সঙ্গে বাড়ীর ফ্যান, লাউ ও কাঁটাগাছ-সিঁদ্ধ মিশ্রিত করে এক উপাদেয় ষাণ্ড প্রস্তুত করেছিল। গরুটা এখুনি মাঠ থেকে ফিরবে, পরিতৃপ্তির সঙ্গে সবটা এক নিশাসে চোঁ চোঁ করে খেয়ে নেবে। হঠাৎ কাণের মধ্যে ওর কে যেন গরম শিষে ঢেলে দিল, মর্মদগ্ধিত করা সে চীৎকার, “গেল গেল, গরুটা কাটা পড়লো—ধদ্—ধদ্”—

রক্ত নিশ্বাসে সবিতা বাইরে বেরিয়ে গেল, “আহা কার গরু গেল” সঙ্গে সঙ্গে ওর কাণে এল—শুভেন্দু গেটম্যানের গরুটার গলাটা একেবারে ছই টুকরো হয়ে গিয়েছে, আহা, আসন্ন-প্রসবা—

আর শোনবার মত ধৈর্য সবিতার ছিলনা। শুধু লাইনের দিকে একবার তাকিয়ে দেখলো, একখানা সৈন্ত-বোঝাই ট্রেন মন্থর পায়ে চলতে চলতে গেমে গিয়েছে, সৈনিকরা কোঁকাঝুঁকি করে আগ্রহের সঙ্গে পিছন দিকে কী যেন দেখছে।

কতক্ষণ সময় অতিক্রম করেছে, সবিতার তা জানা ছিল না। হঠাৎ স্বাধীন কণ্ঠস্বরে চকিত হয়ে উঠলো। হস্তদস্ত ভাবে এসে শুভেন্দু বললো, “টিক যা মনে করেছিলুম, তাই ঘটলো। দেখনা, সাহেব এখানে এসে টুলি কাটলেন। কতকগুলি খালাসী লাইনে কাজে নেই, ওদের খোঁজে বস্তিতে গেছলুম; যাক্ দুঃখ করে কোনও লাভ নেই।”

না—সবিতা দুঃখ করবেনা, দেশব্যাপী দুঃখের দিকে চেয়ে নিজের দুঃখের কথা ও ভুলে যাবে। পঞ্চাশের মন্বন্তর বাঙলার বুকে যে-দুঃখময় স্মৃতি রেখে গেল, যে বিরাট রূপাস্তর আনলো, স্মৃতিমতী সেই করুণতম চিত্রের দিকে চেয়ে নিজের পন্থ-মেয়ের কথা বিস্মৃত হতে পারবে বইকি।

ওর পন্থ-মেয়েও তো পঞ্চাশেরই স্মৃতি, পঞ্চাশেরই প্রতীক তখন লাইনের ধারে প্রচুর লোক জন্ম হয়েছে, আকাশে বন্বন করে চিল উড়ছে, শকুন ঘুরছে। গরুটিকে শেষমুহুর্তে গাড়ীর ধাক্কা খেয়ে মাতৃহ পেষ্টে হয়েছিল, বাচ্ছাটা ছিটকে খানিকটা দূরে বেয়ে পড়েছিল। সত্যিই মূলতানি নৃত্য দিয়েই সে গঠিত হয়েছিল, লম্বা হাত পা, প্রকাণ্ড শরীরটা—

ষ্টেশনের মেথর অংশীদার খণ্ডিত গরুটির চামড়া তন্ত হাতে কচকচ করে কেটে নিচ্ছিল—

কিস্ফিস্তিও যথাসময়ে উপস্থিত হয়েছিল। রেলের জমিতে খণ্ডিত গরু, ওর দাবী রয়েছে বৈকি। ষ্টেশন মাষ্টারও মেথরের সঙ্গে তার পাওনা ঠিক করে ফেললো। লোভনীয় মাংস, কুকুরের সঙ্গে ডোমগুলিও লোলুপ হয়ে উঠেছিল।

পরেশ ময়রার দোকানেও তখন শুভেন্দুর গরুরই আলোচনা চলছিল। “মস্ত পালান, বাটভরা দুধ—মূলতামের বাচ্ছা যে”—

দলে দলে মিলিটারী ঠিকেকদার দোকানে আসছে, যারোজ্জোমের ঠিকেকদার, চালের ঠিকেকদার—এমনি নানা জাতীয় ঠিকেকদার। গো গ্রাসে মিষ্টান্ন গিলছে—রসগোল্লা, সন্দেশ, পাকুরা—পেয়ালার পর পেয়াল চা। সবিতার পক্ষ-মেয়ে কিন্তু তখনও স্বপ্নব্রাজ্যে বিচরণ করছে—কস' ধবধবে মেয়ে, টানা টানা চোখ, সরু সরু হাত পা, পেটটা উচু। দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসেছে, অনর্গল কণ্ঠে সে তার আশার আকুল সঙ্গীত গেয়ে চলেছে—“গরুটা প্রকাণ্ড মূলতানী বাচ্ছা দেবে—ও পাত্র-পাত্র দুধ খাবে, রোগমুক্ত হবে, হেঁটে বেড়াবে”—

হঠাৎ কয়েকটি কাকের বচসায় উঠোনে ফ্যানের টিন্টা উন্টে গেল। ও চমকে উঠে ব্যগ্র হয়ে সবিতাকে ডেকে বললো—“মাগো, সব ক্যান কেলে দিল, ওগো মা, গরুটা তবে খাবে কি? মাগো”—

সবিতা নিরুত্তর। এ প্রশ্নের সে কী বা উত্তর দেবে?



ফুলিস

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধ বাধিবার দু'তিন বছর আগেকার কথা। দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে
শ্রমের মূল্য বহুগুণ বাড়িয়া বাংলার মানুষকে (ভারতের বলিগাম না
এই ক্ষমতায় যে বাংলার মধ্যেই আমার ভয় কর্তৃপক্ষ নীমাবদ্ধ।) এমন
সঙ্কটজনক পরিস্থিতিতে প্রতিষ্ঠিত করে নাই। সপ্তাহান্তে টেন-ড্রমণও
তখন আনন্দ-ভ্রমণ ছিল, এবং রেল কর্তৃপক্ষও 'ভ্রমণ বাড়ান'
নীতি অনুযায়ী যাত্রীদেরকে পল্লীর স্তম্ভ শ্রী-দর্শনে প্রলুব্ধ করিয়া কাগজে
কাগজে প্রচার সাহিত্যকে পরিপুষ্ট করিতেন। তেমন সুখের দিনে
একবার সোমবারে দেশ হইতে কলিকাতায় আসিতেছিলাম। সকালের
ট্রেনে আসিতেছিলাম কাজেই রাত্রির বিব্রিত নিদ্রার ক্ষতিপূরণ মানসে
একখানি পুরা বেক দখল করিয়া পরম নিশ্চিন্তেই হাত পা ছড়াইয়া
চক্ষু মুদ্রিয়াছিলাম।

নৈহাটী ছাড়াইতে না ছাড়াইতে অস্পষ্ট তন্ত্রার ঘোরে মনে হইল,
কে যেন আমার পা ধরিয়া মৃদুভাবে নাড়া দিতেছে। অস্পষ্ট তন্ত্রার
ঘোর, কাজেই রেল-কর্তৃপক্ষ-সত্যিকার চোর জুয়াচোরদের কথাই মনে
হইল। ইহারা যাত্রীদের নিকটেই থাকে। কিন্তু পকেটে হাত না
দিয়া পায়ে হাত দিতেছে কেন? তবে কি জুতাই ইহাদের লক্ষ্য?
তন্ত্রার ঘোর কাটিলে স্পষ্ট বুঝিলাম, 'পা' নহে জুতার উপরেই কে
যেন সস্তর্পণে হাত বুলাইতেছে, অর্থাৎ নিঃশব্দে সরাইবার চেষ্টা চলিতেছে।

স্পষ্ট বোধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জ্যা-ঘোজিত ধনুকের মত বেঞ্চিতে
বসিয়াই তাহার হাত চাপিয়া ধরিলাম। সে চীৎকার করিয়া উঠিল,
আঃ, লাগে যে মশাই।

চকুর ঘোর কাটলে দেখিলাম, সে একটা বারো তেরো বছরের বালক। ময়লা হাফ-প্যান্ট ও ময়লা কতুয়া গায়ে; একহাতে একটা কালির কোটা ও জুতার ত্রাশ অন্তহাত আমার জুতায় লুপ্ত।

মুটি শিখিল করিয়া কহিলাম, কি চাই?

জুতো বুদ্ধশ করাবেন না? দেখুন না জুতো আপনার কি রকম ময়লা হয়েছে।

জুতার পানে চাহিয়াই তাহার হাত ছাড়িয়া দিলাম। ঘূমের ঘোরটা তখন সম্পূর্ণ কাটিয়াছে। চৈতন্তের পরিপূর্ণ মুহূর্তে বুঝিলাম, এই জুতা যে লুক্কের মনোহরণ করিতে পারে সে চিন্তা মনে ঠাই দেওয়াও না কত লজ্জাকর। কয়েকটি তালি ও হাক্‌গুলের বোঝায় ভারি। বহু পুরাতন ফাটা চামড়ার বিবর্ণ জুতা; আষাঢ়ের সিজল পাটল মেঘের পানে চাহিয়াই দুইমাইল দূরের স্টেশনে আসিবার কালে এটি পরিয়াছিলাম। তুছপরি দেশের রাস্তার কোমল কর্দ্দমে এটি বিচিত্রিত।

পা শুটাইয়া লইয়া বলিলাম, না, জুতোর কালি দিতে হবে না।

ছেলেটি বলিল, দেখুন না-কেমন নতুনের মত চকচকে করে দিই।

নাছোড়-বান্ধা ছেলেটির পানে চাহিলাম। কল্লনাও সেই সজ্জা-উদ্দীপ্ত হইল। রোগা, রং ময়লা; চোখ দু'টি একটু বড় বলিয়া কারুণ্যে কেমন ছলছল করিতেছে আর ভ্রুর উপর একটি নাতিবৃহৎ কাটার দাগ ঔদ্ধুত রুঢ়তায় সেই কারুণ্যকে শাসন করিতেছে। এটি দুটানোয় চুকিই বটে। কল্লনা কিন্তু মনের মাঝে ছেলেটির হইয়া ওকালতি স্বরূপ করিয়া দিয়াছে। দুঃস্থ ছেলে শুধু নিজের দায়ে এই হীনবৃত্তি অবলম্বন করে নাই, পিছনে কোন সহায়সম্মলহীনা দুঃখিনী বিধবা মা আছেন, কিংবা আছে কয়েকটি অপোগণ্ড ভাইবোন। সামর্থ্যহীন উপার্জন-অক্ষম রুগ্ন পিতাও থাকিতে পারেন। মোটকথা

যাহারাই থাকুন অনন্তোপায় এই বালক অল্প কোন বৃত্তি খুঁজিয়া না পাইয়া এই সহজলভ্য মীন কৰ্ম্মটিকেই সংসার চালাবার উপায় স্বরূপ বাছিয়া লইয়াছে। ছেঁড়া জুতাকে কাৰ্পণ্যকবলমুক্ত করিয়া . . . উহার হাতেই সঁপিয়া দিলাম।

ছেলেটি মেঝেয় দুই পা ছড়াইয়া বসিল। একপাটি জুতা কোলের উপর সমানরে টানিয়া লইল। পকেট হইতে বাহির করিল ছেঁড়া স্নাকডা খানিকটা। সেটি দিয়া উত্তমরূপে ঘষিয়া, শুষ্ক কাদার দাগ মুছিয়া কালির কোঁটা থুলিল। তারপর কালি দিল কি না দিল—প্রাণপণ জোরে বুরুশ টানিতে লাগিল।

এদিও ছেঁড়া জুতায় কালি লাগানো বুধা বলিয়াই এতকাল বর্ষাকালের আশ্রয়রূপে ওটি খুল জঙ্গলের মধ্যে ফেলিয়া রাখিয়াছিলাম। কিন্তু দু'টি পরস্য ব্যয়িত হইবার মুখে আমার হিসাবী সংসারী মন সজাগ হইয়া উঠিল। কহিলাম, এই—ভাল করে কালি মাখা। খালি ফাঁকি!

দেখুন না বাবু, কেমন পালিশ করে দেই। পছন্দ না হয় পরস্য দেবেন না।

তা পাঁচ মিনিটের অধ্যবসায়ে জুতার অবস্থা ভদ্রহল গমনোপযোগী করিয়া দিল। খুসী মনেই পরস্য দিলাম।

গাড়ী তখন চলিতেছে। ছোট কামরা, অল্প লোক ছিল না বলিয়াই ছেলেটি দাঁড়াইয়া রহিল।

কোতুহল বোধে জিজ্ঞাসা করিলাম, তোর নাম কি রে?

আজ্ঞে বন্দাবন।

তোর বাবা বুঝি জুতো তৈরী করে?

ছেলেটির কাটা ক্র কুঞ্জে উদ্ধত হইয়া উঠিল। একটু চরা গলার বলিল, আমরা মুচি নাকি—তাই বাবা জুতো তৈরী করবে!

তবে তুই যে জুতো বুরুশ করিস?

আমার খুশী। উদ্ধত জ্ঞতে তরঙ্গ তুলিয়া সে বেঞ্চির ওপাশে গিয়া বসিল, আমার পানে আর তাকাইল না।

আমি কিন্তু প্রশ্ন করিলাম, আচ্ছা তুই যুটির কাজ না করে অস্ত্র কাজও তো করতে পারিস।

মুখ না ফিরাইয়া সে কহিল, কাজ! কাজ অমনি করলেই হগো। কি কাজ করবো?

লেখাপড়া জার্নিস না বুঝি?

না।

কোন দোকানে তো কাজ করতে পারিস।

চাকর হয়ে! সববেগে মুখ ফিরাইয়া চোখ দু'টি সে বিস্তৃত করিল। হয়তো বিশ্বয়—হয়তো বা ঘৃণা।

বলিলাম, এই ছোট কাজের চেয়ে পেকি ভাল নয়?

ছেলেটি হি হি কটিয়া হাসিয়া উঠিল। কহিল, ছোট কাজ! ষাড় নাড়িয়া বলিল, ছোট কাজই আমার ভাল। তোমাদের ইচ্ছে হয় জুতো বুরুশ করাবে—ইচ্ছে না হয় করাবে না। কারো এক্সেজাম্বির মধ্যে তো থাকতে হয় না। বা পেলাম—যা খুশী কিনে খেলাম। যখন ইচ্ছে হ'লো খুমোলাম—ইচ্ছে হ'লো টকি দেখলাম—

টকিও দেখিস?

কেন দেখব না! তোমরা দেখ না? আমার বিশ্বয়কে চাপা দিয়া তাহার বিশ্বয়টাই প্রবল হইয়া উঠিল।

কিন্তু তোর মা হয়তো না খেতে পেয়ে—

বাধা দিয়া সে বলিল, মা নেই।

বাবা?

কেউ নয়—কেউ নয়। আমি একলা। পুনঃপুনঃ ষাড় নাড়িয়া সে কহিল, একটা দিদি আছে—তার বাড়িতে গেলে দুঃ দুঃ করে।

শুফলিজ

ভগিনপোত শালা ভারি পাঞ্জী—তাড়ি খেয়ে দিম্বিকে গাল দেয়—
আমাকে মারতে আসে।

মমতা হইল ছেলেটির উপর। বলিলাম, তা একাজ না করে
কোন গেরস্ত বাড়িতে যদি ছেলের মত থাকিস। থাকিবি—
কাজকর্ম করবি—

ছেলের মত! আমার মা-ই নেই তা ছেলের মত। সে উচ্চ
কর্কশ কণ্ঠে হাসিয়া উঠিল। মা না থাকলে কেউ শ্রদ্ধা করে?
করি নি বুঝি চাকরি! ওরে বাবারে, সে কি জুলুম! হান কর,
তান কর. এখানে যাও ওখানে যাও। বেশি খেলে বকুনি—বেশি
ঘুমলে বকুনি—কান ধরে টানা—চড় মারা—ওরে বাবারে! মা
না থাকলে কেউ কাউকে দেখে কিনা!

তুই দুষ্টুমি করে কাজে ফাঁকি দিতিস তো?

কেন দেবনা! দিন রাত কেউ কার করমাস খাটতে পারে!
একটু থামিয়া বলিল, ছিলাম চাটুজ্ঞে বাড়ি—নৈহাটির ছিনাথ
চাটুজ্ঞেকে চেন তো—তাদের বাড়ি। গিন্নী যেমন দজ্জাল—তেমনি
হাতির মত মোটা—আর ছেলেটা তার কোলা ব্যাঙের মত থপ-থপে।
তিন বছরের ছেলে হাঁটতে পারে না। বলিয়া হিহি করিয়া
হাসিয়া উঠিল।

অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিয়া করিল, যেই কাজ শেষ হতো গিন্নী
ছেলেটিকে কোলে চাপিয়ে নিয়ে বলতো—বেড়িয়ে নিয়ে আয়। অত
ভারি ছেলে বইতে কষ্ট হয় না বুঝি? চিমুটি কেটে তাকে কাঁদিয়ে
তবে—অসমাপ্ত কথার মুখে পুনরায় হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

বলিস কি! চিমটি কেটে ছেলে কাঁদাতিস?—ডাকাত নাকি!

হাসিতে হাসিতেই সে বলিল, বেশ করিছি।

গল্প-ভারতী

মনে মনে ভাবিতেছিলাম—কোন গৃহস্থ বাড়িতে ছেলেটিকে রাখিয়া দিই। কিন্তু এভাবে দুটামি করিলে কেই বা উহাকে বাড়িতে স্থান দিবে।

গাড়ীর গতি কমিয়া আসিতেছে—নার্থবার জন্ত ছেলেটি উঠিয়া পিড়াইল।

বলিলাম, এই—শোন। থাকবি আমাদের মেসে? বেশী কাজ করতে হবে না—

মাথা নাড়িয়া সে কহিল, না মশাই, বাধা কাজ আমার পোষাবে না। যখন খেলবার ইচ্ছে হবে তখনও কাজ—যখন ঘুম পাবে তখনও কাজ। জানা আছে সব মিঞাকে। ওরে বাবা—নমস্কার। তখনও গাড়ি য়ু চলিতেছে, কপালে হাত ঠেকাইয়া সে প্লাট-ফরমে লাকাইয়া পড়িল।

তারপর একটা স্টেশন পার হইতে না হইতে ছেলেটির কথা ভুলিয়া গেলাম। ও রকম অনেক ছেলেকেই জানি তো। চাকরি করিবে না, ভিক্ষা কিংবা যে কোন হীনবৃত্তির দ্বারা—ইচ্ছামত খাওয়া—বেড়ানো—নেশা করা—সবটাই জোগাড় করিয়া লয়।

বুদ্ধের তখন পঞ্চম বছর। বি, এ রেল পথের মেন লাইনে সৈন্ত ও যুদ্ধান্ত চালনার ধুম লাগিয়াছে। অবিরাম গতিতে স্মরণীয় মাল গাড়ি অদ্বুত ধরণের মারগান্ত লইয়া আসামের দিকে চলিয়াছে, সেই সঙ্গে চলিয়াছে সৈন্তবাহী গাড়ি। বড় জংশন স্টাণ্ডাট। এখানে সব গাড়িই বহুক্ষণ বিশ্রাম করে। অনেক সাদা চামড়া ও লাল মুখ গোরা সৈন্ত আসে যায়। তাদের বিচিত্র বেশবাস, অদ্বুত আচরণ ও আহার-প্রণালী মানুষের মনে বিশ্বয় জাগায়। বিশেষ করিয়া ভিখারিগুলার। ওদের সাহসও বাড়িয়াছে—গোরা দেখিয়া

শুলিঙ্গ

ভয়ে দূরে সরিয়া যায় না। সাহেবদের সঙ্গে ডাব জমায়, তাহা ইংরেজীতে কথা বলে—থাবার চায়—তাহাদের ভুজাবশিষ্টের জন্ত কাড়া কাড়ি মারামারি করে। অল্প ভোজ্য ফেলিয়া দিলে এক পাল ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন ঝগড়া বাধাইয়া দেয়—তেমনি কোলাহল করে এরা। সাহেবেরা হাসে আর থাবার ছুড়িয়া দেয়। কেহ কেহ পয়সাও দেয়।

শনিবার বৈকালে দেশে ফিরিতেছিলাম। রাণুঘাটে গাড়ি বদল করিয়া শান্তিপুরগামী ট্রেনের অপেক্ষা করিতেছি। দেখিলাম সাইডিঙে দেশী সৈন্ত বোঝাই একখানি গাড়ি রহিয়াছে। গাড়িখানি কয়েক ঘণ্টার জন্ত হয়তো থাকিবে—সেইজন্ত গাড়ির সামনে বিস্তৃত রেল-ইয়ার্ডে তাহারা রন্ধনের আয়োজন করিতেছে। তিনটি মোটা লোহার ডাঙা পুঁতিয়া অস্থায়ী উনান করিয়াছে। উনানের মধ্যে মোটা মোটা কাঠের গুঁড়ি। প্রকাণ্ড ডেকচিটা পাশেই আছে। সতরঞ্চি বিছাইয়া পর্বত প্রমাণ আনাজ কুটিয়াছে; কয়েকটি টিনের পাত্রে আছে বি, তেল, মশলা ইত্যাদি। আমরা—যাত্রীদল, গাড়ি না আসা পর্য্যন্ত উহাদের এই স্বাক্ষর যজ্ঞের আয়োজন মন দিয়া দেখিতেছি। খোলা সায়গায় উনান শীঘ্র জ্বলিতে চায় না। একজন সৈনিক ছুটিয়া একটা টিন হাতে লইয়া উনানের কাছে আসিল। তারপর টিনটা উপুড় করিয়া দিল চুল্লীর উপরে। বগ্ বগ্ করিয়া একটা শব্দ হইল, কাঠ ভিজাইয়া তেল ঘাসগুলিকে পর্য্যন্ত সিক্ত করিয়া মাটির উপর গড়াইতে লাগিল। দাউ দাউ করিয়া আগুন জ্বলিল। সবিস্ময়ে এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে নিজের কেরোসিন-রিক্ত অন্ধকার গৃহের কথা মনে পড়িল। কিন্তু সে কতক্ষণের জন্তই বা! ওদিকের প্রাটফরমে হস্ হস্ শব্দে একখানা গোরা-বোঝাই গাড়ি আসিয়া পড়িল। চক্ষু মন সেই দিকে আকৃষ্ট হইল।

কোথায় ছিল ভিখারীরদল ছুটিতে ছুটিতে গাড়ীর দুইধারে জমিয়া বিচিত্র কলরব জুড়িয়া দিল। শুউ মর্গিং সার, ভেরি হাংগ্রি সার, পরস্য মিজিয়ে ইত্যাদি। সাহেবরা তখন হয়তো প্রাতঃরাশ করিতেছিল। বুদ্ধগারী সাদা চামড়াদের প্রাতঃরাশ বলিয়া কিছু আছে কিনা জানি না— কারণ সকাল-দুপুর-সন্ধ্যা যখনই জংশনে গাড়ী থামে—তখনই দেখা যায়, উহার মুখ চালাইতেছে। টিনভর্তি মাছের আচার, কলা, বিস্কিট, রুটি, মাখন—লেবু—চা—কোকো—স্মাউউইচ—পাঁউরুটি, কারি, হুপ ভিখারীরা কোর্টটারই প্রসাদলাভে বঞ্চিত হয় না। সামান্য ডালভাতে বাহাদের ক্ষুণ্ণিত্ব হইত তাহারা এইসব বিদেশী রসনাতৃপ্তিকর খাত্তের সঙ্গে দিব্য পরিচিত হইয়াছে। পরিতৃপ্ত-মুখে সবই চাহিয়া লয় এবং চাটিয়া চাটিয়া শেষকণা বা বিন্দুটুকু গলাধঃকরণ করে। হিন্দু মুসলমান নমঃশূদ্র অন্ত্যজ বলিয়া জাতিগত বড়াই করে না—ধর্মগত কোন প্রবণত্ব তুলে না। দ্বিভিক্ষ-শাসনে সামাজিক প্রথা বা ধর্ম এমনই তুচ্ছ হইয়া গেছে

ভিখারীর সংখ্যাও বাড়িতেছে দিন দিন। কয়েকজন—আজ কয়েক শ'তে দাঁড়াইয়াছে। মাহুঘের মত কুকুর ও কাকের সংখ্যাও বাড়িয়াছে এবং মাটিতে ও অন্তরীক্ষে রীতিমত ষাঙ্কলাভের প্রতিযোগিতা চলিতেছে। বিদেশীরা আহার-পরিতৃপ্ত মুখে হাসিতেছে। কলহ-কোলাহল উপভোগ করিবার জন্য বেথানে ভিড় বেশি সেইখানেই প্রসাদ-কণা ছড়াইয়া দিতেছে। দূরে দাঁড়াইয়া আমরাও উপভোগ করিতেছি। ওদেশের ভদ্রেরা উচ্ছ্রিষ্ট-প্রলোভনে এদেশের ময়লা কাপড়-পরা ভিখারীদের লইয়া যে-কোতুক জমাইয়াছে, সে-কোতুক অংশ আমরা অর্থাৎ আর একদল শোভন পরিচ্ছদধারী ভদ্রেরাও ভোঁা বিনামূল্যে পাইতেছি। অথচ কোথা হইতে একটা বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। দেশী পরিচ্ছদধারী একজন সৈনিক—হড়মুড় করিয়া ছুটিয়া আসিয়া ভিখারিগুলার দলে গিয়া

মূলিক

পড়িল। গোরাকে তুষ্ট করিবার জন্য মনে হইল—সেও প্রতিযোগিতায় নামিয়াছে। কিন্তু না, দলের মধ্যে পড়িয়াই এলোপাথারি কিল-চড়-লাখি ইত্যাদি বর্ষণ করিতে করিতে সে মুখে গর্জন করিতে লাগিল, ডাম, ব্লাডি, কাওয়ার্ড! ভিখারিদলে চেঁচামেচি ছুটাছুটি লাগিয়া গেল। কেহ ছিটকাইয়া লাইনের উপর পড়িল, কেহ মাংসের হাড় চিবাইতে চিবাইতে দূরে পলাইয়া গেল। দূরে দাড়াইয়া কেহ বা সৈনিকটাকে গোটা হাতের ভঙ্গিতে থক ও বৃক্ণাস্ত্র তুলিয়া কলা দেখাইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে গোরাদের গাড়ি জনতামুগ্ধ হইয়া স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত হইল। উচ্চহাসিতে চারিদিক প্রতিধ্বনিত। গোরারা বলিতেছে—থ্যাঙ্কু—থ্যাঙ্কু। আমরা বলিতেছি, সাবাস।

রণক্ষেত্র শত্রু কবল মুক্ত করিয়া আমরা যেদিকে আছি—সেইদিকের প্র্যাটফরমে সৈনিকটি লাফাইয়া উঠিল। বেশ পরিশ্রান্ত হইয়াছে। কপাল হইতে দরদর ধারে ঘাম ঝরিতেছে, পোষাক ও শিরপেট কিছু বিপর্যস্ত, শ্বাস ক্ষত। আরক্ত মুখ চোখ ক্রোধে জ্বলিয়া দ্বিগুণ হইয়াছে। সে-মুখে শাপিত তরবারির ইম্পাত-কাঠিন্য। ক্রুর উপরে খানিকটা কাটা কালোদাগ চিহ্নিত, উদ্ধত চোখদুটি জলিতেছে। করুণা-লেশহীন সে মুখ কোন মানুষের নহে।

গোরারা অকস্মাৎ হাত তালি দিয়া এই বিজয়ী বীরের সম্বর্জন করিল। চোখের দৃষ্টিতে মানুষকে ভস্ম করা স্বেচ্ছা হইলে এইদণ্ডে ট্রেন-বোঝাই বেত সৈন্যগুলির চিহ্ন মাত্র থাকিত না। অতঃপর সেই জলন্ত-দৃষ্টি আমাদের পানে ফিরাইয়া কর্কশকণ্ঠে সে কহিল, আপনাদেরও লজ্জা নেই বাবু—ওদের সঙ্গে হাসছেন!

সত্যই লজ্জা আমাদের ছিল না। সকলই তার হিংস্র দৃষ্টি ও কর্কশ স্বরের প্রত্যুত্তরে নিলজ্জভাবে হাসিয়া উঠিলাম।

গল্প-ভারতী

শেম—শেম। বজ্র নির্ঘোষে চাপা গভীর স্বরে আমাদের দিকার দিয়া সে দেশী পণ্টনবাহী গাড়িখানার দিকে চলিয়া গেল।

এটি ওর স্বাভাৱ্য-বোধের প্রকাশ কিনা জানিনা। শক্তির প্রকাশও জে হইতে পারে। কুড়ি বাইশ বছরের ছেলে; হাতে পায়ে ক্ষীত পেশি, চণ্ডা উন্নত বুক ও উজ্জ্বল চাহনি—শক্তিকে যেন বহন করিতে পারিতেছে না। মিছামিছি ভিখারীগুলার উপর এইভাবে বীরত্ব দেখাইয়া ওকি বিদেশীদের কোতুককে বেশিমানার উদ্দীপ্ত করিয়া তুলিল না? গোরায়া আঙুল তুলিয়া দেশী-পণ্টনের দিকে ইঙ্গিত করিয়া হাসিতেছে। হয়তো পরিহাস করিয়া বলিতেছে, দেখ দেখ—কাল সৈন্দের বীরত্ব! কতকগুলো অসহায় আহা—বঞ্চিত দুর্বল ভিখারীর উপর বীরত্ব ফলাইয়া গেল—আসল রণক্ষেত্রে এইরকম বীরত্বের নমুনা কি মিলিবে!

কিন্তু স্বাভাৱ্য বোধই যদি ঠেকে তো সৈন্সদলে যোগ দিল কেন? শুকুটা কি আমাদের এবং আমাদের পরিভ্রমকে জ্ঞান করিবার জ্ঞানই হইতেছে?

সব চিন্তার নিষ্পত্তি করিয়া বাণী বাজাইয়া আমাদের ত্রাণ লাইনের গাড়ি আসিয়া গেল। সব তুলিয়া মরি বাচি করিয়া আমরাও স্থান সংগ্রহে ছুটিলাম। তারপর গাড়িতে বসিয়া ওই বিষয় লইয়া খানিক আলোচনা চলিল। আলোচনা প্রসঙ্গে বাড়ির কথা, সিনেমার কথা—কণ্টোলের কথা আসিয়া পড়িল।

জীবন ধারণ দিন দিন দুর্বল হইয়া উঠিতেছে বলিয়াই ঘটনাগুলি বুধদের মত ফুলিয়া ফাটিয়া যায়, মনের কোণে দাগ বসাইতে পারে না।

কিন্তু কতকগুলি ঘটনা হৃদয়-পরম্পরায় গ্রথিত হইয়া মনের পৃষ্ঠায়

অগ্নি-অন্ধরে জল জল করিতে থাকে। ওই বীর সৈনিকটিও তাই শেষপর্যন্ত বহু ঘটনার চাপে হারাইয়া গেল না।

মাস দুই তিন পরেই হইবে। রাত্রির আহাৰ সারিয়া মেসের ছাদে পদচারণা করিতেছি, পাশের বাড়ি হইতে একটা কোলাহল উঠিল। কোলাহল কলিকাতায় প্রতাহ এবং সূর্যক্ষণই উঠে—তাহাতে মনোযোগ দেওয়া কঠিন। এ কোলাহল কিন্তু সে জাতীয় নহে। পাশের বাড়ির তেতলার ছাদের উপর ধ্বস্তাধ্বস্তি ও চাপাকণ্ঠের গালিগালাজ। চাপাকণ্ঠ ক্রমে উচ্চগ্রামে উঠিল—ও পদশব্দে ছাদ কাপিতে লাগিল।

• খুন করবো—তোকে আমি খুন করবো—স্ট্রপিড—ব্লাডি—
ওগো খুন করলে—খুন করলে—

আশে পাশের বাড়ির জানালা দরজা খুলিয়া গেল, ছাদে ছাদে অন্ধকার সমুদ্রের মাঝে লোক চলাচল আরম্ভ হইল। সঙ্গে সঙ্গে বহু কণ্ঠের ধ্বনি :

কোথায় মশায়, কোথায় ?

দক্ষিণ দিকের বাড়িটায় ?

উড়েনের বস্তিতে ? না ক্লাব ঘরে রিহার্সাল চলছে ?

কয়েকটি টর্চের আলো ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইল।

আলিসা দেওয়া ছাদ, তিথি ক্লমপক্ষ। ধ্বস্তাধ্বস্তির শব্দ কানে আসিতেছে। অস্ফুট যন্ত্রণাব্যঞ্জক শব্দ ও চড় ঘুসির শব্দ মিলিয়া রহস্য ঘনীভূত হইতেছে। নায়করা দৃষ্টিশীমার বাহিরে। হয়তো চোখের সামনেই একটা খুন হইয়া যাইবে—অথচ আমরা নিরুপায়। শুধু বাক্য দ্বারা শাসন করিয়া ছাড়া—এ ছাদের আলিসায় উঠিয়া কেহ কেহ ও ছাদে লাফাইয়া পড়িবার জন্ত ব্যগ্র। কিন্তু অন্ধইনের

কথা মনে আনিয়া লক্ষ সঞ্চার করিয়া চীৎকারটাই শুধু বাড়াইয়া তুলিতেছে।

বেশি বাড়াবাড়ি করলে পুলিশে খবর দেব মশাই।

হৈ-চৈয়ের মধ্যে মল্লযুদ্ধ থামিল। রক্তহর্ষে অথও নিম্নকতা। এ-ছাদের লোক ও-ছাদের লোককে, ও জানালায় গৃহিণী—পাশের জানালায় বধূকে, শুধু জিজ্ঞাসা করিতেছে—ব্যাপারটা কি? 'বোধ হয়' যুক্ত করিয়া যে যাহার মন্তব্য জানাইতেছে—কোতুহল তাহাতে মিটিতেছে না।

ঘরে আসিয়া কোতুহল মিটাইবার চেষ্টা করিলাম। আমার ঘরের সামনে ও-বাড়ির যে জানালাটা খোলা ছিল, তাহার ব্যবধান হাত দুই। ও-ঘরে ভিন্ন জেলার যে-সব অধিবাসী আসে যায়—তাহাদের সঙ্গে আমাদের মৌখিক পরিচয়টুকুও নাই। শহর কলিকাতা—সমুদ্র বিশেষ। অসংখ্য ঢেউয়ে যে ধ্বনি উঠে তাহা মূলতঃ হয়তো একই নাদের অন্তর্গত, কিন্তু বিচিত্র শব্দসমষ্টিকে এক করিয়া অর্থ বাহির করিবার দুশ্চেষ্টা কেহই করেন না। আত্মকেন্দ্রে লগ্ন হইয়া মানুষ যে-কথা বলে—যে-ঘটনা ঘটায়, তার ধ্বনি ও গতি প্রসারহীন। সুতরাং এ-বাড়ীর দুঃখের প্রকাশ ও-বাড়ির খুসীর প্রচারের সঙ্গে পাল্লা দিয়া দোড়ায়।

পাশের বাড়ি সম্বন্ধে আমাদের ঔদাসীন্তের আরও হেতু আছে। ও বাড়িটি সম্প্রতি আমাদের দক্ষিণদিক অবরুদ্ধ করিয়া মাথা তুলিয়াছে। ওটি যেস বাড়ি নহে—ফ্ল্যাট সিঙ্গেলমে ভাড়া দেওয়া আছে, এবং তাহাও মাত্র মাস দুই হইল। আমাদের মেসকে সমীহ করিয়া ও বাড়ির কোন কোন ফ্ল্যাটের লোক প্লাতলা কাপড়ের পরদা এই দিকের জানালায় টাঙাইয়াছে। কিন্তু ওদের ঘরে আলো জলিলে আক্রমণ অর্থহীন মনে হয়। যাহা হউক, আজ কোতুহলের কাঁছে আমাদের নিম্প্রহতা নিঃশেষ করিয়া ডাকিলাম, ভায়া শুনচেন?

ফুলিঙ্গ

জানালায় কাছে আসিয়া তত্রলোক বলিলেন, যা জিজ্ঞেস করবেন জানি, কিন্তু কি যে ব্যাপার আমরাও ভাল জানি না।

মানে যিনি চোঁচাচ্ছিলেন—

ওরা দিন দশেক হ'লো এসেছে—তেতলায় ফ্র্যাটের নতুন ভাড়াটে। স্বামী-স্ত্রী। ছেলেটা বাঙালী কিন্তু মেয়েটা খাসিয়া-ভূটিয়া গোছের।

আপনারা জায়গা দিলেন জেনে শুনে ?

আমরা কে—ফ্র্যাট সিস্টেম। ছেলেটা নাকি কাজ করে মিলিটারিতে। মণিপুরে গেছলো। এখন ছুটিতে এসেছে বেড়াতে।

খ্রীষ্টান ?

• খ্রীষ্টই জানেন।

ছেলেটির সম্বন্ধে আর কিছু জানেন না ?

জানি কিছু কিছু। জাত খুব উঁচু নয়—মাইনেও বেশি নয়, তবু আমাদের সঙ্গে কথা বলে এমন ভুরু কুঁচকে যে দেখলে হাড়পিণ্ডি জলে যায়। বলে কি জানেন, কেরাগী আবার মাছুষ—তাদের আবার সম্মান !

আমার পাশ হইতে স্বখেন্দু বলিল, দিলেন না কেন কসিয়ে একটি চড়।

না মশাই, ছেলেটা গোঁয়ার গোবিন্দ। লেখাপড়া তো জানে না—বাবা বলতে শালা বলে বসে। শেষকালে কি মান্ন খোঁয়াবো ! এই এক বাড়ি লোকের সামনে খাসিয়া মেয়েটার হাত ধরে গট্‌গট্‌ করে নেমে যায়। হাসি ছল্লোর ফটিনটি। পুশের ফ্র্যাটের তোরণীবাবু একদিন টুকেছিলেন বলে—ওই রকম উত্তর দিয়েছিল।

আজ কি হয়েছিল ? • • •

ঠিক জানি না। মাঝে মাঝে ওর ছ'একজন বন্ধু আছে। • সেদিন

হজ্রোড় বেশি হয়। আজও বেশ চলছিল, হঠাৎ মেয়েটা টেচিয়ে উঠলো—
ভারপর, ধ্বস্তাধ্বস্তি।

যে বন্ধুটি এসেছিল—সে এখনও আছে ?

না। যাবার সময় শাসিয়ে গেল ওকে আরেষ্ট করিয়ে দেবে।
কে জানে—আব, সকণ্ডার কি না!

কোতুহল আমাদের সীমা ছাড়াইল। কহিলাম, এর মধ্যে অনেক
কিছু আছে। মেয়েটা হয়তো—

গুড নাইট। ভদ্রলোক ভদ্রভাবেই জানালাটা বন্ধ করিয়া দিলেন।
রহস্যের যবনিকায় ঢাকা রছিল হাত দুই দূরের বাড়িটা। ঝড়িতে ঢং
করিয়া একটা শব্দ হইল। সমস্তই নিভরু হইয়া গেল। মনোভূত রহস্যের
ফাঁকে নিদ্রাদেবী সে রাত্রিতে আমাদের সঙ্গে থানিকটা পরিহাস
করিলেন শুধু।

সকালে চোখ চাহিতেই স্বথেন্দু বলিল, চট করে হাত মুখ ধুয়ে চা
থেয়ে নাও দাদা, কালকের ব্যাপার অনেকদূর গড়িয়েছে।

মানে ?

মানে আমাদের মেস থেকে জনকয়েক সাক্ষী নেবে পুলিশ। লেসি,
ম্যানেজার, আর দু'জন সরকারী চাকরের।

আমার নামটা কেন দিলে ?

আমরা দিইনি—চাকরটাকে জিজ্ঞাসা করতে—

ঘাইতে হইল। নীচের উঠানে—আসামী করিয়াদী দু'পক্ষই হাজির ;
খাসিয়া মেয়েটিও সিঁড়ির ধাপে দেওয়াল ঠেস দিয়া দাঁড়াইয়াছে।
পুলিস ডিপার্টমেন্টের একজন অফিসার ও আধ ডজন লাল পাগড়ী।

খাসিয়া মেয়েরা বাঙ্গালী মেয়ের মত হয়তো ভাবপ্রবণ নহে।
অন্তত মুখে তাহার কোন উৎকণ্ঠার চিহ্ন দেখা গেল না। ছেলেটিও
নির্ভীক। বাহা ঘটিয়াছে—তাহা যেন আর কাহারও সম্পর্কিত এমনই

একটা ভদ্রিতে ও পাড়াইয়া আছে। মুখটা যেন চেনা চেনা বোধ হইল। একটু ভাবিতেই ক্রম নীচে ওর উদ্ধত চোখ দুইটাই আমার স্বভিকে স্পষ্ট করিয়া দিল। রাণাবাট স্টেশনের সেই বীরপুত্রবই বটে!

তারপর প্রাণে উত্তরে বাহা প্রকাশিত হইল, তাহা মোটামুটি
 • এইরূপ :

নাম কি ?

বি, এন, সিং।

বন্দাবন—কেমন ? ছেলেবেলায় হরিশ চাটুজের বাড়িতে চাকর ছিলি ?

না। ছেলেটি বুক ফুলাইয়া অস্বীকার করিল। চাকরি আমি করিনি—

শাটু আপ। তাদের ছেলের গলায় পদক খুলে নিয়ে গা ঢাকা দিয়েছিলি ?

ওরা আমায় মারতো আর গাল দিত কেন ?

তারপর সাইকেলের দোকানে চাকরি ?

না।

চাকরি করিসনি—পনেরো দিন ?

না, চাকর নই আমি। সাইকেল ভাড়া নিয়ে লোকের জিনিস এনে দিতাম।

তারপর সাইকেলের আলোটা নিয়ে একদিন উধাও ?

আমার দু'টাকা ফাঁকি দিয়েছিল বলেই তো—

শাটু আপ। তারপর ট্রেনে ট্রেনে ভদ্রলোকদের জুতো বৃক্ষ করে বেড়ানো ?

কারো চাকরি তো করিনি। উদ্ধত ভদ্রিতে সে অফিসারের পানে চাহিল।

ভারপর পানের ব্যবসা—মাল চালানি—ভারপর পণ্টনে নাম লেখানো।

কোন ঘটনাই সে অস্বীকার করিল না।

কিন্তু পণ্টনে গিয়ে সেখানকার নিয়ম ভাঙলে কি সাজা হয় জানিস তো?

জেনে কি হবে—আমি পণ্টনে কাজ করবো না।

চাকরি বলে বৃদ্ধি! উঃ, কি স্বাধীন বীর পুরুষ রে!

এই ব্যঙ্গোক্তি ছেলেটির সর্কাজ কঠিন হইয়া উঠিল। ঘাড় বাকাইয়া রুঢ়কণ্ঠে কহিল, হাঁ—চাকরি বলেই তো। ভাবলাম যুদ্ধ করাটা একটা মস্ত কাজ! তা দেখলাম—কেরাণীরা যেমন তাঁবেদার, এ তারও বেহুদ!

অফিসার আমাদের পানে ফিরিয়া বলিলেন, একে রাজার নামে আমরা গ্রেপ্তার করলাম। আপনারা সাক্ষী—

এর বিরুদ্ধে চার্জ কি?

নির্দিষ্ট জোনের মধ্যে ছুটি কাটাবার নিয়ম মিলিটারির। ও তা মানে নি। মানে কলকাতার এদিকে আসবার পারমিট ওর নেই। আমাদের কোন লোক সন্ধান পেয়ে এখানে আসে। ও জানতে পেরে তাকে মারপিট করেছে।

মিথ্যা কথা। মদ খেয়ে ও এই মেয়েটার গায়ে হাত তুলতে এসেছিল।

মাথায় ফ্যাটা বাধা একজন লোক উঠানের একপাশে বসিয়া ছিল। এই কথায় আগাইয়া আসিয়া বলিল, খুট বাত। বিল কুল খুট।

যাহা হউক গ্রহরী বেষ্টিত হইয়া ইহারা গুণ্ঠিতোউঠিল। মেয়েটির মুখে সেই নির্জিকার ভাব—ছেলেটির চোখে দগ্ধিত-ভঙ্গি। এই সমস্ত

লজ্জাকর ঘটনা—আইন লঙ্ঘনের শাস্তি ওর বৃকে একটুও জীতির
সম্ভার করিল না। অস্ত্রায় বা অনিয়ম কোনটাকেই ও জ্রক্ষেপ করে
না। হয়তো সে বোধ ওর নাই। তবু কোন্ অটল মর্যাদায় নিঃক্ষে
প্রতিষ্ঠিত করিয়া ওই অশিক্ষিত ছেলেটি সোজা বৃক ফ্লাইয়া গাড়িতে
গিয়া বসিল—তাহাই ভাবি।

দুইদিন পরে পাশের বাড়ির জ্ঞানালা হইতে সত্ত পরিচিত ভদ্রলোক
কহিলেন, শুনেচেন মশাই ছেলেটির কীর্তি! ও সার্ভিস পেকে
পালায় নি—ছুটি পেয়েছিল। তবে যে-মেয়েটাকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিল
—সে হ'চ্ছে সেকেও লেক্‌টেন্যান্ট সাহেবের মিসট্রেস। লেক্‌টেন্যান্ট
সাহেব দেশী পণ্টনের অনেক লোককেই গাল দিতো—অপমান করতো—
বেয়ন্টে দিয়ে খোঁচা দিতো বলে, আমাদের হিরোর ছিল রাগ।
তাই—

আর যে-লোকটা সেদিন হাঙ্গামা বাধালে—

সে হ'লো গিয়ে লেক্‌টেন্যান্ট সাহেবের ডান হাত। ওরই থু
দিয়ে—ঝুলেন না? চোখের ইন্ধিতে ব্যাপারটি পরিস্ফুট হইল।
মাথা নামাইলাম।

বুলাবনের কি শাস্তি হইবে জানি না। বীরপুরুষ বলিয়া ওকে
সম্মান দিতে আমাদের বাধিবে। তবু মনে মনে একবার উচ্চারণ
করিলাম, সাবাস—ছোকরা সাবাস।

জীবনের হুন্ডা

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

পুরো চল্লিশ টাকা'র বই রহমান মিয়াকে ধরে দিয়ে যখন হাত পেতে মাত্র আটটি টাকা নিতে হ'ল তখন কোন্ অশুভুতিটা সুরেনের বড় হয়ে উঠেছিল, লজ্জা না আত্মশ্রমি সেটা বলি শক্ত। হয়ত বা দুটোই—কিন্তু সেটা তখন বিচার করে দেখবার মত অবস্থা ওর ছিল না। রহমানের 'এই পুরোনো বইয়ের দোকানটি বছকালের, সে মানুষ চেনে—সুরেনকে ওর দোকানের পিছনদিককার দোরটো দেখিয়ে দিয়ে একটা ঠেলা দিয়ে বললে, 'চলে বান বাবু, আবার কে এসে যাবে, তখন লজ্জায় পড়বেন!'

লজ্জায়! তা বটে!

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে পিছনের সেই সংকীর্ণ দরজাটি দিয়ে বেরিয়ে এল। এর দোকানের এইটিই বিশেষত্ব একটি মাত্র প্রবেশ পথ নয় ওর। আর এই জন্তই নাকি রহমান অনেকটাকা ভাড়া দিয়ে ঘরটি রেখেছে। বইএর দোকানের যত কর্মচারী মনিবের বই চুরি করে বেচতে আসে তাদের প্রায় সকলেরই এই পথটি জানা আছে, সেইজন্ত তারা অল্প কোথাও বায় না। চেনা লোকের সঙ্গে দেখা হওয়ার সম্ভাবনা এ গলিতে কম।

রাস্তায় পড়েও সুরেন অনেকগুণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল, অভিভূতের মত, প্রস্তরীভূত কোন পদার্থের মত। বিশ্বস্থিগালয়ের বই—ওর মনিব কমিশন পেয়েছেন কেনবার সময় মাত্র শতকরা পাঁচটাকা, তাও নগদ নয়, কতকগুলি বস্তাপচা অচল বই। বিক্রী হ'লে সেলটান্ন হুন্ডা ওর দাম

চল্লিশটাকার বেশীই হ'ত—আর ও পেলে মাত্র আটটি টাকা। এই সামান্য টাকার জন্য মনিবের পাঁচগুণ বেশী কতি করলে ও।

অথচ, ঈশ্বর জানেন, বাধ্য হয়েই একাজ ওকে করতে হয়েছে। সে লেখাপড়া শেখেনি, সামান্য বেতনে বইএর দোকানে কাজ করে বটে তবু সে যে তদ্রসস্থান একথাটা কোনদিনই ভুলতে পারে না। তাই ওর আসেপাশে ধারা কাজ করে তারা এবং এই কলেক্টরদ্বারার অঞ্চলে বত বড় বইএর দোকান আছে সব দোকানেরই কর্মচারীরা যে চুরি করে, তা সুরেনের জানা থাকা সত্ত্বেও সে ওকাজটা করতে পারেনি আজ পর্যন্ত। এমন কি তারা কিভাবে জামার মধ্যে করে পেটকাপড়ের মধ্যে গুঁজে কিংবা শীতকালে গায়ের কাপড়ের মধ্যে লুকিয়ে বই সরায় তা সবই সুরেন জানে, কোন্ বইএর কত দাম পায় সে হিসেবও ওর অজানা নেই। তবু সে নিজে পারেনি এতদিন। অশ্রু যারা একাজ করে তাদের যে ও দোষ দেয় তা নয়—যে সব মনিবরা এই বাজারে কুড়ি, পঁচিশ, ত্রিশটাকা দিয়ে কর্মচারী রাখেন এবং দিনে আট-দশঘণ্টা খাটান, তাঁরা ইচ্ছা ক'রেই চুরিকে প্ররম্ব দে'ন এমন কি চুরি করতে বলেন, এই ওর বিশ্বাস। যে টাকাত্তে আজকাল একটা লোকেরই খাওয়া পরা চলে না, সে টাকাত্তে তাদের সংসার চলছে, এই কি ওরা আশা করেন?

যুদ্ধের সুরোগ নিয়ে সকলকারই আর বেড়েছে। মনিবরা বইএর দাম বাড়িয়েছেন ছাপা কাগজের বায়-বাহুল্যের দোহাই দিয়ে। প্রেসে বারা কাজ করে তারাও দর বাড়িয়েছে আর তা না বাড়ালেও—ওরা বাড়তি কাজ করলেই বাড়তি টাকা পায় তিরকাল! কিন্তু সুরেনদের কি? ডিসেম্বর জীমুরারী নাগাদ প্রায় আড়াই মাস ধরে প্রত্যহ অন্তত ওদের বারো ঘণ্টা ক'রে খাটতে হয়। তার দক্ষণ বাড়তি কিছু পায় কি? কিছু না। কর্মচারী বলেন যে 'অল্প সময় ত ওরা

পড়ে, পড়ে যুঁষোয়, এখন একটু না খাটলে চলবে কেন ?' তবু স্বপ্নের নৈব ত ভাল, এ অকালে সবাই ঠুঁত স্বখ্যাতি করে, তিনি কিছু কিছু দেন—অনেক দোকানে এক পরসীও উপরি পাওয়া যায় না। স্বপ্নের পাঁচ ঐ সময় দু-কাপ চা এবং একখানা টোস্ট আর দু আনা করে জলপানি। এ-ছাড়া বছরে ঐ খাটুনিটার বখলী ব হিসাবেই আটমাসের মাইনে বোনাস।

কিন্তু তাতে কতটুকুই বা হয় ? এধারেও ত উপরি নেই-ই, বাইরে কোথাও যে কিছু বাড়তি উপার্জন করবে তারও উপায় নেই। রাত আটটা পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে, হিসাব মিটিয়ে বেরোতে বেরোতেই সাড়ে আটটা নটা বেজে যায়। আর কীই বা করা সম্ভব ! এমন কি একটা টিউশনী করবারও সময় থাকে না। অত রাতে কে পড়াবে ? বেশী লেখাপড়া তারা জানে না সভ্য কথা কিন্তু একেবারে নীচু ক্লাসের ছেলেমেয়েও ত পড়াতে পারত, আর তাতে কিছু না হোক—এখনকার দিনে পাঁচটা টাকাও অন্তত পেত সে ! দরিদ্রের কাছে পাঁচটা টাকার মূল্যই কি কম। শীতকালে রাত বারোটা পর্যন্ত দু-কাপ চা আর একটা টোস্ট খেয়ে থাকে তবু ভরসা করে জলপানির দু আনা পরসী খরচ করতে পারে না। প্রতিদিন দু আনা জমলে মাসে তিন টাকা সোওয়া তিন টাকা জমে (রবিবার গুলো বাদ যায়) ! তাই কি কম ! ওদের মনিবের বড় ছেলে অমূল্যাবাবু মধ্যে মধ্যে বলেন, 'জলখাবার ত কেউই খায় না—মিছি মিছি বাবা কেন যে' ওটা দেন তা জানি না !' হায় রে, কেন যে এই ক্রিসেটা ওরা চেপে থাকে তা ভাববার চেষ্টাও করেন না ঠুঁত।

রাতার লোক ঐ তাবে স্বপ্নেরকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে একটু বিস্মিত হয়েই তাকাচ্ছিল। একজন খুব কাছে এসে মুখটা ভাল করে

জীবনের মূল্য

দেখে গেল। ফলে সুরেন যেন তদ্রূপ ভেঙ্গে নড়ে চড়ে উঠল, আশে-
আশে গলিটা থেকে বেরিয়ে হ্যারিসন রোড পার হয়ে আমাচরণ
দে ষ্ট্রীট ধরে গিয়ে পড়ল গোলদীঘিতে। ঘরে অসুস্থ সন্তান,
উপবাসী স্ত্রী মুখ চেয়ে আছে, রাতও ওধারে নটা বেজে গেছে,
তবু কিছুতেই সুরেনের বাড়ী ফিরতে ইচ্ছা হ'ল না। কোনমতে
ক্লান্ত পা দুটোকে টেনে নিয়ে গিয়ে জনহীন গোলদীঘির একটা বেঞ্চে
বসে পড়ল। সে চোর, সে চুরি করেছে সেইটাই বড় কথা নয়—
সে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। মনিব যে তাঁর সব কর্মচারীর চেয়ে
তাকে বেশী স্নেহ করেন এবং বিশ্বাস করেন তার প্রমাণ বার-বারই
পেঁয়ছে ও। আজ তার ভাল ক'রেই শোধ দিলে সুরেন!

অথচ আর কীই বা করতে পারত সে?

ছেলেমানুষের মতই নিজেকে সে বার বার সাস্থনা দিতে লাগল।
সে লেখাপড়া শেখেনি, কেন শেখেনি তা আজ আর বলা সম্ভব নয়।
আজকের এই পরিস্থিতিটা সেদিন কিছুতেই বিশ্বাস করেনি বলেই বোধ
হয় সে বাবার তিরস্কার এবং মায়ের স্নেহ অস্বাভাবিক উপেক্ষা করে ইচ্ছল
পালিয়ে ঘুরে বেড়াতে পেরেছিল। ফলে ওর দাখা এবং ছোট ভাই
দুজনেই যথা সময়ে বাবার সরকারী অফিসে ঢুকে গেল কিন্তু ও
পারলে না। তবু বাপ তখনও বেঁচে ছিলেন এবং ভাল মাইনে
পেতেন বলে ওর কোন অসুবিধাই হয় নি—এমন কি সে অস্বা-
বদনে বর সেজে বিয়ে করতেও গিয়েছিল। শুধু বিয়ের পর যখন
একটি সন্তান হ'ল তখন তার জন্ম দুধের, খরচাটাও বাবার কাছে
চাইতে লজ্জা বোধ হওয়ায় ও অনেক ঘুরে এই চাকরীটি সংগ্রহ
করে। সে হ'লও অনেক দিনের কথা—বছর দশ বারো হবে।
তখন মাইনে ছিল মাত্র পঁচিশটি টাকা। তারপর অসুস্থ ও অনেক
উন্নতি করেছে, মনিব সবচেয়ে ওকেই বিশ্বাস করেন, ও-ই নাকি

বেশী কাজের লোক, ‘কাউন্টারে’ সুরেন না থাকলে চলে না, খদ্দেররা এসে সকলে সুরেনকেই খোঁজে—কিন্তু তবু বই-এর দোকানে কতটুকুই বা মাইনে বাড়ি সম্ভব? বায়ো, বছরে ওর মাইনে এসে দাঁড়িয়েছে চল্লিশটি টাকায়—তাই সে দোকানে অত বেশী মাইনে নাকি কাঙ্ক্ষন নেই। এতেই সুবাই সুরেনকে হিংসে করে।

কিন্তু এই পনেরোটাকা মাইনে বাড়তে বাড়তে এখানে অনেক গুল্ট-পাল্ট হয়ে গেছে। বাবা অফিস থেকে রিটারার করলেন, তাতে একটু টানাটানি হ’ল বটে তবু অচল হয় নি। তারপর হঠাৎ তিনি মারা গেলেন—এই বারই সুরেন চোখে অন্ধকার দেখলে। ইতিমধ্যে যুদ্ধ বেধে গেছে—জিনিষপত্র মহাখাঁ হ’তে হ’তে চাকুগুণ পাঁচগুণ দামে এসে দাঁড়িয়েছে, সংসার কিছুতেই যেন চলে না। ঠিক সেই সময়েই দাদা এবং ছোট ভাই সাবধানে চক্ষু লজ্জা বাচিয়ে পৃথক হয়ে গেল। দাদা তথির ক’রে অফিস থেকেই মিলিটারী স্যাকাউন্টসএ বদলী হয়ে গেলেন, শুধু দয়া ক’রে মাকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন। আর ছোট ভাই বড় বাড়ী ছেড়ে দেবার অজুহাত দেখিয়ে সহসা একদিন একটা ছোট ব্র্যাটে উঠে গেল, যাবার সময় প্রসন্ন করলে না মেজদার কী হবে। অবশ্য তাকেও দোষ দেয় না, সুরেন, তার যা বেতন তাতে তার সংসার চালানই কঠিন, এখনকার দিনে অত বিবেচনা করতে গেলে চলেনা। যাই হোক—সুরেন কিন্তু একেবারে চোখে অন্ধকার দেখলে। অনেক খুঁজে কেবাণী বাগানের এই অন্ধকার ঘরটি দশটাকা দিয়ে ভাড়া করে উঠে এল সে, জিনিষপত্র যা ধরল সে ঘরে তাই রেখে বাকী বেচে দিলে। হাতে কিছু নগদ টাকা থাকা ভাল—বোধ হয় এই ছিল তার মনের ভাব।

কিন্তু তারপরই এল মন্বন্তর। চাল পাওয়া যায় না, চিনি

জীবনের মূল্য

পাওয়া যায় না—আটা নেই। কণ্ট্রোলার দোকানে দাঁড়াতে গেলে অফিসের সময় থাকে না, চোর। বাজারে কিনতে গেলে চতুর্গুণ দাম দিতে হয়। তাছাড়া আর কিছু করতেও পারে না, ছেলে-মেয়েরা ছোট ছোট—তাদের দ্বারা কোন সাহায্য হয় না। জিনিষ বিক্রীর টাকা গেল—জীব গায়ে যা হু—একখানা অলঙ্কার ছিল তা গেল—শেষে ঘটি-বাটিগুলোও 'যেতে শুরু হ'ল একে একে। মনিবদের কাছে প্রার্থনা জানাতে তাঁরা আরও অধ মাসের টাকা বোনাস্ দিলেন, বললেন এর চেয়ে বেশী কিছু করা সম্ভব নয় তাঁদের পক্ষে, তাঁদেরও ত ব্যয় এত গুণ বেড়ে গেছে! অথচ তাঁদের ত আর যুদ্ধের চোরাই পয়সা নয়, বই একটু বেশী বিক্রী হচ্ছে ঝটে কিন্তু অল্পপাতে কি ব্যয়টা আরও বেশী নয়?...তা বটে, মানতেই হয় কর্মচারীদের। অল্প অফিসে চাল-ডাল দেবার ব্যবস্থা হ'ল, ওদের সে উপায়ও নেই। ওদের এমন একটা সমিতিও নেই যে এক সঙ্গে মিশে প্রতিবাদ জানায়। চাকরী ছেড়ে দেবারও ভরসা নেই, এই বুড়ো বয়সে হাতের কোন কাজ শিখে যুদ্ধের কাজে লাগা কি সম্ভব হবে? তারপর যুদ্ধ যখন থামবে তখন?

ওদের মনিবদের কী একটা সমিতি আছে, প্রকাশক-সভা না কি! সেখানে নাকি হাজার হাজার টাকা পড়ে আছে, ওরা সেখানে একটা দরখাস্ত দিয়েছিল কিছু সাহায্যের জন্য কিন্তু তাঁরা তা দেন নি। তাঁরা ইচ্ছা করলে অন্তত গবর্ণমেন্টের কাছ থেকে কিছু চাল-ডাল আদায় ক'রে দুর্ভিক্ষের সময় একটু সমর্থনামে দিতে পারতেন, যেমন রেল-অফিস বা কোন কোন কারখানায় করেছিল। হয়ত তাঁরা ব্যবস্থা করলে মনিবরাও অন্তত চক্ষুজ্জ্বার খাতিরে কিছু কিছু টাকা দিতে পারতেন। কিন্তু তা দেওয়া সম্ভব হয় নি। প্রকাশক-সভার বাড়ী হবে, তার জন্য টাকা জমছে। মনে পড়লেও হাসি

গল্প-ভারতী

পায় সুরেনের, এই কটা বইয়ের দোকান নিয়ে প্রকাশক-সভা, তার আবার বাড়ী! যে সভা তার সভ্যদের এমন আপৎকালেও বাঁচাতে পারে না—তাদের সভা থাকলেই বা কি, গেলেই বা কি? ওঁর এক মাস্তুতো তাই, কলকাতার এক বড় ইকুলে সামান্য মাষ্টারী করে, তার মুখেও এমনি একটা কথা শুনেছিল ও। তখন বোমা পড়ার হিড়িক, ইকুল প্রায় বন্ধ, অথচ জিনিষের দাম বেড়েই চলেছে। স্কুলের কর্তৃপক্ষ মাষ্টারদের মাইনে কমিয়ে শতকরা কুড়ি-টাকায় ঠাড় করােন তবু বাড়ী তৈরীর তহবিলে যে ছিন্নান্তর হাজার টাকা জমেছিল, বর্তমান ইকুলের কাছাকাছি জমির অভাবে সে বাড়ী তৈরীর সম্ভাবনা সূদূর-পরাহত জেনেও, তা থেকে কয়েক হাজার টাকা খরচ ক’রে সে দুদিনে বা তার পরে ছুটিশকের সময় মাষ্টার মশাইদের বাচিয়ে রাখতে পারেন নি তাঁরা!

যাক্ গে—ওসব বাজে কথা ভেবে লাভ কি!

‘বিবেকের দংশন’ যাকে বলে সাধু বাংলায়—তাই কি আজ অনুভব করছে ও? কিন্তু না, জোর ক’রে বললে মনে মনে, না—বিবেক ওর পরিষ্কার আছে। যতদিন একটি পরসায়ও সংস্থান করতে পেরেছে সে, ততদিন এক কড়া-ক্রান্তিও চুরি করে নি। আজ তার ঘরে খাবার মত একটা পেতল-কাঁসার বাসন নেই, স্ত্রীর দামী শাড়ী সবগুলি বিক্রী হয়ে গেছে। তার আর ছেলেমেয়েদের কতকগুলো গরম কোট ছিল (ওর বাবার আমলের) তাও আর অবশিষ্ট মেই। আত্মীয় স্বজনরা প্রায় সবাই দরিদ্র, তবু তাদের পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা সাহায্য করেছে তারা। বন্ধু-বান্ধব, এমন কি ওর অকিসের হিন্দুস্থানী চাকর ময়ু, তার কাছেও ধার করতে বাকী রাখে নি। এখন এমন দিন এসেছে যে আর কোথাও কিছু পাওয়া সম্ভব নয়। অথচ বাড়ীতে দু’টি সাংখাতিক রোগী,

জীবনের মূল্য

বড় ছেলেটির টাইফয়েড, মেজ মেয়েটির রক্ত আমাশা। জী বহু দিনট একবেলা খাওয়া ত্যাগ করেছে—আর একবেলাও বোধ হয় পেট ভরে খেতে পারেনা বেচারী। একখানি তার শাড়ী, সাবান দিয়ে কেচে কেচে পরে, শাড়ী যখন ভিজে থাকে গামছা পরে শুণোতে হয়। তা-ও সংগেছিল কিন্তু আজ আর ঘরে কিছু নেই। তাদের ত নেই-ই—রোগা ছেলে-মেয়েগুলোর পথি়া বলতেও কিছু নেই। পাড়ার হোমিওপ্যাথ ডাক্তার বিনামূল্যে ওষুধ দেন কিন্তু পথি়া কোথায় পাওয়া যায়? ছেলেটাকে মূকোজ না খাওয়ালে কিছুতেই বাঁচানো যাবে না, মেয়েটার জন্ম চাই বালি। ওদের বাড়ীর মধ্যে উপর তলায় একঘর ভাড়াটে ছিল, তাদের একটি আঠারো উনিশ বছরের ছেলে কলেজে পড়ত—সে এই রকম সময়ে অনেক-বার নিজের টিউজানের টাকা থেকে মিত্রী বালি এনে দিয়েছে কিন্তু ভগবানের বোধ হয় তা-ও সইল না—সে ছেলেটি গত নভেম্বর মাসে রাস্তায়-গুলি খেয়ে মারা গেল!

সত্যিই আজ আর কোন উপায় ছিল না। জীবনের উপর বীতশ্রক হয়ে গেছে স্মরেন। যা কিছু সং, যা কিছু জ্ঞায় তার প্রসঙ্গ-মাত্রই আজ উপহাসের বস্তু ওর কাছে। ওর মনিবরা মাইনে হিসেবে অনেক টাকা নিয়ে—বহু খরচা দেখিয়েও এ বছরে নাকি, ঘরোয়া অভিতে দেখা গেছে প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা লাভ করেছেন। এই লাভটাকে কী কীরে কম দেখানো যায় তারই মন্তব্য চলেছে আজ ক'মিন ধরে বাপ-বেটার—এ' নিজে কান্নে শুনেছে স্মরেন। অর্থাৎ ওদের দোকানে চাকর নিয়ে মোট উনিশজন কর্মচারী, একমাত্রের মাইনে বোনাস দিলেও পঁচিশ' টাকার বেশী খরচা হ'ত না। একথা সে তাঁদের বলেনি অবশ্য—বলতে যুগা বোধ হয়েছে—কিন্তু বললেও ফল হ'ত না, তা সে জানে। স্মরণ

ভগবান বলে যদি কেউ থাকেন ত, তিনি নিশ্চয় বলবেন যে আজ যখন ওর রোগা ছেলে-মেয়ের পথের সংস্থান নেই, একটু মৃকোজের অভাবে ওর প্রথম সন্তান মরতে চলেছে, স্ত্রী তিন দিন অনাহারে তখন এই বই বেচে টাকা নেওয়াতে আর যাই হোক—চুরির অশ্লাঘা ওকে স্পর্শ করে নি। বিশ্বাসঘাতকতা? তাও তিনিই ক্ষমা করবেন, মনের কাছে অস্বীকার করবে না ও—কিন্তু লজ্জিতও হবে না।

এক রকম জোর ক'রেই উঠে পড়ল স্ত্রেন। রাত অনেক হয়েছে—নটা বেজে গেছে অনেকক্ষণ। ধোকন তার শীর্ণ শরীরের সবটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করে কীদছে হয়ত—খুকীটা কৈদে কৈদে বুঁমিয়ে পড়েছে, সরমা হয় তো তাদের রোগ-শয্যার পাশে চুপ করে বসে আছে নয়ত কপাটটা ধরে তারই পথ চেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এতটা রাত করাই ওর উচিত হয় নি—একটু অস্বাভাবিক হয়েছে বরং।

কিন্তু, চলতে চলতে ওর বিস্ময়, বিব্রোহী অন্তর এই কথাটাই দার দার বলতে লাগল, আর পারে না ও, আর পারছে না। এতদিন কি করে পেয়েছে তাই ভাবতেই অবাক লাগে, হয়ত একটা অভ্যাগে, কিছু না ভেবেই ভারবাহী বলদের মত সব কিছু সহ্য ক'রে এসেছে। কিন্তু এইবার মনে হচ্ছে, আর কেন? এমন ক'রে বেঁচে থেকে লাভ কি? “ছেলে-মেয়েদের কি হবে? মরে গেলে আর সে ব্যবসার দরকারও হবে না।

তাবতে ভাবতে ওর উদ্ভগ্ন মস্তিষ্ক আশ্রয় উদ্ভিজিত হয়ে ওঠে। আচ্ছা, এক কাজ করলে কি হয়—একটা মোটা রকম ইন্সিওর ক'রে যদি আত্মহত্যা করে? সে বুঝি তেরোমাস না গেলে মজুর

জীবনের মূল্য

নয়। আত্মহত্যা বলে যদি আত্মহত্যা না করে—সেই না কেমন হয়? হঠাৎ একটা মোটর গাড়ীর সামনে পড়ে যাওয়া—সবাই জানবে দুর্ঘটনা? কিংবা অত করারই বা দরকার কি! প্রায় রোজই, একটু মোটা টুকু থাকলেই, কর্তা তাকে ব্যাক্সে জমা দিতে পাঠান। সেই টাকাটা বাড়ীতে জ্বর হাতে দিয়ে এসে যদি আত্মহত্যা করে? অবশ্য হাজার কি দেড় হাজার টাকায় তার বেশী দিন চলবে না সত্য কথা, কিন্তু হেরেন মারা গেছে জানলে ওর দাদা বা ছোট ভাই হয়ত কিছু কিছু সাহায্য করতে পারে নইলে অনাথদের রাস্তার লোকও অন্তত দেখবে। সে আছে বলেই ত তারা ভিক্ষা করতে পারে না। আর তা ছাড়া সে যা হয় হবে। অত ভাবতে পারি না, সে আর এই কষ্ট কিছুতে সহ্য করবে না। এ জীবনের—এ বেঁচে থাকার মূল্য কি?

সত্যি ভাবে ততই এই কথাটা বার বার মনে হয় ওর—জীবনে ওর আর কোন স্বপ্ন, আর কোন স্বচ্ছন্দ্যের আশা নেই। ছেলেরা বলে বড় হয়ে উঠবে তার ঠিক নেই—বড় হলেও মানুষ হয়ত হবে না, কে করবে? স্ততরাং সে ভরসা নেই। মিছি-মিছি এই—আশাহীন, আনন্দহীন, বর্ণহীন জীবন সে আর ক’দিন বইবে, লাভ কি? ম’লে কী হবে তা সে ভাবে না, নরক যদি বা থাকে, সেখানে প্রতিদিনের অন্নসংস্থানের এমন বিড়ম্বনা ত সহ্য করতে হবে না! এ বেঁচে থাকার চেয়ে আত্মহত্যার পাপে নরকে যাওয়াও ভাল—

চোখ জ্বলতে থাকে হেরেনের, উদ্ভক্তনায় বুকের মধ্যে টিপ্ টিপ্ করে। ঠিক হয়েছে, আর না! অব্যাহতির পথ, মুক্তির পথ সে পেয়েছে। আর একটা কি দুটো দিন! এর মধ্যেই সে ঠিক করে ফেলবে। এ ভিক্ততা থেকে, এ নিরবচ্ছিন্ন নিরানন্দ থেকে মুক্তি পাবে ও!

ঘরের দোর ঠেলে ভেতরে ঢুকেই কিন্তু স্নরেন চমকে ওঠে। অনেক—অনেকদিন পরে, বোধ হয় এক যুগ পরে উজ্জল মুখে দাঁড়িয়ে আছে সরমা। পরণে ওর একটা ধোঁওয়া নতুন শাড়ি, পায়ে আলতা কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। বড় স্নরনের মূনিগেছে ওকে কিন্তু, মনে হচ্ছে যেন দশ বছর আগেই ফিরে গেছে সে—বয়সও এত কম দেখাচ্ছে!

কিন্তু ব্যাপার কি?

কিছুই বুঝতে পারেনা স্নরেন। হতভয়ের মত, অভিব্যক্তির মত বিহ্বল দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে। সারাদিন একটা একটানা মানসিক অন্ধকারের মধ্যে সে ছিল, তারপর হঠাৎ এই উজ্জলোর আবহাওয়াতে এসে যেন তার চোখও ধাঁধিয়ে গেছে। ভাল কল্প দেখতেও যেন পারছে না—

সরমা ওর দৃষ্টির দিকে চেয়ে একটু লজ্জিত হ'ল। কাছে এগিয়ে এসে বললে ‘ওপরের মিস্তির গিন্নির বৌ আজ একাদশীর ব্রত নিলে। আমাকে দিয়েই নিলে কিনা—এই নতুন কাপড়খানা, আলতা-সিন্দুর সব দিয়েছে। এধারেও আজ শুভ খবর আছে বলে মনটাও ভাল ছিল—তাই সব আবার এবেলা পরলুম, তোমাকে চমক লাগিয়ে দেবো বলে—’

আন্তে আন্তে স্নরেন প্রশ্ন করলে, ‘এধারের শুভ খবরটা কি?’

‘খোকার অর আজ একদম রেমিশন হয়ে গেছে।’

‘একেবারে ছেড়ে গেছে?’ শুনেও বিশ্বাস হতে চায় না ওর।

‘একেবারে।’

‘আর খুকী?’

‘খুকী বার-তিনেক পায়খানা গেছে ষটে—তবে রক্তটো আর নেই।’

স্নরেনের হাত থেকে জিনিষগুলো নামিয়ে নিতে নিতে সরমা

জীবনের মূল্য

বললে, 'এট যে তুমিও মূকোজ পেয়েছ। স্মারক ঠাকুরপো এসেছিলেন কার মুখে যেন খবর পেয়ে—এই একটু আগে। তিনিও একটা প্যাকেট দিয়ে গেছেন।'

'মোহিত এসেছিল? বল কি?'

• 'হ্যাঁ—কী ভাগ্যি। অফিসে যেন কার মুখে খবর পেয়েছিল খোকার 'অস্থির'।' তারপরই সুরেনের মুখের অপরিণীত স্তম্ভতার দিকে নজর পড়তে বলে উঠল সরমা, 'ইস্ তোমার মুখখানা কি হয়ে গেছে গো— যেন এক বোতল কালি কে ঢেলে দিয়েছে। ব'সো ব'সো—জামা পরে ছেড়ো, এখন একটু জল খাও আগে—'

বিশ্বয়ের ওপর বিশ্বয়। একটা ভিজে গামছা ক'রে ওর মুখটা মুছে নিয়ে সরমা কোথা থেকে একটা সন্দেশ এনে ওর মুখের কাছে ধরলে।

'এ আবার কি?'

• 'হ্যাঁ মশাই! দস্তরমত আমার রোজকার আজ। ওরা দিয়েছিল— ব্রতের মিটি। চারটে সন্দেশ ছিল, একটা বাচিয়ে রেখে দিয়েছি তোমার ভক্তে—আবার দু'আনা পরসাদ পেয়েছি, দক্ষিণা!'

সুরেনের তখনও স্তম্ভিত ভাব কাটেনি, সে তেমনি অভিভূতের মতই বসে একটু একটু ক'রে সন্দেশটা খেতে লাগল। তবে কি এখনও কিছু মাধুর্য আছে জীবনে? কিছু আলো?

সহসা ওর পাশে বসে পড়ে সরমা নিবিড় ভাবে ওর হাঁটুটা জড়িয়ে ধরে বললে, 'কী অত ভাবছ গো? সবাই ত ভাল আছে, তবে অত ভাবনা কেন?'

সুরেন যেন ঘুম থেকে জেগে উঠে একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'তোমাকে বেশ মানিয়েছে—তাই ভাবছি!'

'কখনও তা ভাবছ না—সত্যি ক'রে বলে দেখি।'

গল্প ভারতী

একটুখানি চুপ ক'রে* থেকে স্নেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'এখানে আসবার আগে কী ভাবছিলুম জান সরমা, ভাবছিলুম আমি আত্মহত্যা করব! আর সইতে পারছিলুম না।'

সরমা শিউরে উঠল সেন। তারপর রাগ ক'রে ওর হাঁটুটা চেঁলে দিয়ে গাঢ়কণ্ঠে বললে, 'পুরুষ এমনি স্বার্থপর বটে। আমার* কষ্ট কিছু কম আছে, না? আমারও অনেকবার ইচ্ছে হয়েছে যে মরে সব জালা জুড়োই কিন্তু পারি নি তোমার জন্তেই। মনে হয়েছে যে অকিস ক'রে আবার ছেলে-মেয়েদের স্লাম্‌লাবে কি ক'রে জুঁমি—একা মাহুৰ, বড় কষ্ট হবে। অবস্থাও ভাল নয় যে আর একটা বিয়ে করবে। সত্যি বলছি—এই মনে ক'রেই আমার মরা হয় নি কখনও!'

স্নেন জোর ক'রে ওকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, 'অজায়* হয়েছিল—এবারে মাগ করো, আর কখনও এমন ভাব না।'

—

দুজন আধুনিক কথ্য বলছে। অবশ্য স্বামীদের সম্বন্ধে।

একজন বলছে, সত্যি ভাই, সারারাত উনি যে বাইরে কাটান, তা সেদিনও পর্যন্ত জানতাম না!

—জানলি কি ক'রে?

—যঠাৎ সেদিন আমি রাত আটটার সময় বাড়ী ফিরে দেখি, বাড়ীতে নেই!

•
•
•

—না—

শ্রীআশাপুর্ণা দেবী

দেগা হওয়াটা অপ্রত্যাশিত।

ঘূর্ণমান পৃথিবীর বিশেষ কোনো চক্রান্তে যে—হঠাৎ একদিন দু'জনে এ রকম মুখোমুখি হয়ে যাবে একথা কি কোনোদিন ভেবেছিল রাজ্যাত্মী ? না, ঘুমন্ত মনের অস্বীকৃত চেতনাতেও চেয়েছিল কোনোদিন ?

পাগল ! শনিগ্রহকে কে দু'বার চায় ?

তবু দেখা হয়ে গেল।.....পরিবেশটা নূতন নয়, আশঙ্কার লেশমীত্রও অবকাশ ছিলনা.....নিত্যকার মতই স্কুলের গেট থেকে বেরিয়ে স্লরকি ফেলা লাল রাস্তাটা ধরে বাসায় ফিরছিল রাজ্যাত্মী, “বাবু” পিছলে ছুটে গিয়েছে অনেকটা এগিয়ে—মোড়ের বাক ঘোড়ার সঙ্গে সঙ্গে চোখছাড়া হয়ে যেতেই রাজ্যাত্মী চোঁচিয়ে ডাক দিলে—
এই ছুটু শয়তান, দাঁড়া ওইখানে—

ঠিক সেইসময় মোটর বাইকখানা স্বাভাবিক কুশ্রী গর্জ্জন করতে করতে পিছন থেকে এসে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো রাজ্যাত্মীর পাশেই।
.....রাজ্যাত্মী গ্রাহ্য না করেই এগিয়ে যাচ্ছিল, কে একটা লোক হঠাৎ চলতে চলতে থেমে গেল কেন, টারার ফাটলো কি চেন হিড়লো তার সম্বন্ধে কিসের বা কোতূহল রাজ্যাত্মীর ? ছেলেটাকে সামলে নিয়ে বাসায় ফিরতে পারলেই ষাঁচে সে।

ছোট্টছেলে, একরত্তি ছেলে, মেয়ে-স্কুলেই যে এখনো দু'বছর পড়তে পারে তা'কে নিয়ে রাজ্যাত্মী একেবারে নাজেহাল। স্কুল থেকে বাসা এই পথটুকু যেড়ো আগতে দু'টা বেলা জঙ্গ করে ছাড়ে ওকে দ্রুত ছেলে।

ইন্ফ্যান্ট ক্রাশের ছাত্র 'ভিনটে বাজতেই ছুটি হয়ে যায়, স্কুলের চাকরের সঙ্গে বাড়ী পাঠিয়ে দেওয়া, শক্ত নয় তবু রাজ্যত্নী প্রাণ ধরে ছাড়তে পারে না। নিজেও, উচুক্রাশে পড়ায় সাড়ে চারটের আগে ছুটি হয়না—এই সময়টুকু স্কুলের গণ্ডিতে, আটকে রাখবার ক্ষমতা দারোরানের সঙ্গে আছে বন্দোবস্ত।.....সুধু দরস্ত বলেই বা কি? বাসার কে আছে রাজ্যত্নীর? ও নিজে গিয়ে চাবি খুলবে তবে তো? মা আর ছেলে এইতো সংসার।

লাল সুরকির রাস্তাটা রেখায়িত হয়ে মিলিয়ে গেছে দূর সীমান্তে...
.....চোখের দৃষ্টি খানিকদূর গিয়ে থেমে যায়.....ওদিকটা 'নাবাল' অনেকটা উঁচু থেকে হঠাৎ ঢালু হয়ে গড়িয়ে গেছে।.....চাঁবার মেয়েরা যখন বড় বড় চ্যাপট গড়নের বেতের ডালার উপর শাক-সজি আনাজ-পাতি চাপিয়ে ওদিক থেকে এদিকে আসে বেচতে, তা'দের মাথার ওই ডালাটাই চোখে পড়ে সকলের আগে।.....ক্রমশঃ স্পষ্ট হতে থাকে মুখ বুক সর্ব শরীর, নীটোল চিকণ বাহর দোলানি, আর কাটাচটা পায়ের কুশীড়া।

এদিকটা আধা-সহর স্কুল পোষ্টাকিস হাঁসপাতাল বাজার দোকান—
ইত্যাদির মফস্বলি সমারোহ। ওদিকটা গ্রামের পথ। ওই পথ চলতে বাহাতি পড়ে রাজ্যত্নীর নিজের—একান্ত স্বাধীনতার ছোট্ট বাসাটুকু।
.....অনেক ঝড়ঝাপটা সয়ে অনেক বন্দরে ঠোঁকর খেয়ে এইখানে এসে পেয়েছে একটু নিশ্চিন্ত আশ্রয়, পেয়েছে একটা শক্তখুঁটি সোতে ভাসা নৌকাটা বাঁধতে।.....

বাংলার বাইরে প্রায় অখ্যাত এই ছোট্ট সহরে সৃজিতের যে কখনো কোনোকাজ পড়তে পারে, দরকার পড়তে পারে—উদ্দাম বেগে মোটর-বাইক ইঁটকিয়ে আসবার—সেইটাই সুধু আশঙ্কা করেনি কোনোদিন।



তবু—কোনো অশটনই অসম্ভব নয় পৃথিবীতে, সেই হিসেবেই ধরে নিতে হবে ওদের এই অপ্রত্যাশিত দেখা হওয়াটা।

রাজ্যস্রী নিজের উষ্মে এগিয়ে যাচ্ছিল, চমকে উঠলো স্রুজিতের কণ্ঠস্বরে। ক্রমশঃ দ্বিগুণে মুখের ঘাম আর ধুলো মুহূর্তে মুহূর্তে স্রুজিত প্রায় ওর পথ রোধ করে দাঁড়িয়ে পড়ে বিস্মিত প্রশ্ন করছে—

• তুমি ? তুমি এখানে ?

রাজ্যস্রী মুহূর্তে বিরক্তে সামলে নিয়ে ঈষৎ কঠিন স্রুয়ে হাসির আভাস মিশিয়ে বললে আশ্চর্য্য হ'বার কি আছে ? বেঁচে বখন আছি—পৃথিবীর কোনো একটা জায়গায় তো থাকতেই হবে !

—তবু আশ্চর্য্য হচ্ছে স্রী, এমন করে হঠাৎ যে তোমার দেখতে পাবো এ ভাবিনি।

—অনেক অভাবনীয় ব্যাপারই তো সংসারে ঘটেছে—এ তারই একটা। কিন্তু সরো—আমার দাঁড়াবার অবসর নেই।

—এক মিনিটও আর তোমার অবসর নেই স্রী ? পথ থেকে তাড়িয়ে দেবে ?

—তাড়ানোর কথা হচ্ছে না—রাজ্যস্রী উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি বতনুর চলে প্রসারিত করে চঞ্চলভাবে বলে—“বাবলু” একলা এগিয়ে গেছে—দ্রুত ছেলে—সরো আমি যাই।

স্রুজিত একটু সরে দাঁড়িয়ে স্তানভাবে বলে—সরে তো বাবোই স্রী, তোমার পথরোধ করি এ ক্ষমতা নেই, কিন্তু কি নাম বললে—“বাবলু” কে সে ?

—সে ? সে আমার নিদির ছেলে।

—নিদির ? পুরস্রীর ছেলে ? তোমার কাছে ?

—না না আমার সামান্যতো বোন, তাকে চেনোনা তুমি—জ্ঞাত-
পায়ে প্রায় ছুটে চলে রাজ্যলী।.....

কিন্তু কোথায় সেই দূরন্ত শিশু? কোনখানে যে
দেখতে পাচ্ছে না রাজ্যলী। এতটুকু সময়ের মধ্যে কোথায় হারিয়ে
গেল! স্বজিতের উপস্থিতি ভুলে রাজ্যলী চীৎকার করে ডাকে...
ছেলের নাম ধরে। জনবিরল পথে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে
তার ডাক। কী কক্ষণেই আজ স্থল থেকে বেরিয়েছিল সে...কী
কক্ষণে দেখা হ'ল স্বজিতের সঙ্গে! তার জীবনে কি বার বার শুধু
শনি হয়েই দেখা দেবে স্বজিত?

আশে পাশে কয়েকটা বাড়ী জনশূন্য। স্বাস্থ্যকর হান বলে
কলকাতার বড়লোক সম্প্রদায় যেখানে সেখানে একটা একটা বাড়ী
খাড়া করে, রেখেছে তালা খুলিয়ে। কোথাও বা আর একটু
স্বাবস্থায় আছে মালি। এমন একটা বাড়ীর গেটের কাছে এসে
রাজ্যলী উৎসুক ডাক দেয়—দেওদাস! দেওদাস!

কাছেই কোথাও ছিল মালিটা, এসে আত্মনি সেলাম করে
দাঁড়ালো।

—খোকাধাবু আয়া-হায়া দেওদাস?

—নেহি মাইজী!

বাগানের ফুলের মধ্যস্থতায় দেওদাসের সঙ্গে 'বাবলু বাবু' কিছু
হৃদয়তা আছে।

রাজ্যলী কাতরভাবে অহরোধ জানায়, তাকে বাগানে একটু
অবসরকান করতে, ছুটুছেলে যদি অলক্ষ্যে ঢুকে পড়ে থাকে।...কিন্তু

২.

কই ?... নেই নেই কোথাও নেই... একবার চোখের বাইরে চলে গেলেই
বুঝি মনে হয় কোনোখানেই আর নেই, একেবারে হারিয়ে গেছে,
নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পৃথিবী থেকে।... মার প্রাণের কেনো এই
ব্যাকুলতা ? কেন এমন অস্বাভাবিক অমঙ্গল আশঙ্কা ?

বাবলু ! বাবলু ! কোনোদিনই বুঝি সাড়া দেবে না আর।

৬

নিজের বাড়ী ছাড়িয়ে অনেকটা দূর চলে যায় রাজ্যশ্রী আবার
ফিরে আসে। বার বার করে আনা-গোনা।... দূরে গিয়ে মনে হয়
বাড়ী গিয়ে হাজির হয়েছে হরতো—বাড়ীর কাছে এসে প্রাণ হা হা
করে ওঠে।... কিন্তু চাষি তো রাজ্যশ্রীর নিজের কাছেই ছিল, কিসের
আশায় সে বার বার শোবার ঘর রান্নাঘর উঠোন আর কুয়োতলায়
ঘুরে দেখছে ?... হুজিত যে তার সঙ্গে এসেছে... বাড়ীর বাইরে
দাড়িয়ে আছে সে খেরালও নেই রাজ্যশ্রীর।... দেখা ভায়গাই
আবার দেখছে আর নিজের কণ্ঠের ভাঙা ভাঙা কাতর ডাকে
নিজেই শিউরে উঠছে।... হঠাৎ একটা সম্ভাবনায় সমস্ত শরীর অবশ
হিম হয়ে আসে রাজ্যশ্রীর।... নিশ্চয়ই তাই ! গোলাপ গাছওয়ালা
সেই বড় লাল বাড়ীটার বাইরের উঠানে যে প্রকাণ্ড ইদারটা
আছে নিশ্চয়ই তার কানায় উঠে উকি মারতে গিয়েছিল সে।
বাম তারপর—উঃ সেই নিশ্চিত পরিণতির কথা ভাবতেও পারে
না রাজ্যশ্রী, স্নেহ পাগলের মত ছুটে আবার পথে বেরিয়ে আসে।

৮

হুজিত এতক্ষণ আর কোনো কথাই বলে নি, স্নেহ ইত্যতনের
মত রাজ্যশ্রীর অঙ্গসংলগ্ন করছিল মাত্র। ওয় আমার সঙ্গে সঙ্গেই
যে এরকম একটা নাটকীয় ঘটনা ঘটবে এমন আশা করে নি।...
কিন্তু পরের ছেলের জন্তে রাজ্যশ্রীর কী অস্বাভাবিক ব্যাকুলতা !...

৯

আবার তাকে ও রকম এলো-মেলো হয়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে আসতে দেখে হুজিত আর স্থির থাকতে পারে না, কাছে গিয়ে দৃঢ়স্বরে বলে—তুমি একটু শান্ত হয়ে বোসো শ্রী, আমাকে একটু খুঁজে দেখতে দাও ।

—তুমি ? তুমি কি করে খুঁজবে ? তুমি তো তাকে চেন না ? হতাশায় ভেঙে পড়ে রাজ্যশ্রী ।

—চিনে নেব । নিজের ছেলেকে চিনে নেওয়া হয় তো শক্ত হবে না ।

—কী ? কী বললে তুমি ?...আচম্কা আগুনের মত ঝলসে ওঠে রাজ্যশ্রী—তুমি যাও, উপকারের ছলে আর আমার সর্বনাশ ডেকে এনো না । কেন তুমি এসে আমার সামনে দাঁড়ালে ? কেন দেবী করিয়ে দিলে ? তাই তো হারিয়ে গেল সে, চোখের বাইরে চলে গেল । চিরদিনই কি তুমি আমার সঙ্গে শত্রুতা করবে ?

—আমার ভাগ্যলিপি ! কিন্তু যাক, সন্ধ্যা হয়ে এসেছে শুধু পাগলের মত ছুটোছুটি করে আর রাস্তার বাজে লোককে জিগেল করে কোনো লাভ হবে না ।...বাইকটা নিয়ে আমি দেখছি—কি নাম বললে—বাবলু ? আচ্ছা বয়স কত ?

—পাঁচ বছর । প্রায় অশ্বটুকুরে উচ্চারণ করে রাজ্যশ্রী ।

—পাঁচ ! পাঁচ বছর—

নিজের মনে কি বেন একটা হিসাব মিলিয়ে নিয়ে আধমিনিট পরে বললে হুজিত—কি জামা পরা আছে ?

—খাকি শ্রুট । কাবুলি ছুতো—কার্টে, কৌকড়ানো চুল, ফর্সা—খুব ফর্সা রং—দেখলেই চিনতে পারা যাবে—সোনার পুতুলের মত ছেলে !

হুজিৎ যেন করনার একবার দেখে নেয় সেই স্বর্ণকাস্তি শিত-
টাকে...অন্তমনস্তের মত একবার নিজের ধবধবে কদম্বা নিটোল বাহর
দিকে তাকিয়ে দেখে...তারপর ফিরে চলে নিজের মোটরবাইক
খানার কাছে। পথের মাঝখানে পথচারীদের কৌতুহল আকর্ষণ
করে এতক্ষণ পড়েছিল যেটা।

কিন্তু এক মিনিট যে একবৃগ রাজ্যাত্মীর কাছে...কতক্ষণ আর
অপেক্ষা করবে সে, সফার অক্ষকার যে বলিয়ে এল।...হুজিতকে
বিশ্বাস কি? তাকে মিথ্যা ত্রোক দিয়ে ভুলিয়ে নিজের কাজে
চল্ল্যে গেল কি না কে জানে? হুজিতের ভরসায় কেনই বা বসে
থাকবে রাজ্যাত্মী?...এতক্ষণ স্থলের দারোয়ান চাকর আর মালিদের
বললে তারা চারদিকে বেড়িয়ে খুঁজে আনতে পারতো।...কিন্থা—
কিন্থা ইদারায় নেমে...তার পরের কথাটা আর স্পষ্ট করে ভাবতে
পারে না রাজ্যাত্মী...স্থু চোখের সামনে ভেসে ওঠে ওর বাবলুর
অচৈতন্য দেহ...জুতো জামা সমস্ত ভিজে ভারী হয়ে গেছে...কিন্তু
অতটুকু ছেলে দু-বটা জলে পড়ে থাকলে বাঁচে?...কই হুজিতকে
তো সে বললে না এই সর্বনাশা সন্দেহের কথা? হয় তো তখনো
তুললে বাঁচানো যেতো। অবশেষে আর কোনো কিছুই ভাবতে
পারে না রাজ্যাত্মী, নিজেই অচৈতন্যের মত বাইরের রোয়াকেই শুয়ে
পড়ে।.....

কিন্তু কতক্ষণ-ই বা...রাজ্যাত্মীর কাছে সহস্রবৃগ মনে হলেও ঘড়ির
হিসেবে বেশী নয়, আধঘণ্টা পরেই হুজিতের মোটর-বাইকখানার
গর্জনে শোনা গেল...উত্তরোত্তর...কাছে আসছে...কিন্তু না রাজ্যাত্মী
চোখ খুলবে না, প্রস্রাব দেবে না হুজিতকে।...সুযোগ দেবে না
তাকে গদগদ হেহের ভাণে শোকে সাধনা দেবার। গর্জনটা

থেমে গেল...সুধু একটু ফৌস-ফৌসানি...পরক্ষণেই মিহি বাণীর মত বোজা উঠলো বাবলুর অভিমান-স্কন্ধ কণ্ঠস্বর—না কক্ষনো যাবোনা আমি মার কাছে—কক্ষনো না। ছেড়ে দাও আমাকে—ছটফট করে নেমে পড়ছে সৃজিতের কোল থেকে।

ধড়ফড় করে উঠে বসে রাজ্যাত্মী।...স্বপ্ন দেখছে না কি? না সত্যিই যে অক্ষত সুন্দর সোনার পুতুলের মত ছেলে সৃজিতের কোল থেকে নেমে পড়বার ক্ষণে ধবস্তাধবস্তি করছে। সৃজিতের মুখে বিপন্ন হাসি।.....

রাজ্যাত্মী ছুটে এসে প্রায় ঘেন ছিনিয়ে নেয় ওর কোল থেকে... যেন সৃজিতই কেড়ে নিয়েছিল তার ছেলেকে।

এর পরের ব্যাপারটা চমৎকার!

বাবলু হঠাৎ প্রবল বিক্রমে মাকে দু'হাতে মারতে শুরু করেছে... অভিযোগেরও অভাব নেই—কেন তুমি আমাকে খুঁজে পেলেনা?... কেন তুমি আমাকে খুঁজে পেলেনা?...আমি তো সুধু একটু হুকিয়ে ছিলাম—তুমি কেন দরজা খুলে আনলেনা?...আমি যে কিছুতেই খুলতে পারছিলাম না। আমায় খালি খালি বশা কামড়াচ্ছিল—

একরত্তি ছেলের জোয়ের কাছে রীতিমত পরাস্ত হয়ে পড়ে রাজ্যাত্মী।

নাঃ, আর দাঁড়িয়ে দেখা চলেনা—সৃজিত ওকে টেনে নিয়ে ধরে ফেলে আড়কোলা করে তুলে নিয়ে বলে—ছিঃ ছিঃ তুমি মাসীকে মারো? এমন ছুটু ছেলে তুমি? চলো আবার তোমার সেই ভাঙা বরে বজ্র করে দিয়ে আসি—সাংখ্যাতিক ছেলে ঐঃ।

কিন্তু বাবলুর তখন একটা খটকা লেগেছে—রাগ তুলে আশ্চর্য্য হয়ে দলে—কই মাসীকে মেরেছি? মাসী তো ইস্কুলে—

স্কুলের অপর কোনো দিদিমনির কথা শ্রবণ করেই বোধ করি কথাটা বলে।

সুজিত সামান্য হাসির সঙ্গে বলে—ওই তো তোমার মাসী, জিগোস করে ওকে।

—ইস্ মাসী বইকি? থাকে বলছে মাসী, জানে না কিছু না বোকা।

এতক্ষণে একটু ধাতস্থ হয়ে সুজিতের দিকে চেয়ে দেখে।...এরকম বুদ্ধিহীন লোককে আর ভয় করবার কি আছে? মোটর-বাইকের অধিকারী হিসেবে যেটুকু শ্রদ্ধা সম্মান দেওয়ার কথা উঠতো, অনায়াসেই সেটা তুলে নেওয়া যায়।

রাজ্যাত্মী যতক্ষণ ছেলে হারিয়ে উদ্ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করছিল ততক্ষণ বয়ঃ সহজ হয়েছিল সুজিতের সঙ্গে কথা কওয়া, এখন সুস্থ সহজ ছেলেকে অনায়াসে পেয়ে গিয়ে লজ্জা এসে আট্টেপুটে চেপে ধরে।...দীর্ঘদিন অসাক্ষাতের লজ্জা...ক্ষণপূর্বের পাগলামীর লজ্জা...ছেলের নামে মিথ্যা পরিচয় দেবার লজ্জা।...

কিন্তু না লজ্জায় জড় পদার্থের মত বসে থাকলে চলবেনা—ছেলের হাতে বিপর্যস্ত কেশ-বেশ, সামলে নিয়ে গভীরভাবে বলে—কোথায় ছিলে তুমি এতক্ষণ? শয়তান ছেলে!

মার মুখে তুমি সোধোদনটা বাবলুর কাছে প্রায় ভিন্নকারের সানিল—হঠাৎ সমস্ত বীরত্বে জলাঞ্জলি দিয়ে ‘ভাঁক’ করে কেঁদে ফেলে বেচারী।...সত্যি এই ঘটনা তিনেক ধরে সেও কম সহ্য করেনি...শারীরিক বহুশ্রম, মানসিক কষ্ট যথেষ্টই তো ভোগ করতে হয়েছে তাকে।

—এই দেখ—বীরপুত্র, হঠাৎ কান্দবার মানে? চল চল তোমার গাড়ী চড়িয়ে ঘুরিয়ে আনি। হ্যাঁ হ্যাঁ একটা কোদাল ফুড়ল কিছু থাকেতো দাও দিকিন রাজ্যাত্মী, সেই হতজ্ঞাড়া দরজাটা ভেঙে দিয়ে

আসি। হয়েছিল কি জানো? ওই যে মাঠের মাঝখানে লাল রঙের ভাঙা বাড়ীটা পড়ে আছে—ইনি বোধকরি লুকোচুরি খেলতে ঢুকে পড়েছেন তার মধ্যে... আর দরজাটি বন্ধ করার সঙ্গে সঙ্গে কিতাবে নীচের দিকের ছিটকিনিটা গিয়েছে পড়ে... কিছুক্ষণ বোধকরি মজা উপভোগ করছিলেন, তারপর মশা কামড়েছে—সন্ধ্যা হয়ে এসেছে ভালো লাগেনি—দরজায় ধাক্কা শুরু করে দিয়েছেন কিন্তু রাস্তা থেকে এত দূর সে শব্দ কানেই আসেনি আমাদের। আশ্চর্য্য যে একটু কীসেনি... আমি উঠোনের দিকের ভাঙা পাঁচিল উপকণ্ঠে গিয়ে যখন উদ্ধার করলাম তখন দেখি মুখ-চোখ লাল করে দরজায় ধাক্কা দিয়েই চলেছে।... ঘোরটা ভারী শরতান না বাবলু বাবু?...

—তোমার সঙ্গে যে বড় আসতে চাইলে?

—আমার সঙ্গে?

সুজিৎ একবার স্পষ্ট করে সোজা হুজি তাকালে রাজ্যশ্রীর মুখের দিকে...

অন্ধকার কেটে গিয়ে পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠেছে... নির্জন হয়ে গেছে সাননের রাস্তা ছোট্ট বাসার ছোট্ট রোয়াকে বসে থাকা জ্যোৎস্না-মাথা রাজ্যশ্রীকে দেখাচ্ছিল যেন আঁকা ছবির মত।... ওর চোখের কোলে তখনও জলের রেখা, মুখে মৃদু হাসির আভাস।... আগের চাইতে আরো বেশী সুন্দর হয়েছে নাকি রাজ্যশ্রী? আরো বেশী মোহময়?

মুহূর্তের জন্য আশ্চর্যবিস্মিত হয়ে কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল সুজিৎ, সহজ ভাবেই উত্তর দিলে—আসতে কি সহজে চায়? যখন বললাম—তোমার নাম বাবলু আমি তোমার চিনি, তোমার মার কাছে নিয়ে যাবো—এই বদমাইস দরজাটাকে ভেঙে দেব, তবে রাজী হ'ল ১০ মাক পেয়েছো তো তোমার ছেলে?

—খালি খালি ও কথা বলে লাভ আছে কিছু? ...রাজ্যশ্রী হঠাৎ
বেন ফেটে পড়ে—আমি বলছি ও আমার দিদির ছেলে, ছেলেবেলা
থেকে মা বলে আমায়। তুমি কি ভেবেছ তোমার দেওয়া লজ্জা
অপমানের বোঝা মাথায় করে বয়ে বেড়াচ্ছি আমি? নষ্ট করে
ফেলেছি...সেই পাপের অঙ্কুর, ধ্বংস করে ফেলেছি সেই কলঙ্কের
বীজ।...টুকরো টুকরো করে কেলে দিয়েছি তোমার চিহ্ন...পাপের
আর লজ্জার, লজ্জার আর ঘৃণার সমস্ত চিহ্ন।...ও আমার পালিত
সন্তান, এ ছাড়া আর কিছু প্রমাণ করতে পারেনা তুমি। যাও
বাও, আমার এইটুকু শান্তি আর নষ্ট করোনা তুমি, অনেক ক্ষতি
করেছো আমার।

—কিন্তু ক্ষতি কি আমার কিছুই হয়নি শ্রী? শুধু তোমারই
হয়েছে? তোমরা—মেয়েরা, বড় বেশী স্বার্থপর তাই নিজেকে লাভ
ক্ষতি ছাড়া কিছুই চোখে পড়েনা তোমাদের। আমার দিকটাই কি
কোনোদিন ভেবে দেখেছ? আজ ছ'বছর ধরে আমার জীবনেই
কি শান্তি আছে? শৃঙ্খলা আছে? ঘর আছে?

—এ তোমার ইচ্ছাকৃত বিলাস। ঘর বাঁধবার কোনো বাধাইতো
তোমার পক্ষে নেই।

—সামাজিক বাধা হয়তো নেই, কিন্তু মনের—বিবেকের কোন
বাধাই কি থাকতে পারেনা? তবে যদি বলো পুরুষের হৃদয় বলে
কিছু থাকেনা।

—আমি কিছুই বলতে চাইনা, শুধু বলছি তুমি যাও। অনেক
উপকার করলে আমার, তার জন্যে ধন্যবাদ, কিন্তু আর না, বাবলু
অবাক হয়ে শুনেছে আমাদের কথাবার্তা।.....চল বাবলু, খিদে
পায়নি তোর?

বলে সমস্ত আশাপ আশোচনার উপর যবনিকা টেনে দেবার ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়ায় রাজ্যশ্রী।

স্বজিত এক মুহূর্ত্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলো...তারপর নেমে গেল হাতায়।...কিন্তু বাবলু? সে তার দাবী ছাড়বে কেন? মার হাত ছাড়িয়ে ছুটে চলে আসে রাস্তার—বারে তুমি যে বললে গাড়ী চড়িয়ে নিয়ে যাবে? দরজাটা ভেঙে দিয়ে আসবে? এখন যে পালাচ্ছে।?

স্বজিত একবার ওর হাতটা নিবিড়ভাবে ধরেই ছেড়ে দিয়ে বলে—
দরজা ভাঙতে আর পারলাম কই বাবা? তাই তো পালিয়ে যাচ্ছি।

—না তুমি যাবে না।

বাইকের চাকায় হাত লাগিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে সে।

অগত্যা রাজ্যশ্রীকেই নেমে আসতে হয় পথে—ছেলেকে বকে ধমকে ফিরিয়ে নিতে হয়।...

স্বজিত চলে যায়।...হয়তো একটু দীরে...আর ওর গাড়ীর কুল্লী গর্জন ছাপিয়ে একটা মিহি গলার বাঁশীর মত আওয়াজ পথের শূন্যতাকে পণ্ড পণ্ড করে দেয়—গাড়ীওলা বাবু, কাল এসো আবার—
ও গাড়ীওলা বাবু—

ছেলের পরিচর্যা কতটুকুই বা সময় খরচ হয়? দুর্দান্ত ছেলে খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়ে কাদার মতো।...তারপর? আর তো কোনো কাজ নেই রাজ্যশ্রীর।

নিজের অ্যাহারের দরকারও যেন আজ মিটে গেছে।...

জানলা খুলে বাইরের দিকে চেয়ে চূপ করে দাঁড়িয়ে থাকাই বা মন্দ কি? বন্ধঘরে বিছানায় শুয়ে থাকার চেয়ে ভালো, যুম এখন আসবেই না!...চাঁদ ডুবে গেছে...বাইরেটা নিশুম অন্ধকার...হঠাৎ ভারী অধীক লাগে রাজ্যশ্রীর, কোন সাহসে সে এই লোকসঙ্গহীন

প্রায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা একলা বাসা বেঁধেছে?...এই তো—বিপদ যে কোনো সময় আসতে পারে! সে কি সেই রাজ্যত্ৰী? কলকাতায় তাদের বাড়ীতে সকলের মাঝখানে পাঁচজনের একজন আদরের আদরিনী যে রাজ্যত্ৰী...সব সময় প্রজ্ঞাপতির মত রঙিন ডানা মেলে ঘুরে বেড়াতো, তার সঙ্গে কি কোন সংস্বব আছে তার নিজের?

প্রতিষ্ঠাপন বরের মেয়ে, রূপের প্রতিষ্ঠা নিজেরও কম নয়, উজ্জল ভবিষ্যত, সহস্র সম্ভাবনা ছিল তার সামনে...কোথা দিয়ে কি হয়ে গেল!...কঁত লাহনা অপমান! অনেক ধাক্কা খেয়ে এসে উঠেছে এইখানে...অথাত এক মফস্বলি সহরে মাঠারী করে কায়ক্লেশে নিজের দিন চালালো—শুধু এইটুকু! বাকী সমস্তই নিরর্থক হয়ে গেছে তার জীবনে?

ঘুমের ঘোরে উসখুস করে উঠলো বাবলু।

রাজ্যত্ৰী চমকে চাইলে...না না সবটাই নিরর্থক নয় তার। তার বাবলু আছে। বাবলু: বাবলু: সমাজ সংসারের অস্বীকৃত এট সন্তানকে সে দুর্ভিক্ষ বোঝা বলে মনে করতে পারে কই? বাবলুকে মাতুষ করে তোলাই তার একাগ্র সাধনা।...হঠাৎ মনে হল সৃষ্টিতের কাছে মিথ্যা পরিচয় দিয়ে লাভ কি হল তার? কেনই বা সে ভয় পাবে? সৃষ্টিত কেড়ে নেবে? জগতের কোনো আইনের সাধা আছে তাঁকে কেড়ে নেবার?...ভয় নয়, লজ্জা।

অন্ধুত একটা লজ্জা।

বাবলু যেন সৃষ্টিতের কাছে তার পরাজয়ের দলিল।

সৃষ্টিতকে সে চুপা করে...তার জাগ্রত চৈতন্যে ঐ একমাত্র শব্দ আছে, আছে একমাত্র 'স্বপ্নভূতি...স্বপ্না ছাড়া আর কিছু নয়, কিছু হতে পারেনা।

আজ্ঞা হুজিৎ এখানে কোথায় এসেছিল? কি কাজ তার থাকতে পারে এখানে?...কতদূর থেকে এসেছিল কে জানে? হয় তো পরিশ্রান্ত ছিল ক্ষুধার্ত ছিল...মুখের দিকে কি তাকিয়ে দেখেছে রাজ্যাত্মী?...কিমে বরদাস্ত করতে মোটে পারত না হুজিৎ...কতদিন ওর মুখ দেখে ধরে ফেলতো রাজ্যাত্মী।.....

পথ থেকে এভাবে তাড়িয়ে দেওয়াটা কি বেশী নিষ্ঠুরতা হ'ল না? হুজিৎ ওর ছেলেকে খুঁজে এনে দিলে—ধরো অপরিচিত কেউ যদি এই উপকারটুকু করতো?...সামান্য একটু তদ্রতার আমন্ত্রণ, কিছু খেয়ে যাবার অগ্ররোধ...এ না করে উপায় থাকতো না নিশ্চয়? তবে?

হুজিতকে সেটুকু করলেই বা ক্ষতি ছিল কি?

বরং বোঝানো যেত রাজ্যাত্মীর জীবনে এক কানাকড়িও দাম নেই তোমার, নিতান্ত পথের লোকের মতই সাধারণ ভদ্রতার সম্বন্ধ। কেন যে অমন উত্তেজিত অধৈর্য হয়ে উঠলো রাজ্যাত্মী! হি! হি!

ছষ্ট ছেলেটাই আনলে সমস্ত বিপত্তি ডেকে।

সমস্ত ঘটনাটাকে ফিরিয়ে এনে নিজের ইচ্ছামত ছাচে ঢালাই করে ভাবতে কি সুখ! হুজিতের কথাগুলো গড়ে নিলেই সহজ হয়ে আসে নিজের উত্তর। ধারালো কাটালো টাচা-ছোলা সেই উত্তর...নিজের গোরব যাতে নষ্ট না হয়।

কিন্তু হুজিৎ কি আর আসবে?...রাজ্যাত্মী তো তাড়িয়ে দিয়েছে—দিয়েছে ভবিষ্যতের সমস্ত সম্ভাবনা নষ্ট করে।

তদ্রতার খাতিরে—মানে বাবলুর আমন্ত্রণ রক্ষা করতে আর একবার কি আসা উচিত নয় ওর? রাজ্যাত্মী অবশ্য চায় না—

সুধু আজকের বড় বেশী রুঢ় ব্যবহারটাকে একটু মোলারেম করা যেত।

অনেকরাতে ঘুমিয়ে, উঠতে একটু বেলা হয়ে গিয়েছিল...ঘুম-ভাঙলো—বাবলুর হরস্তু *টানাটানিতে—মা ওমা, গাড়ীওলাবাবু এসেছে—গাড়ী চড়ে ভৌ ভৌ করে বেড়াতে যাচ্ছি আমি।

রাজ্যন্তী উঠে বসে অবাক হয়ে তাকিয়ে থাকে ছেলের মুখের দিকে...বেন বোধগম্য হয় নি কথাটা।

কিন্তু বাবলুর কাছে জদয়-বিলাসের সময় নেই, মার মুখটা ধরে জানলার দিকে জোর করে ঘুরিয়ে দিয়ে বলে—দেখতে পাচ্ছো না? ওই তো গাড়ী, ওই তো গাড়ীওলাবাবু...ও গাড়ীওলা—দাঁড়াও যাচ্ছি আমি, জুতোটা পরে নিই। দেখা গেল বাবলু মাথার খাটো হলেও বুদ্ধিতে খাটো নয়।

চোরার টেনে নিয়ে গিয়ে দরজার খিল খুলেছে—আলনা থেকে পেড়ে নিয়েছে নিজের পোষাক পরিচ্ছদ। সুধু শার্ট উন্টে পরার দরুণ পকেট খুঁজে পাচ্ছে না বলে ব্যস্ত হয়ে বার বার অহুসঙ্কান করছে নির্দিষ্ট স্থানে...হায় হায় অমন সুন্দর বুশশাটটা তার সমস্ত শোভা সম্পদ হারিয়ে এমন দরিদ্র হয়ে গেল কি করে? পকেট নেই, বোতাম নেই, কাঁধের ফিতেপত্র কিছুই যে নেই ছাই!... ছুটে পথে বেরিয়ে গিয়ে ধরলো সজ্জিতের হাত—দাঁড়াও পালিয়ে যেওনা তুমি—আমার পকেট টেকেট কিছু খুঁজে পাচ্ছি না, পরলা আছে—পেন্সিল আছে তোমায় দেব—মার কাছে খুঁজে নিয়ে আসি—

সজ্জিত মুখটিপে হেসে বললে—পকেট? তাই তো এই ভোর-বেলা কোথায় বেড়াতে গেল'মে? না কি' চুরিই করলো কেউ পকেটটাকে?

—জানি না তো।

ভারী বিপন্ন লাগে বাবলুর মুখটা।

নিঃসঙ্গক দৃষ্টিতে দেখছে স্মৃতিও ওর কৌকড়ানো চুলে-ঘেরা উজ্জল চকল মুখ।...হাতের কাছে একটা আয়না থাকলে কি স্মৃতিতে হত না?

—আমি একটা মস্তুর জানি—হারানো জিনিষ খুঁজে পাবার।

—কই মস্তুর?

উৎসুক প্রশ্নে বাবলু দুইহাত দিয়ে ওর একখানি বসিষ্ঠ বাহু চেপে ধরে।...আঃ স্মৃতি শিশুর স্পর্শ বলেই কি এত কোমল? এত তৃপ্তিকর?

দুহাতে প্রায় বুকের কাছে চেপে ধরে স্মৃতি কোতুকহাস্তে বলে—গুনে দাও সার্টটা—চোখ বোজা, এই যে—বা, এবার পর দিকনি?

বাবলুকে অবাক করার পক্ষে এটা নেহাৎ কম নয়। সব আছে—কিতে বোতাম, পকেট, মায় পেম্ভিল খড়ি, চক্চকে সিকিটা পর্যাস্ত।

দু'জনেই হেসে ওঠে।

এবার গাড়ী চড়ার পালা।

এতক্ষণ যেন রাজ্যের লজ্জা ধরছিল রাজ্যাত্মিকে...হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে ওঠে...লজ্জা ভেঙে যায়...নিযে পালিয়ে যাবেনা তো স্মৃতি? অধিকার বোধের প্রবল দাবীতে!...স্মৃতিকে কি ঠকানো গেছে! মাতৃ-হৃদয়ের সমস্ত স্মৃতি দিয়ে মাহুয করে তুললেও মায়ের অহরূপ করে তুলতে পেরেছে কই ছেলেকে?...প্রমাণহীন পরিচয়হীন বিস্ময়প্রায় একবিন্দু ঋণের ভিত্তির উপর, ধীরে ধীরে গড়ে উঠেছে

না

এই স্নহুমার অবগব।...সমস্ত মুছে ফেলতে পারে রাজ্যত্ৰী, মুছে
ফেলতে পারেনা এই সাদৃশ্য।.....

তাই না এত ভয়!

গাড়ী ছাড়বার উপক্ৰম করতেই রাজ্যত্ৰী ছুটে আসে—কোথায়
নিযে যাচ্ছে তুমি ওকে?

—ভয় নেই ত্ৰী, তোমার ছেলেকে চুরি করে পালাব না।...
ছেলেমানুষের কাছে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম—বাইকখানা নিয়ে
বেরোবার সময় মনটা কেমন করে উঠলো—একটু ঘুরিয়ে এনে
ফিরিয়ে দিয়ে যাবো।

—ও এখনো দুধ খায়নি—

দুর্বলভাবে স্নধু এইটুকু বলতে পারে রাজ্যত্ৰী।

—বেশ তো—খেয়ে আসুক দুধ। বাবলু যাও তো মাণিক
ছেলে, দুধ খেয়ে এসো।

—ঈস। ওই বলে তুমি পাণিয়ে যাবে—

মায় কথা-বার্তাগুলো যে তার অস্বকুল নয় এটুকু বোধ হবার
বয়স হয়েছে—বুনো ঘোড়ার মত ঘাড় ফিরিয়ে বলে—দুধ খাবোই
না আজ, গাড়ীওলাবাবুর সঙ্গে চা খাবো—তুমি চা তৈরি ক'রো
না মা, আমরা এক মিনিট পরে ঠিক চলে আসবো—বলে স্নজিতকে
টেনে নিয়ে এগিয়ে যায়।

মাকে আর বেশী বিশ্বাস নেই তার।

আশ্চর্য্য! সত্যিই যে তৎপর হয়ে কাজে লেগে গেল রাজ্যত্ৰী!
বাবলুর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে স্নজিত ওর আতিথ্য নেবে এই কি
ভেবেছে না কি? যার স্নস্তে ঘৃণা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট

রাখেনি, তার অন্তে কেন এত আন্তরিক যত্ন নিয়ে তৈরি করছে
তার অভীতমিনের প্রিয় খাণ্ড !

মনটা কি তাহলে কিছুই নয় ?

কেবল মাত্র ঘটনার দাস ?

তাই যদি না হবে কি করে হুজিৎ এসে বসলো এর ঘরে ?
অনায়াস-ভকীর্থে বাবলুকে কাছে নিয়ে নিতান্ত অন্তরঙ্গের মত ?
সামান্য ঘর, ততোধিক সামান্য গৃহসজ্জা, তবু কি চমৎকার
মনোরম ।

নীচু চৌকিতে ছোট বড় ছুটিবাঁশ দিয়ে সাজানো বিছানা আর
আর ছেলের । মাথার কাছে টুলের উপর কাঁচের গ্লাস চাপা দেওয়া
জলের কুঁজো, সস্তা কাঁচের টেবিলের উপর রাজ্যাত্মীর “রবীন্দ্ররচনা-
বলী” “তরুণের স্বপ্ন” “গীতার গান্ধীভাষ্য” “জওহরলালের আত্মজীবনী”র
পাশে বাবলুর “নৃতন শিক্ষা ধারাপাত” “ছুটির গল্প” “সরল ইংরাজী
শিক্ষা”...সহজ ভাবে মিশে আছে এক ঘরে...এপাশে ষ্ট্যান্ড-
আলনায় রাজ্যাত্মীর শাড়ী ব্লাউস পেটিকোট...বাবলুর হাক-প্যাণ্ট
বুথসার্ট কুদে গেঞ্জি...আর ঘরে ঢুকে সামনেই আয়নার নীচে এক-
খানি ফটো বাবলুকে কোলে নিয়ে রাজ্যাত্মী...৭

ফুলে কি একটা বিশেষ অভিবেশনে ফটো তোলার আয়োজন
হয়েছিল—মাগতী জোর করে ধরে দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল তাদের
ক্যামেরার সামনে।...ফুলে—“দেখ দিকিন এমন একটা ‘ম্যাডোনার’
ছবি র‍্যাকেলও আঁকতে পারে নি”—এক কপি সে নিয়েছে কেড়ে
আর এক কপি টাঙানো আছে রাজ্যাত্মীর নিভৃত নীড়ে।..... ৮

কথাবার্তা বেশীর ভাগই চলছিল রীবলুকে মধ্যস্থ করে...হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল সে ছুটে বাগানে গেল কুল আনতে।...উঠোনের কয়েকটা গাছা ফুলের গাছ তাঁর বাগান।

সুজিৎ একবার লোভীর মত ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে অদ্ভুত একটু হেসে বলে—নামের সঙ্গে তোমার কাজের মিল আছে শ্রী, তোমার রাজ্যের শ্রীটুকু গোড়নীর...একটু জায়গা কি এখানে দিতে পারো না আমায়?

রাজ্যশ্রী মাথা হেঁট করে ঠোঙে পান্স করছিল—চায়ের জল চাপিয়ে, চমকে মুখতুলে চাইলে।

পূর্ব কথাই পুনরাবৃত্তি করে সুজিৎ—একটু ঠাই দাওনা তোমার আশ্রয়ে বেঁচে যাই তা'হলে—

—পাগলের মতো কথা বলোনা—

রাজ্যশ্রী আবার আরক কাজে মন দেয়।

—হয়তো পাগলের মতই হল কথাটা—তবু পাগলকেও তো লোকে ভিক্ষা দেয় শ্রী, তাই দাওনা একবার? জীবনের প্রারম্ভেই যে একাও তুলটা করে বলে আছি, একবার সেটা শোধরাবার সুবোগ দাও না?

—বাজে কথা বলে লাভ আছে কিছ?

—লোভ হচ্ছে—আশা হচ্ছে হয়তো কিছু লাভ-ই হবে! সঁতিয় তোমার কাছে হাতজোড় করে ভিক্ষা চাইছি, তুমিদের এই স্বর্গে আমার একটু জায়গা দাও।

—তুমি কি এই অসম্ভব কথাগুলো শোনার মতলবেই আজ এলে?

—ও কথা মনে কোরোনা শ্রী—আহত্বরে বলে ওঠে সুজিৎ—কোনো মতলব করেই আসিনি আমি। বিশ্বাস করবে, কি না

জানি না—নিজেই জানতাম না সত্যিই আসবো কি না—বাবুর কালকের সেই কায়া বেন—টেনে এনে ফেললো এই পথে।...ভবু স্বপ্নেও ভাবিনি, এত সৌভাগ্য হবে আমার, তোমার হেহ-সস্তাবণ পাবো—পাবো স্বর্গে প্রবেশের অধিকার! সত্যিই বিশ্বাস করো, এই ঘরে এসে এই তোমার সাননে বসে হঠাৎ মনে হচ্ছে—আমি যেন তোমাদেরই একজন। খানিকটা আগে ঘুরে এসেছি বাবলুকে নিয়ে—এইখানেই তৈরি আছে আমার সমস্ত প্রয়োজনের উপকরণ।... তুমি—তুমি বেন* বদলাও নি ত্রী, সেই আছে—আর আমিও—ধ্বংস করিনি নিজের জীবনের সমস্ত সুখ শান্তি আরাম আশ্রয়। মাঝখানের দিন ক'টা ভুলে যাওয়া যায় না ত্রী?

—না।

—হুধু একটা অক্ষর? বেশ উচ্চারণ করলে তো? কত সহজ কত সুন্দর তোমার এই নির্দোষ! এক মুহূর্ত ভাবতে হ'ল না!...

—এ ছাড়া আর কি আশা করতে পারো তুমি?

—আশা? আশার কি সীমা আছে ত্রী? অনেক—অনেক বেশী আশা করতেই বা বাধা কি?

—না আশা করতে আর ক'থা কি।

ক'থার হুরে মুহু হাসির আমেজ মিশিয়ে পরিপাটি করে ছুটি পেয়াল। চায়ে ভর্তি করে রাজ্যত্রী...ছোট আর বড়।

—পূর্ণ হবার নয় সে আশা?

—না?

—কি ক্ষতি হয় ত্রী, যদি এতদিন পরে দুজনে ঘর বাধি? সেইটাই তো ঠিক ছিল গোড়া থেকে? একটু অসহিষ্ণুতা একফোটা অসাবধানে চিরদিনের স্নেহে নষ্ট হয়ে যাবে সেই ঘর?

—যাবে। সে তো অনেকদিন আগেই গেছে স্ক্রজিং। আবার কবর খুঁড়ে মৃতের সংস্কার করতে চাও কেন ?

—তুল মানুষেরই হয় শ্রী, ভগবানের হয়না।...প্রথমটা দারুণ অস্বস্তিতে এলোমেলো হয়ে গিয়েছিলাম—সে কথা অস্বীকার করে নাও নেই...চেয়েছিলাম তুমি যেন একেবারে মুছে যাও—নিশ্চিহ্ন হয়ে যাও পৃথিবী থেকে আমার অসতর্কতার সমস্ত প্রমাণ নিয়ে—কিন্তু তুল যখন বুঝতে পারলাম—প্রতিনিয়ত মার, খেতে লাগলাম বিবেকের ক্ষোভ...তখন এই বিরাট জনারণো হারিয়ে গেছ তুমি।...কেউ দিতে পারলেনা তোমার কোন সন্ধান...কি জানি ইচ্ছে করেই মিলে না হয়তো—কাল হঠাৎ দেবের অমুগ্রহে কি নিগ্রহে তা'জানিনা—আশাভীত দেখা হয়ে গেল তোমার সঙ্গে।.....হয়তো না হলেই ভালো ছিল।

—একশোবার। আর কখনও দেখা হয় এও চাইনা আমি।

—কি আশ্চর্য্য নিষ্ঠুর হয়ে গেছো তুমি শ্রী!

—আশ্চর্য্য ? তা' হতে পারে। অकारণে এত বড় পরিবর্তন। কি বল ?

—অজ্ঞান কারণ থাক, তবু ক্ষমা বলে কি একটা কথা নেই অভিধানে ?

—আমার অভিধানে নেই।

—কোনোদিনই থাকতে পারেনা ?

—না।

ততক্ষণে বাবলু এসেছে সার্জের আর প্যাণ্টের পকেট বোকাই করে ফুল নিয়ে—এই নাও—এই নাও—

গর্জিতভাবে মুঠো মুঠো ফুল ফেলে দেয় স্ক্রজিংয়ের কোলে। নিজের চোঁটায় মাস্তগণ্য অতিথির সম্মান রক্ষার মত কিছু একটা

সংগ্রহ করতে পেরে ভারী খুসী সে।—দেখো কত ফুল—আরো অনেক—
অনেক আছে।

—এই ছেলে, চমৎকার এই ঐশ্বর্য পড়ে গেছে তোমার ভাগে—
একবারে ঠকে তুমি যাওনি শ্রী।

—কিছুতেই এ সন্দেহ তাড়াতে পারছো না কেন তুমি ?

অলস্টে স্বরে উত্তর করে রাজ্যশ্রী—কেন তুমি বিশ্বাস করবে না
আমার কথা ? আমি বলছি—তোমার সঙ্গে কোন সুল্পর্ক নেই ওর—
কেউ নয় তোমার ? এক ফোঁটা দাবী করতে পারো না তুমি !

—দাবী ! পাগল হয়েছ শ্রী। দাবী করবো কোনমুখে—চাইছি
দয়া—চাইছি ভিক্ষে—অন্ততঃ তোমার এই পরিশ্রম লাভব করতে—ওঁকে
মাফব করে তুলতে যে ভার, এখন থেকে সেইটাই না হয় বহন করতে
দাও আমাকে—

—না না না। কেন তুমি বারবার অপমান করছো আমার ?
অবশ্য আশ্চর্য্য হ'বার কিছু নেই—স্বযোগের অপব্যবহার করাই যে
ধর্ম তোমার।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ায় সৃজিৎ। বিষমহাসি হেসে বলে—ঠিকই বলেছে।
শ্রী, হয়তো নিজের অপরাধের গুরুত্ব ফিকে হয়ে গিয়েছে বলেই তোমার
কাছে এত কথা বলবার সাহস।...তবু কি মনে হচ্ছে জানো—
কালের দরবারে সব জিনিসেরই ক্ষয় আছে সূধু কি নেই ফুলের ?
যাক বাবলুকে কিছু দেবার—কোনো উপহার—সে অধিকারও বোধ হয়
নেই আমার ?

—না।

—যদি কোনোদিন তোমার মত বদলায়—আমার ঠিকানাটা রাখবে ?

—দরকার নেই।

না

সুজিৎ খর ছেড়ে চলে যেতে গিয়ে আবার মুখ ফিরিয়ে দাঁড়ায়...
একটু ব্যঙ্গহাসি হেসে বলে—একটা কথা আছে জানো শ্রী ‘কাঙালের
বাড়া বেহায়া নেই’ কথাটার সার্থকতা করতে চাইছি, তোমাদের মা
ছেলের ওই অপূর্ণ ছবিখানা—দেবে ?

—না।

সুজিৎ চলে গেল।

মিলিয়ে গেল তাঁর গাড়ীর ধূলা আর শব্দ।...

বাবলু শুয়ে পড়ে হাত পা ছুঁড়েছে আমি যাবো—আমি যাবো
গাড়ীগুলো বাবুর সঙ্গে চলে যাবো আমি।...

কুলগুলো পিষ্ট হচ্ছে তাঁর পদত্যাড়নায়।

চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে পেয়ালার উপর পড়েছে একটা বিবর্ণ সর।

থাবারের পাত্রটা ঘিরে মাছিনের মতো সব।

এখুনি উঠে ফুলে যাবার আয়োজন করতে হবে—এ যেন কল্পনাও
করতে পারে না রাজ্যশ্রী। এইমাত্র যেন ওর সব প্রয়োজন নিঃশেষে
ফুরিয়ে গেল।...

রংলাল

কণপ্রভা ভাস্করী

প্রাচীন জমিদারবংশের সুপ্রাচীন শাখা-পত্র-বহুল বটবৃক্ষ। ঐশ্বর্য-মধ্যাহ্নে তার ছায়ায় শান্তি আছে আবার কল্পা-বিন্দুক রাত্রি... তার সান্নিধ্যে বিপদের আশঙ্কাও আছে। তবু সে প্রাচীন। প্রাচীনত্বের একটা গৌরব আছে বৈকি। এই গৌরবকে রাধাশরণ কিছুতেই অস্বীকার করতে পারেন না। তাঁর চোখের সামনে দিয়ে বর্তমান লাহিত হয়ে ফিরে যায়। ভবিষ্যতের সম্বন্ধে তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন। রাধাশরণের প্রপিতামহর আমলে দরবারের দিন গরীব অপরাধী প্রজারা কেমন করে গলায় গামছা দিয়ে কাঁপতে কাঁপতে এসে বিচার-মণ্ডপে দাঁড়াত, সেই অদর্শনা কাহিনী ভেবে আজও তিনি শিশুর মতই আনন্দ উপভোগ করেন।

রাধাশরণ আলবোলায় নল মুখে দিয়ে তাকিয়ার হেলান দিয়ে বসেছিলেন। চোখের সামনে ছুঁতিনখানা সংবাদপত্র খোলা পড়ে রয়েছে। তিনি কোনও কিছুতে মনোসংযোগ করতে পারছিলেন না। তার কারণ, তাঁর চোখের সামনে দিয়ে স্বাক্ষপথকে দলে পিবে, সাম্রাজ্যবাদের চৌদ্দ/পুরুষকে নরকস্থ করে দলে দলে মিছিল বাচ্ছে। তাদের কণ্ঠে নানা প্রকার ধ্বনি। রাধাশরণ অন্তরের অন্তঃপুরচারী নির্জনতাপ্রিয় লোক। তাঁর এসব সহ হবে কেন? যার ক্ষমতা আছে সে পৃথিবীর উপর প্রভুত্ব করবে। তার খিয়োরী হল এই। তাই সেই ক্ষমতাবান পিতামহ-প্রপিতামহদের উৎকট বীরত্বের স্মৃতিপূজা অহরহ তিনি মনে মনে করেন। তবুও অস্বাধ্য চোখ...দৃষ্টিপড়ে—

রাধাশরণ বিরক্ত হয়ে চোখের কাছে একখানা কাগজ তুলে

ধরেন। একজায়গায় তাঁর দৃষ্টি গভীর ভাবে আকৃষ্ট হোল।
 “ডিক্রগড়ে দুইশত বস্ত্র হস্তীর ‘আবির্ভাব’—বস্ত্র হস্তী মানে বুনো
 হাতী—সে ত ভয়ঙ্কর! তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠলো
 হাতীর মন-মন্ত্র অবস্থায়। ভয়ঙ্কর দৃশ্যগুলি। বুনো হাতী, পাগল
 হাতী সব সমান। রাধাশরণ কাগজটা ফেলে দিলেন। দেশে একবার
 যেতেই হবে। তাঁর প্রিয় রংলাল পাগল হয়ে গেছে খুবর এসেছে।
 সর্দার সিং আজ বেচে নেই। কেউ তাকে সামলাতে পারছেননা।
 গ্রামবাসী সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে। কখন কি বিপদ ঘটে কে বলতে
 পারে? রংলাল—পাগল হয়ে গেছে, আর তিনি এখানে সে-খবর
 শুনেও নিশ্চিন্ত হয়ে বসে আছেন? রাধাশরণ সোজা হয়ে উঠে
 বসলেন। দরিদ্র গ্রামবাসীদের জন্ত নয়, তাঁর কৈশোর ও যৌবনের
 প্রিয় সহচর রংলালের জন্তই তাঁকে একবার দেশে যেতেই হবে।
 পৃথিবীকে শাসন করার জন্তই যে রাজা জন্মদারের জন্ম।

রাধাশরণের মনের প্রাচীনত্ব হৃদয় ছেড়ে জেগে উঠলো। তাঁর
 জন্মদারী শাসনের তার যে অর্ধেক রংলালের উপর ন্যস্ত আছে।
 কাজেই—

নীলচে আর কালোয়-মেশা চমৎকার দ্ব্যতিময় রংএর একটা
 বৃহদাকার জানোয়ার। চোখদুটি নিতান্ত ছোট। শুঁড়ের দুপাশে
 প্রকাণ্ড দুই-খবল দুটি দাঁত। একহাতের বেশী তাকে বাড়তে দেওয়া
 হয়না। সেই দাঁত আর শুঁড়ের দোলনে কি গান্ধীরের ছটা? সত্যই
 রাজসিক-চেহারা বটে রংলালের। সোনাপুর স্টেটের বড় তরকের
 রাজা বাহাদুর রাধাশরণের বালাখানার গৌরব এই রংলাল।

সে আজ বছর দশ আগের কথা। রংলালের তখন জন্ম যৌবন,
 রাধাশরণেরও তাই। এমনি সময়ে একদিন প্রত্যুষে রাধাশরণ বাগানে
 বেড়াচ্ছিলেন। এক সময় তিনি দেখলেন, একটা বনটিয়ায় ঋক,

এসে তাঁর দেউড়ির বাদামগাছের শাখায় বসল। তাদের কলকাকলিতে নিস্তক বুনবীথি মুগ্ধ হয়ে উঠল। রাধাশরণ চকিত হাতে কোমরবন্ধ থেকে বন্দুক খুলে নিলেন এবং গাছে শাখা-পত্রের মধ্যে লক্ষ্য করতে লাগলেন। গাছের অভ্যন্তরে ‘পাখীগুলি তখনও কিচির মিচির করছিল। হঠাৎ তিনি কেমন যেন আশ্চর্য হয়ে গেলেন। একেবারে নিশ্চল। রাধাশরণের মনে কি বৈরাগ্য এল নাকি? এই ভরা-মৌসমে বৈরাগ্য? অসম্ভব। না না, তাঁর মনের প্রাচীনত্বের গোরবে-লাগল আঘাত। গুলদার বাঘ, বুনো মোধ, কি গণ্ডার... পাখী মারাও বা, এই চক্রমল্লিকা ফুলটা ছেঁড়াও তাই। এরকম অগোরবের কাজ আমার বাপ পিতামহ কোনওদিন করেনি। তিনি মুহূর্তের মধ্যে বন্দুক খাণ্ডে ভরে দেউড়ীতে রংলালের কাছে গেলেন। ‘রংলাল বসেছিল। প্রভুকে দেখে উঠে দাড়িয়ে শুঁড় হেলিয়ে অভিযান জানাল। রাধাশরণ তার পেটের ধুলো ঝেড়ে দিতে দিতে বললেন, “রংলাল, শিকারে যেতে হবে। গারো পাহাড়ের গভীর অরণ্যে—”

রংলাল শুঁড় হেলনে সম্মতি প্রকাশ করল। রংলাল বোকার বংশ হলেও মাল্লখের ভালোবাসা গ্রহণ করার মত মন তার ছিল। তাই সে প্রভুকে খুশী করার জন্য কখনও সে শুঁড় উঠিয়ে তীর্থক ভদ্রীতে বীরত্বমূলক মূর্তিতে দাঁড়াত, আবার কখনও মাথা হুলিয়ে ছোট চোখ মিট মিট করে প্রভুর পানে তাকাত। রাধাশরণ এইতেই খুশী। তার পিঠে চাপড় মেরে বলেন “সাবাস বেটা সাবাস”।

মাহত, সর্দার সিংএর কাছে বধাসময় খবর গেল। সর্দার সিংএর মন আনন্দে নৃত্য করে উঠল। চোখ দুটি তার দীপ্তিতে উজ্জল। গারো পাহাড়ের গভীর অরণ্যানীর অভ্যন্তরে রোমাঞ্চকর মুহূর্তগুলির স্মৃতি ওর মনে আশ্রয় জালিয়ে দিল। হেঁতুলসী দাসের গোহা ছেড়ে স্নাত্তার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাত। পল্লীর নির্জন বনবীথি। কোপে-ঝাড়ে
 নানারকম বস্ত্র-লতা পুষ্পের সৌরভ রাজির বাতাস মাতালু হয়ে
 উঠেছে। আকাশে চাঁদের আশে-পাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে ষণ্ড ষণ্ড লঘু
 মেঘ। তাদের চকলতার বিরাম নেই। মাটি নীরবে আপন সৌন্দর্য
 পসরা নিয়ে আকাশের পানে চেয়ে আছে। আর আকাশ ব্যগ্র হৃদয়
 মেলে মাটিকে কাছে টানতে চাইছে। পরস্পর পরস্পরের ক্রানে কানে
 কথা কইছে। এমিলন অনির্ণয়। এ মিলন নিত্য এমনি ভাবেই
 সংঘটিত হয়। ঘর সাক্ষী শুধু বনানীর নির্জনতা আর আকাশের
 দেবতা। এমনি জ্যোৎস্নামন্দির রাতে গারো পর্বতের পাদদেশে
 টিলায় উপর, শালবনের মধ্যে দিয়ে যখন বস্ত্র হস্তী-শাবকের দল,
 বাশ-ঝাড়ের মর্মরানি গানের সঙ্গে শুঁড় ছলিয়ে তাল দিতে দিতে নেমে
 এসে বিলে জল খেতে যায়, না হয় ধান ক্ষেতের পাশে ঘুরে ঘুরে
 ধান খেয়ে বেড়ায়। আর তাদের পদশব্দে চকিত হরিণের দল,
 কোপে জঙ্গলে লুকিয়ে পড়ে ত্রস্ত পায়। আর মহারার মউ খেয়ে
 বৃন্দ হয়ে ভালুক যখন এলিয়ে থাকে মহা গাছের ড়লায়। আর
 বুনো মহিষরা দল বেধে এবনে ওবনে চরে বেড়ায়। হুদুরের কোন্
 পাছাড়া ছেলের বাশা শুনে বুনো কুলগাছের গায়ে বিষাক্ত সাপ
 মস্তমুণ্ডের মত এলিয়ে পড়ে থাকে। আর জ্যোৎস্না-উজ্জল উন্মুক্ত প্রান্তরে
 যখন হিংস্র গভীর পরম নিশ্চিন্তে জিহ্বা দ্বারা প্রণয়িনীর পৃষ্ঠদেশ
 লেহন করে তাকে ভালোবাসা জানায়, সেইসময় সেই স্বপ্নময়-
 শাস্ত্রিয়-সৌন্দর্যময়-সুখময় বনের বৃকে কে তীর মারতে পারে?
 যে পারে সেই প্রকৃত শীকারী। বস্ত্র পশুরা নির্ভয়ে জানে এ বনস্থলী
 এবং এই নিশ্চিন্ত রাজি, একমাত্র তাদের নিজস্ব দন। এখানে
 তাদের অখণ্ড স্বাধীনতা। এ অরণ্যানী একমাত্র তাদেরই বিচরণ
 ক্ষেত্র। কাজেই প্রকৃতির সৌন্দর্যময় পরিবেষ্টনীর মধ্যে স্বাধীন মনে,

পশু-প্রকৃতির মধোও লোভ ও হিংস্রতা ছাড়া, প্রেম, সৌহার্দ্য
বিশ্বপ্রাণুতার বিকাশ ঘটতে পারে, একথা অবিস্মৃত নয়।

সেই বনস্থলীর রহস্যময় নিস্তরঙ্গতা ভঙ্গ করে যখন শীকারীর বন্দুক
গর্জন করে সমস্ত তোলপাড় করে তোলে, তখন শীকারীর মনের
অবস্থা বুঝতে পারে একমাত্র শীকারীরাই। বন্দুকের শব্দে, ভয়ানক
বনজন্তুর রিকট গর্জন, গাছপালা ভেঙ্গে পড়ার শব্দ, তরু কোটে
সহ্য ঘুমভাঙ্গা পক্ষীশাবকের ভীত-চীৎকার, নিরীহ পশুদের এবনে
ওবনে ছুটোছুটি এবং সকল বিলাপ—সেই ত শীকারের উপযুক্ত
সময়। এই সময় সর্দার সিংএর চাপা ওঠপ্রাস্তে হুটে ওঠে এক
জাতীয় হাসি। এ হাসির সেই রূপ। যে রূপ আদিকালে একদিন
হুটে উঠেছিল রক্ত নটরাজের তাণ্ডব নৃত্যের মধ্যে। সর্দার সিং টোটা
ভরা বন্দুক হাতে নিয়ে রংলালের পিঠের হাওদা থেকে লাফিয়ে নেমে
পড়ে। রাধাশরণ তাকে অল্পসরণ করেন। গারো পাহাড়ের গুলদার
বাঘ ও বহু গভীর সে নিজে হাতে মেরেছে। তার দক্ষিণাবরূপ
অরণ্য-দেবতাকে ওর দিতে হয়েছে নিজ দক্ষিণ হস্তের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিটি।
এমনিই বীর ছিল সর্দার সিং।

সেই সর্দার সিং আজ নেই। রাধাশরণ বৈঠকখানায় বসে বসে
ভাবছেন “সর্দার সিং নেই, রংলাল পাগল হয়ে গেছে, আমিও
বুঝ হয়ে পড়েছি”—তবে কি জীবনের সমস্ত প্রয়োজন, হুরিয়ে গেল?
সমস্ত আয়োজন মিথ্যা হয়ে গেল? শুধু সত্য হয়ে জেগে রইল এই
প্রাচীনত্বের গোরব আর নিকর রাধাশরণ? রাধাশরণ পিছন কিয়ে
দেখলেন, তাঁর যা কিছু কাম্যবস্ত্র সব পড়ে আছে পিছনে। তাঁর
নাগালের বাইরে। অজ্ঞানস্বাভাবিক স্ফূর্ত্ত্যহীন, শুষ্ক মরুর মত ধূ ধূ
করছে তার সব কিছু।—জীবনে কিছু মিলে কিছু পাওয়া যায়। রাধাশরণ
-যা কিছু দিয়েছেন তা শুধু নিজেকেই। নিজেকে মিলে আত্মপ্রসাদ

বুঝি পায়, কিন্তু শাস্তি সক্ষম হয় না তাই রাধাশরণ আজ নিজের কাছে থেকে এমন কিছুই পাচ্ছিলেননা যা দিয়ে তিনি বিগত সর্দার সিং ও মৃত রংলালের দুঃখ ভুলতে পারেন।—শুধু ফিরে ফিরে তাদের কথা মনে পড়ে মনকে শুধু বিষাদগ্রস্তই করে তোলে। রাধাশরণ মৃত-বংশধর্য্যাকে প্রাণপণে আঁকড়ে ধরেন।

রাধাশরণ নেলাথোর নন। তবে তিনি আফিং খান। একসময় তাঁর মনে হয় বুদ্ধ হলেও তিনি জমিদার। আর পাগল হয়ে গেলেও রংলাল হাতী। আর সর্দার সিং মরে গেলেও তার মর্ত বীর তারতর্ষে ভ্রমিত নয়। হুতরাং.....

রাধাশরণের যৌবনের আর একটি ঘটনা তাঁর মনকে বিচলিত করে তোলে। সেটা ছিল বোধহয় উনিশশো কুড়ি সাল। স্বদেশী যুগের রক্তবর্ণ প্রভাত। অজন্মার জন্ত প্রজারা খাজনা দিতে চায়না শুনে রাধাশরণ নিজে মহালে গেলেন প্রজাশাসন করতে। তাতেও কোন ফল হলনা। চাষী প্রজারা হাতজোড় করে এসে জানাল, “ভরা দুই সাল অজন্মা হোল, ঘরে একটি বীজ-ধানও নেই। যা ভসাঁ শুধু ওই পাট। বেবাকজমি থা থা করছে, একফোটা জল নেই। খাজনা দেবো কি করে হুজুর”—পল্লীর পর পল্লীর সকল প্রজার মুখে একসুরে বাধা গৎ। রাধাশরণের জমিদারি-রক্ত চুলকে উঠল। তাঁর মনে সন্দেহ জাগল। প্রজাদের এই একবাক্যতার মূলে নিশ্চয় কিছু আছে। সেই কিছুটা কি জানার জন্ত তিনি চুতুর্দিকে চর প্রেরণ করলেন। বধাগময় সংবাদ পাওয়া গেল, একদল স্বাধীনতাকামী যুবক গোপনে এদের খেপিয়ে বেড়াচ্ছে। তা না হলে এদের নিজস্ব বাগানে মাটির নীচে বথেষ্ট টাকা ও ধান পোতা আছে। এসব হচ্ছে রাজা জমিদারকে না মানার ফন্দি আর কি। সমস্ত শুনে রাধাশরণ আঙনের মত উত্তপ্ত হয়ে উঠলেন।

সামান্যবাদের আক্রমণ করতে করতে তিনি সর্দারসিংকে সঙ্গে নিয়ে
রংলালের নিকট উপস্থিত হলেন। শৃঙ্খলিত রংলাল শিরীষ গাছের
ছায়ায় দাঁড়িয়ে কলাগাছ খাচ্ছিল। স্বপ্নালু চোখদুটি তার অদূরে
মধুপুরের গড়ের অরণ্যের পানে নিবদ্ধ। ● আজ সকালে খাদ্য সংগ্রহ
করতে গিয়ে ঐ বনের সীমান্তে রংলালের হঠাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল
তার পূর্ব পরিচিত এক সঙ্গিনীর সঙ্গে। অনেকদিন আগে যখন
রংলাল স্বাধীন ছিল তখন জয়ন্তী পাগড়ের অরণ্যানীতে এই সঙ্গিনীর
সঙ্গে একদা সে পরমহুখে দিন অতিবাহিত করেছে। আজ হঠাৎ
তার সাক্ষাৎ পেয়ে রংলাল প্রথমে কিছু উত্তেজিত হয়ে পড়েছিল।
পরে নিজেকে সামলে নিয়ে প্রেমসীর সঙ্গে দিনটা তার ভালোই
কাটিয়েছিল। সেই মনমত্ততার স্বপ্নে ওর ক্ষুদ্র নীল চোখদুটি তাঁবালু।
প্রিয় প্রভুকে দেখেও তার কোনও পরিবর্তন হোলনা। রাধাশরণও
তখন যুবক। কাজেই রংলালের মনোভাব হৃদয়ঙ্গম করতে তাঁর
বিলম্ব ঘটলনা। তিনি শুধুনই সর্দার সিংকে আদেশ দিলেন রংলালের
শৃঙ্খল মোচন করতে দিতে। এবং তার গতিবিধির প্রতি লক্ষ্য রাখতে।
কিন্তু কাল রাত্রি তৃতীয় প্রহরে, যখন শুক্লা-একাদশীর চাঁদ অস্ত
যাবে, সেই সময় রংলালের প্রত্যাবর্তন একান্ত আবশ্যক। ছাড়া পেয়ে,
মনমত্ত মাতঙ্গ গজেন্দ্রগমনে পূর্বদিকে মধুপুর-গড়ের অভিমুখে যেতে
লাগল।

রাধাশরণের কাছারী বাড়ীটা ছিল লোকালয়ের বাইরে। নির্জন
মাঠের প্রান্তে। পূর্বদিকে দূরে ওই যে অস্পষ্ট নীল বনরেখা দেখা
যাচ্ছে, ওইটেই হচ্ছে মধুপুর গড়ের প্রসিদ্ধ অরণ্যানী। কাছারী
প্রাঙ্গণের আশ্রকুঞ্জে পাখীদের কলকাকলীতে আসন্ন সন্ধ্যার শুকতা
রুণিকের জন্ত মুখর হয়ে উঠল। একদল লাল হাঁস মধুরগতিতে
উড়ে উড়ে উত্তর দিকে যাচ্ছে, ভোরবেলা ওরা বোধহয় ব্রহ্মপুত্রের

চরে বিচরণ করিতে গেলিল। দূরে শালবনের মাথায় টকটকে লাল সূর্য ধীরে ধীরে অস্ত যাচ্ছে। শীকারী রাধাশরণের অভ্যস্ত হাত বন্দুকের কাছে গিয়েও ফিরে এল। আঃ, আজকের রাতটাই দিব্যী হাঁসের রোষ্ট খেয়ে কাটানো যেতো। যেমনটী তাঁর বাপ ঠাকুরদাঁ করে গেছেন—নাঃ, কিন্তু তিনি কঠোরভাবে মনকে শাসন করলেন। আজকের রাত প্রাচীন জমিদার বংশের কাহিনী অধ্যুষিত রাতের সঙ্গে পরিচিত হতে যাচ্ছে, এ-রাত স্মৃতির রাত নয়। তিনি কঠিন-দৃষ্টিতে দূর চক্রব্যূলের পানে চেয়ে রইলেন। যেখানে অন্তরবির রক্ত-রক্তীন আভা আকাশকে রান্নিয়ে তুলেছিল, আর তারই নীচে দিয়ে উড়ে যাচ্ছিল এক ঝাঁক জ্বাল হাঁস। তাদের রক্ত-পক্ষের সকলিনে আকাশের রং আরও মেহুর হয়ে উঠেছে। পশ্চিমদিকস্থ ছেয়ে বয়ে যাচ্ছে শুধু রক্তের স্রোত। এ যেন আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষের গৈরিক-বেশধারী রূপের একটুখানি প্রকাশ মাত্র।

রাধাশরণ ঘুমোননি। প্রহরীদের সকলকেই আজ রাতে তিনি নিদ্রা যাবার আদেশ দিয়েছিলেন। শুধু তাঁর অস্তি বিশ্বস্ত এবং দক্ষিণহস্ত স্বরূপ দুই কর্ণচারী পাশের ঘরে জেগে অপেক্ষা করছিলেন প্রভুর আদেশের জন্য। রাধাশরণের বৃকে প্রতিহিংসার জ্বালা ভীষণভাবে জ্বলছে। নেশা না করেও তাঁর চক্ষুতারকা অসম্ভব রকমের লাল। তিনি যেন গুনতে পাচ্ছেন, অন্ধকার ঘরের সর্বত্র তাঁরই মনের কথা প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরছে, “আমারই বাপ-পিতামহের ভিটায় বাস করে, মাঠের ফসল খেয়ে ব্যাটারা মাছ, আর আজ খলে কিনা এক আধলাও খাজনা দোবনা—মোকর্দমাও কোরবোনা। ফসল হলে সব খাজনা চুকিয়ে দোব। মাটিতে কারো নাম লেখা নেই”—এত বড় স্পর্ধা; নেমকহারাম ব্যাটারা! আমার দখিলে, তবে

কি তাঁদের বাপ ঠাকুরদার নাম লেখা আছে? এমন সময় দূরে ভারী পদশব্দ শোনা যেতেই তিনি চকিত হয়ে উঠলেন। আজ রংলালের গলার সোনার ঘুঙুর খুলে রাখা হয়েছে। রাধাশরণ টর্চ হাতে নিয়ে বেরিয়ে এলেন, কর্মচারীঘৃণ্ডা তাঁর পশ্চাতে অগ্রসর হোল। সর্দার সিং কুণিষ করে সরে দাঁড়াল। রাধাশরণ কর্মচারী ও সর্দারকে কয়েকটা পরামর্শ দিয়ে রংলালের নিকটে এসে দাঁড়ালেন। ই্যা ঠিক আছে, রংলালের ক্ষুদ্র চক্ষে জ্বলছে ক্ষুধার আগুন। কিন্তু সামনে তার খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও সে তা স্পর্শ করছে না। সে কি চায় রাধাশরণ জানেন। তিনি গম্ভীরকণ্ঠে ডাকলেন, “রংলাল!” প্রভুর এই জাতীয় কর্তৃত্বের অর্থ রংলাল জানে। সে দৃঢ়ভাবে উঠে ওঁড় তুলে জানালে সে প্রস্তুত। রাধাশরণ খুসী হয়ে তার পিঠে আর একবার হাত বুলিয়ে সরে এলেন। সর্দার সিং বিরাট জন্তুর পিঠে থাবা মেরে বললে “বৈঠ, রংলাল, বৈঠ যা ভাই!” রংলাল নীচু হয়ে বসে সওয়ারীদের পিঠে তুলে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। সর্দার সিং তাঁর কানে হাত বুলিয়ে বললে “চল ভাই চল।” রংলাল হেলে ছলে চলতে লাগল, সমস্ত মন মস্তিষ্ক তাঁর মদরসে পরিপূর্ণ। ও ভাবছে, কতক্ষণে গিয়ে ওর সঙ্গিনীর কাছে পৌছোতে পারবে? কিন্তু নির্বোধ মদমত্ত মাতঙ্গ জানে না যে, যেখানে ও যাচ্ছে সে স্থানগুলি ওর রোযবহ্নিতে জলে ভস্ম হয়ে গেলেও সেখানে তার প্রেয়সীর সন্ধান মিলবে না। পাকা ধানের ক্ষেত সমূলে বিনষ্ট করলেও তার সহচরী আসবে না।

রাধাশরণ বারান্দার পায়চারী করে বেড়াচ্ছিলেন। কিছুক্ষণ পর, দূর গ্রামান্তর হতে তুমুল কোলাহল ভেসে আসতে লাগল। বিকট হিংস্রধ্বনি আকাশ বাতাসকে মুখরিত করে তুলতে লাগল। “মার, মার, লুট, লুট,—সেই বিকট চীৎকারে রাধাশরণের বহুপুরুষ

সংক্রামিত জমিদারি-রক্তেও কাঁটা দিয়ে উঠল। শিশুর ক্রন্দন, নারীর চিংকার, পুরুষের হকার, মদ-মত্ত, মাতঙ্গের নিষ্ঠুর আক্রমণের সম্মুখে বৈশীকণ টিকতে পারল না। মশালের অগ্নিশিখায় পূর্বদিকের আকাশ-প্রান্ত রক্তিম হয়ে উঠল। উঃ, রাধাশরণ চক্ষু মুজ্জিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর হাত হোল দৃঢ় মুষ্টিবদ্ধ, চোখের দৃষ্টি তির্যক। তাঁর বাপ-পিতামহ কোনওদিন প্রজার কাছে নতি স্বীকার করেন নি।

রংলাল প্রভুর প্রতিহিংসাবৃত্তি চরিতার্থ করলেও, তিনি স্বদেশী বাবুদের হাত থেকে নিষ্কৃতি পান নি। যদিও তাঁরা রংলাল এবং রাধাশরণের কোনও অসম্মান করেন নি। তবে প্রজাদের ক্ষতি-পূরণ তাঁকে দিতে হয়েছিল।

রাধাশরণ আজ বসে বসে ভাবছিলেন সেইসব কথাই। দেশের থেকে খবর এসেছে রংলাল পাগল হয়েছে—তার ভয়ে দরিদ্র গ্রামবাসীরা অত্যন্ত বিপন্ন। জমিদারীতে শাস্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে এখনই তাঁর দেশে যাওয়া প্রয়োজন। রাধাশরণ ভাবছিলেন, আজ প্রজাশাসন তিনি কোরবেন কি দিয়ে? রংলাল পাগল, সর্দার সিং মৃত, তিনি বৃদ্ধ,—তবুও তাঁকে একবার দেশে যেতে হবে। প্রজাদের দুঃখ দূর করবার জন্তে নয়, পুরোণো বন্ধু রংলালকে দেখবার জন্তে...

(২)

রাধাশরণ গ্রামে এসে পৌঁছতে না পৌঁছতে, দলে দলে আতঙ্কিত জন নর-নারী তাঁর দরজার ধরা পড়িলে।

—ভজুর, বাচান আমাদের। রংলালের দোড়াখো আমরা জ্ঞান বাচি না!

রাধাশরণ নিশ্চক হয়ে তাদের কাহিনী শোনে—উদ্ভাস
রংলালের সহস্র অত্যাচারের নির্মম কাহিনী।

জিজ্ঞাসা করে জানলেন, রংলাল বোধ হয় এখন মধুবনের জঙ্গলে
ধুকিয়ে আছে...কখন যে এসে পড়বে, তা কেউ জানে না!

রাধাশরণ প্রজাদের আশ্বাস দিয়ে বলেন, যাও, তোমরা ফিরে...
আমি আজই এর বিহিত করবো!

মধুবনের জঙ্গল! বাড়ীর ছাদে উঠে রাধাশরণ একদৃষ্টিতে সেই
দিকে চেয়ে থাকেন...সেই জঙ্গলের পাতায় পাতায়, বাসে বাসে, অড়িয়ে
আছে তাঁর আর তাঁর যোবনের সহচর রংলালের শত স্মৃতি...আজ
আবার উঠেছে সেই মধুবনের জঙ্গলের ওপর পূর্ণিমার চাঁদ...মুহুরার
মিঠে-গন্ধে মাতাল হয়ে উঠেছে বনের বাড়ুরী বাতাস...

ঘরে ফিরে এসে দেওয়াল-প্রমাণ পুরোণো আয়নার হঠাৎ
রাধাশরণ দেখেন তাঁর মুখের ভাঁজে ভাঁজে কালের রথচক্র চলে
বাওয়ার গভীর দাগ...আয়না থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দেখেন জীর্ণ
পুরোণো ঘর, থাকের পর থাক জমে আছে ধূলো.....মাকড়সার
জাল...

নতুন জগৎ...এসেছে নতুন মানুষ...নতুন তাদের গান...

রাধাশরণ খুঁজে পায় না সে-গানের স্বর তাঁর নিজের মনে...
কিন্তু কি দরকার সে-স্বরের সঙ্গে স্বর মিশিয়ে? সমান হতে
হবে...সবাইকে হতে হবে ভিখিরী হয়ে সমান? হিমালয়কে ভেঙ্গে
ওড়িয়ে করতে হবে সমান সমান লক্ষ উই-চিপি? রংলালের শিঠি
চড়ে, সোনালী জরির পাগড়ী উড়িয়ে...পথ কাঁপিয়ে...

রাধাশরণ আর ভাবতে পারে না...মনে হয় যেন রংলাল তাকে
ডাকছে...বলছে...বন্ধু, আমার মত এক উদ্ভাস হয়ে পালিয়ে এই
মধুবনের জঙ্গলে...তারপর, আবার তুমি উঠে বস আমার শিঠি,

দুজনে আমরা বেকবো শীকারে...বাথ-ভান্নের শীকারে নয়...মাছবের শীকারে...শিপড়ের মত যাত্রা মাছব, তাদের শীকারে...

মনে পড়ে আর্জি প্রজাদের হাহাকার...মনে পড়ে তাদের 'দিয়ে-ছেন আখাস!

রাধাশরণ বাড়ী ছেড়ে রাস্তায় এসে নামেন...সোজা বে-পথ চলে গিয়েছে মধুবনের দিকে, সে-পথ দিয়ে হাঁটতে আরম্ভ করেন...হাতের মুঠোতে ভোর করে ধরেন বন্দুকটা...চক্রকরে ঘুমুচ্ছে তখন গ্রাম।

(৩)

শেব-রাত্রির দিকে হঠাৎ গায়ের লোকের ঘুম ভেঙে যায়, বন্দুক আঙুলে...

ভয়ে ঘরে ঘরে কাঁপতে থাকে তারা।

তবে কি এসেছে রংলাল? রাধাশরণের গুলিতে যদি সে না মরে? যদি মরবার মুখে আরো হিংস্র হয়ে ওঠে?...

ভয়ের রাত্রি বড় দেবীতে হয় প্রভাত।

তবু প্রভাত হয়।

লাঠি-শোটা নিয়ে দল বেঁধে লোক চলে মধুবনের জঙ্গলের দিকে।

রাধাশরণ সেই যে রাত্রিতে বন্দুক নিয়ে চলে গিয়েছেন, এখনও ফেরেন নি ঘরে।

জঙ্গল ভোলপাড় করে তারা হঠাৎ দেখে, এক পুকুরের পাড়ে... তারা দুজনে শুয়ে আছে...রক্তে জায়গাটা হয়ে গিয়েছে লাল...

রংলাল আর রাধাশরণ...পুরোণো জগতের দুই প্রতিনিধি। দুই বন্ধু। আর তারা আসবে না উভ্যন্ত কর্তে।

গ্রামবাসীরা নিখাস ছেড়ে বাল্যে বাঁচা গেল এত দিন পরে।

এগারো, বারো, তেরো

শ্রীপ্রভাত মুখোপাধ্যায়

তিন দিন, তিন যুগ তিনটে জীবন।

প্রথম দিন, এগারোই। নির্জীব, নিস্তেজ, নীরব কেরানী, সকাল-বিকেল ডেলি প্যাসেঞ্জারী। গ্রামে থাকে, সহরে কাজ করে। সকাল ছটায় ঘুম থেকে ওঠে—দ্রীর অনেক কাকূতি-মিনতিতে, কখনও রাগে, কখনও অভিমানে। দশ মিনিট লেট হলে পাঁচসিকে ফাইন, এক দিনের মাইনে। গয়লার হিসেবে গোলমাল, মুদ্রির পাওনা বাড়ে, ভাড়ায় কম পড়ে। ছটায় উঠেই বাজারে ছোটো, সাতটা তেপ্পানোতে বর্ধমান প্যাসেঞ্জার, ষ্টেশনে দাড়ায় তিরিশ সেকেণ্ড, লোক ওঠে বাহান্তর জন। ওঠে নয়, প্রাণ হাতে করে চলা-কেরা করে, আধ সেকেণ্ডের এদিক-ওদিক হ'লে পুরো সংসার ভেসে যাবে। সাতটা তিপ্পানোয় গাড়ী ধরে সোজা হাওড়ায় এসে নামে। পথে জর্দা দেওয়া পান দিয়ে জাবর কাটে, 'বোটার' পতি-ভক্তিতে 'মাইরির' পাঁচ-ফোড়ন দিয়ে মুখরোচক গল্প করে, কখনও শোনে। বাজার-দরের হিসেব করে, সোনার ভরি আঠাত্তোর থেকে বিরানোকোইতে তুলে দেয়, দালচিনির মণের দাম কবে, তাম্বা-বোয়েক ননদের বিয়েতে লৌকিকতার সূত্র ধরে রূপোর ভরির দাম ঠিক কত, তারই হিসেব করে। বিড়িতে অকো টান দেয়, ডান হাতে দেশলাইর বাস্কাটা চেপে ধরে, শুধু বাস্ক নর, বাস্কের ওপর তিন বছরের পুরোনো টিনের ঢাকনাটার মসৃণ স্পর্শ অহুভব করতে করতে। ইন্টারকাস কম্পার্টমেন্টের কৌনের বেকির ওপর কখনও কাগজ বিছিয়ে বসে পড়ে পা ছটো ওপরে তুলে দিয়ে, বিড়ি

এগারো, বারো, তেরো

ধরানো পোড়া দেশলাইর কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁটে, ঐ কালো কালো দাঁতগুলো।

রামুদার সঙ্গে রোজ দেখা হয়, গল্পও হয় যখন এক কামরায় থাকে। চাঁদসদাগরে নিমু সান্নালের বুক ফুলিয়ে কথা বলা, নয়ত বীনা টকিজের ফ্লানলিনী অথবা রাণু দেবীর গল্প গানটার তারিফ করে। থিয়েটারের আসর জমাবার কথা ওঠে। কখনও রামুদার মেজমেয়ের পাকা দেখাতে বস্ত্রিবাটি যাবার বায়না নেয়।

কখনও ভাইসুরয় সিগারেটের পুরোনো টিন খুলে আধ-পোড়া সিগারেটটা সম্বন্ধে বাচিয়ে রেখে বিড়ি বের করে, উল্টো দিকটা মুখে পুরে দিয়ে হুঁদিয়ে দেশলাই জালিয়ে গল্প করতে করতে মুখ বেকিয়ে বিড়ি ধরায়। পোড়া কাঠিটা কোল থেকে ঝেড়ে ফেলে দেয়।

হাওড়ায় নেমে সোজা হাঁটে, থলে বগলে নিয়ে, হাওড়া পোলের ওপর দিয়ে বড় বাজারের মধ্যে পড়ে ক্লাইভ রোডে ব্লাড সাকার কোম্পানীর ব্যালি ক্লার্কবাবুর আসন লক্ষ্য করে। ঘরে স্যাণ্ডেল থাকে, বাজুজো থাকে, জাম থাকে। শ্রামের কাছে বিড়ি চেয়ে নেয়। স্যাণ্ডেলের বোঁ নমাস পোয়াতি, সাতছেলের মা। কালো কালো দাঁত বের করে বলে, তুমিই দেখালে মাইরি, একাত্তো টাকা পোনেরো আনায় চালাও কেমন করে?...আমরা শালা তিনটেতেই কাৎ। ওদার থেকে বাজুজো বলে, কালকের পাটিং করে দিও হে, বড়বাবুর খোঁচানি আর নয়না। কোটটা খুলে চেয়ারে মেলে দেয়, টেনিস্ কলারের বুক খোলা শার্টটা আধ ময়লা ধুতির তলায় গোজা থাকে।

কলম চলে, থামিয়ে চেয়ারে ডান পা। তুলে কোড়ে আঙুলের ময়লা রগড়ায়, বিড়িতে টনি দেয়, ঘাড় বেকিয়ে রামকানুাইত্ত ঠাটা

মস্করাই উত্তর দিতে দিতে বলে বড়বাবুর চাপরাশিকে, তা আমি কি করব, বল্গে তোর বড়বাবুকে, আমার পিতৃদায় নয়।

ছোট সাহেবের ঘরে যাবার মুখে টেরি বাগার, কোট ঝেড়ে গায়ে দেয়, কোটের হাতার মধ্যে দিয়ে শার্টের আন্তিন খ'রে টান দিয়ে ফাইল বগলে তোলে। ইয়েস্ স্তার—নো স্তার—নো মিস্ট্রেক্ বাট অভার সাইট্...টট ইস্ মিস্, বড়বাবু সে পোষ্টিং ইউ মাষ্ট... ভেরি ওয়েল্ স্তার...

বুঝলি মাইরি, ছোট সাহেব লোকটা শালা জ্ঞানক ভালোবাসে আমায়.....

পাঁচটার বেরিয়ে ছটা বোত্তিরিশেখ গাড়ী, পথে বাজার করা বাকি...

বড় বাজারের ফুটপাতে কমলালেবুর দর করে, চার পরসায় সতীতা—সুজির বিস্কুট কেনে, সাড়ে তিন চাতি বাদিপোতার গামছা, জী বিলাস মাথার তেল, একটা বড় মেখে কোপি, কিম্বা একজোড়া।

ট্রেনে সকালবেলাকার তৎপরতা হারিয়ে চূপ করে বসে থাকে, নয়ত ঘন ভালো থাকলে গল্প করে।

আজ উত্তেজনা বেশী। ক্লাইভ স্ট্রীটে সে কি ব্যাপার মশায়... বুঝলেন, বাবাণ্ডায় দাঁড়িয়ে নিজের গোঁথে দেখলাম...লাখ খানেক লোক; দূর...লাখ চারেক তো বটেই...বারো বছরের একটা ছেলে, বুঝলেন...একেবারে পেটের মধ্যে গুলি ঢুকে কানের পাশ দিয়ে বেরিয়ে গেল...আম্মা হো আঁকবর...সে একেবারে কি কাণ্ড!... এ সবেই কোন মানেই হয় না...মিছিমিছি গুলি খাওয়া...বারো তেরো বছরের ছেলেরা সব...গলা টিপলে দুখ বের হয়...মায়ের বাছা...বউ বাজারে 'টিয়ার গ্যাস' ছাড়লে যখন দেখানে আমি নিজে দাঁড়িয়ে—নড়ল না মশায় এক পা...কি দুর্জয় সাহস রে বাবা!... দেশটা হল কি...সরকারের কাছে ওসব চালাকি নেই...কি বললেন

মশায়? সাতাত্তর জন? আমি যে শুনলাম 'একশো সাত'... আমাদের মুদিপাড়ার বন্ধা, ঐ যে গো কি বলে তোমার 'নদের নিমাই' পালায় যে নিমাই করত, রাম ঠাকুর তার ছেলে, ও গিছলো... আজ ক্রাইড্ ট্রাটে ব্যাঙ্ক টাকা জমা দিতে, ওত বললে কম করে 'শ' দুই তো বটেই!...

কি গুলিটাই ছুঁড়লে মাইরি, মনে হল রিতিমত যুদ্ধ চলছে...

কজন মরেছে মশাই?... বারো বছরের ছেলে ছিল দুটো, "কি বলব মশায়... সত্ত্ব দেখে এলাম, মায়ের বাছা,... দেখি আপনার দেশলাইটা একবার... টপ্ টপ্ পড়লো মশায় গুলি খেয়ে একটু টু শব্দ নুয়.. বলিহারি সাহস...

দেখি হে, পাঁচকড়ির পাঁচন এক প্যাকেট... জিনিষটা ভালো, ছেলেদের যা গুলো চমৎকার সারছে... কোথায় লাগে গেলের পাঁচন...

কেন কেনেন এই সব আজ্ঞে বাজে, লাগান নিমপাতার জলে সেক, দেখবেন দুদিনে সাক্!...

যিয়ে ভেজে নেবেন নিমপাতা, ঠাণ্ডা হলে লাগাবেন, দুদিনে চিহ্ন পর্যন্ত থাকবে না!...

টেশনে ট্রেন ধামে। গ্রামের পথে অন্ধকার মোঠো রাস্তা ধরে কাতারে কাতারে লোক চলে, তার মধ্যে ও একজন। কাঁধ ঝুলে পড়ছে, মোটুটা মাটির ঠিক ওপরে, বড় পাথরে ধাক্কা লাগে। চেনা পরিচিতের কুশল প্রেমের সহজ অস্পষ্ট প্রত্যুত্তর 'এই যে'। কখনও শুধু মুখ-বাক্যনা, হাসির ক্ষীণ প্রচেষ্টা। রোজ রাত্তার ধারের চায়ের দোকানের ফুটন্ত কেটলিটা নাবাতে নাবাতে রামশশী বলে, 'কিরলেন নাকি?'

আজ বললে, কানাইবাবু কলকাতায় নাকি গুলি চলেছে... কটা মোলো?

পাঁচ রকম উত্তর শুনে, সে নিজের মনে মনে সংখ্যা ঠিক করে, বাড়িয়ে বড় গলায় প্রচার করে!

বাড়ী এসে হার্ট মুখ ধুয়ে, কেরোসিন কাঠের তক্তাপোষের ওপর পাড়ের চামড়াটা সবুজে সরিয়ে উঠে ব'সে, গামছা দিয়ে ডান পাটা মুছতে মুছতে সবিস্তারে বলে, আজ হ'য়েছিল আর কি !

ওমা তাই নাকি...আহা গো বাটের বাছা...মাগুলো ছেড়ে দেব... কি ক'রে !

যায় কেন পুলিশের সঙ্গে লাগতে ? ওদেরও তো আছে গো...

বিনোদ ঠাকুরের মাওয়ায় বসে থিরেটারের রিহার্সাল বন্ধ করে দিয়ে গল্প জমে। কংগ্রেস এবার নিল'...বিরুদ্ধমূলও যোগ দিয়েছে বলেছিলাম কিনা খুঁড়ো, বলি, টিকলো?...কানাই বা বলে নেহাৎ বাজে নয়...

রাত্রে গিন্নী গলা জড়িয়ে বলে, কাল বাপু নাই বা গেলে অপিসে... আমার ভরানক ভয় করে...মা জানেন...ছেড়ে দিয়েছি চেতলাতলার মাঝের পায়ে তিনি দেখবেন ..

সমস্ত দিন ঐ একই কথা'র নানান রকম হেরফের হয়েছে, রাত্রে অন্ধকারে স্ত্রীর সঙ্গে পেয়ে ক্রাইড, ষ্ট্রীট, গুলি, ছোট ছেলে... জয় হিন্দ...আজ্ঞা হো আকবর সব অস্পষ্ট হ'য়ে মিলিয়ে যায়। মনে মনে মাসের হিসেব করে...এখনও মাস পাঁচেক বাকি ! খরচ বাড়বে তারও হিসেব...যাক গে ছাই...

ভাবছ' কেন ? তিনটে যদি বড় হয়, চারটেও হবে...মুখ দেন যিনি আহা'রও দেন তিনি...

সত্যিকথা। ওদের দুজনেরই হিসেব গুলিয়ে যায়...

দ্বিতীয় দিন, বারোই।

সকাল সাতটা তির্পার্নোর আগে কাগজ আসে না, কাজেই কলকাতার খবর কালকের খবরের রাজসংস্করণ হয়ে মুখে মুখে ছুটে

চলে। যারা কাল বলেছিল বাহার আজ তারাই বলেছে বাহান্তর,
যারা কালকে বলেছিল বারো বছরের শিশু আজ নেমেছে আঁটে।
হ্যাঁ মশাই কি কি দেখলেনের দল বলেছে, হ্যাঁ, মশাই সূচকে
দেখলাম। পাড়ার রাম অধিকারীর বড় ছেলের শালা বললে, ওপাড়ায়
শুকে বিশেষ ভাড়াড়ি, কাগজের অফিসে চাকরি করে, তার কাছে
‘শুনলাম’। এমনি নানান রকম দেখা ও শোনার গল্প চারিদিকে।

‘অফিসে চার পরসাদামের একটা কাগজ কিনে এনেছে লক্ষী-
কান্ত, ভাঙা টাইপে ছাপা, কোথাও কালি পড়েছে কোথাও পড়েনি।
সেইটে নিয়ে আসার জমেছে, লক্ষীকান্ত চিরো, কাগজটা ওর নিজের।

দেশটা কি চল, ..গুলি খেলেও এগিয়ে চলে, সাহসের লিমিট
নেই... অচ্ছন্দে বুক পেতে দেয়... বৌবাজারে কাছনে-বোমায় ওপর
থেকে জল কেলেছে এঁজি-পেজিরা, ওদেরও ভয় ঢুকেছে... সাহেব
আসেনি... সার্জেন্ট মরেছে গোটা চারেক... একজনকার কাপড় কেড়ে
নিয়ে রাস্তায় বার করে দিয়েছে...

হাসির রোল।

আর দেখাতে হবে না আরও গোলমাল বাড়বে...

সাহেবের গাড়ীর চর্ণ শোনা গেল। চার পরসাদামের কাগজ অমনি
কোথায় সরে গেল বোঝা গেল না।

কচ্ কচ্ বুটের শব্দের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চললো খস্ খস্ কলমের
শব্দ। লেজার, পোষ্টিং, বিল কালেকসন, বড় বাবুর ডাক, ছোট
সাহেবের গর্জন। শ্রাম ছোট সাহেবের ঘর থেকে বেরিয়ে এসে
টেবিলে বসল মাথায় হাত দিয়ে। কান্নার মূহু শব্দও বোধ হয়
নিষ্কলতার মধ্যে শোনা গেল। লক্ষীকান্ত কলম চালাতে চালাতে নিচু
গলার বললে, কানাই সামলে ভাই শ্রামের চাকরি গেছে, সাহেবের
মেজাজ আজ সপ্তমে

বাইরে জনতার চিৎকার, রাধানাথ সাহেবের ঘরে বাবার সময় নাক ঝাড়বার অজুহাতে জানলার দ্বখ বাড়িয়ে দেখে গেল। 'খোলা' দরজা দিয়ে সাহেবের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময়। ভয়ে ভয়ে নাকটা আরও সম্মুখে বাড়লে।

বাইরে গুলি চলছে; শোভাযাত্রা ভেঙে গেছে, আকাশ বিদীর্ণ করা চিৎকার...জয় হিন্দ, বন্দে মাতরম, আল্লা হো আকবর...

কেরানীর দল মন দিয়ে শুনেছে সাহেবের বোকুনী, রাধানাথের ও চাকরি গেল!

কেন যে এই গোলমাল, কেন করে শোভাযাত্রা?...

বাড়ীতে গিন্নী বললে ওরা থাকে কি? সংসারটা ভাসল' তো?

চতুর্থ দিন। তেরোই।

সকাল সাতটা তেজোআহা—বেগুড়ে এসে গাড়ি থেমে গেল, লাইনে লোক গুয়ে। লোক ঠিক নয়, শিশুর দল। ওরা সবাই নেমে এলো, ছেলেরা বললে, জয় হিন্দ, উঠব না, বুকের ওপর দিয়ে যাও।

স্বামের বাড়িতে নটা সাতাশ, সেট অনিবার্য।

রাম বললে, কচুকে ছোঁড়া, লাভ কি এতে? যাও সব.....

কি হে কিরবে নাকি?

কালকে গেছে রাধানাথের চাকরি ও পাড়ার স্বামেরও। ওদিকে জী আবার অসুস্থ, চারটি ছেলেমেয়ে—পঞ্চমটি আগত প্রায়; মুদির দোকানে বেয়ার্লিশ টাকা বাকী, গয়লায় সাত টাকা তেরো আনা। ননুটের পুলের মাইনে...ছেলের দল বাড়ছে। ট্রেন থমকে দাঁড়িয়ে, এঞ্জিন ড্রাইভার পা-দানের ওপর বসে সিগারেট কুকছে।

বিড়ি ধরিয়ে কানাই বসল বেকিতে পা তুলে। আজকালকার ছেলেগুলো হল কি?

নটা ছত্রিশ।

দিক্ না ওপর দিয়ে চালিয়ে পাবে এখন টের!

পালাও পালাও, কেরানীর দুল টপ্ টপ্ টেনে ওঠে।

কি হয়েছে মশাই?

গুর্থার দল..

আর শোনা গেল না কিছুই, গুলির শব্দ।

হাঙড়ায় টেন এল, নটা আটান্নো। অফিসের দরজার সতেরো মিনিট লেট, চাকরি আজ গেল।

দোতালায় উঠে দেখা গেল দরজা বন্ধ। দুরোরয়ান বললে, সাহেব আসবে না, অফিস ছুটি। মেম সাহেব ভয় পেয়ে সাহেবকে আসতে দেয়-নি। ছোট ছোট ছেলে তো নয় ডাকাত, খুন করে যদি?

রাম ক্রাম বহু মধু হাঁক ছেড়ে বাঁচলো। চাকরিটা রইল।

কেলুড়ে মরেছে ভেইশটা ছেলে, সতীশ বাবুর ছেলেটাও, বয়স আট বছর।

দুদিন আচম্কা ছুটি পাওয়া গেল, অবাচিত।

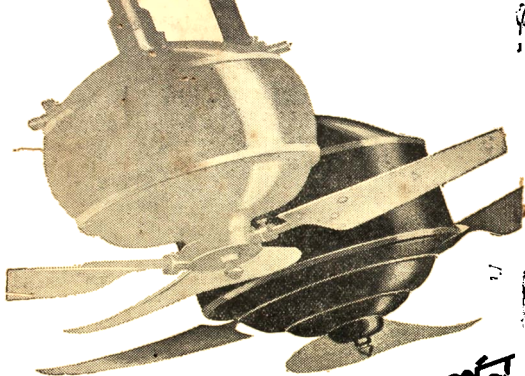
উপভোগ করবে কেমন করে?

দিবানিজ্জা। গিন্নী কোন ফাঁকে আধ ঘণ্টার সঙ্গে ঘরে এসেছিল। চুপি চুপি এসে বেরিয়ে গেল।

পাশের বাড়ীর গিন্নীর সঙ্গে গল্প জমাতো গিয়ে দেখলে শোবার ঘরের আগল টানা। ঝি কানে কানে কি বললে। ছুজনেই হেসে উঠল।

কান দুটো লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠল। মুখে বললে, ওমা কি লজ্জা গো!

‘ফিনিক্স’ পাখী
কিনুন!



শ্রেষ্ঠত্বের নিদর্শন